আমাদের কুড়িয়ে পাওয়া

শাক

উবিনীগ

আমাদের কুড়িয়ে পাওয়া শাক

উবিনীগ
(উন্নয়ন বিকল্পের নীতিনির্ধারণী গবেষণা)

ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশক:
নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা
৬/৮ স্যার সৈয়দ রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।
ফোন: ৯১১৮৪২৮, ৯১৪০৮১২,
৮১২৭৭৪১, ৮১২৪৫৩৩
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮১১৩০৬৫

প্রথম সংস্করণ: ১৫ জানুয়ারি, ২০০২
দ্বিতীয় সংস্করণ: ১০ নভেম্বর, ২০১১

অঙ্গসজ্জা ও প্রচ্ছদ: রুশিয়া বেগম

ছবি: আব্দুল জব্বার

মূল্য: ২৫০.০০

ISBN: 984-863-003-1

Amader Kuriye Pawa Sak:
A research report green leafy vegetables
from cultivated and uncultivated sources by UBINIG
Published by: Narigrantha Prabartana
6/8 Sir Syed Road, Mohammadpur
Dhaka-1207, Bangladesh.
Phone: 9118428, 9140812, 8127741, 8124533
Fax: 880-2-8113065
E-mail: narigrantha@gmail.com
kachuripana@gmail.com
websites: www.ubinig.org/www.prabartana.com

First Edition: 15 January, 2002
Second Edition: 10 November, 2011

Taka: 250.00
US$ 10

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমাদের কুড়িয়ে পাওয়া শাক এই গবেষণাটি খুবই সহজ সরলভাবে গ্রামের মহিলাদের সাথে মিশে তাঁদের কথাগুলোকে বুঝে নিয়ে দীর্ঘ দুই বছর ধরে করা হয়েছে। এই গবেষণাটি কানাডার আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা আইডিআরসি-এর Using Agriculture Diversity Programme (UADRA) সহায়তায় করা হয়েছে। আমরা এই গবেষণায় সার্বিকভাবে সহযোগিতা প্রদানের জন্যে তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। আইডিআরসি (IDRC) এর প্রতিনিধি ডঃ ড্যানিয়েল বাকল্‌স (Dr. Daniel Buckles) গবেষণার প্রথম থেকে আমাদের উৎসাহ দিয়েছেন এবং বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ দিয়েছেন। আমরা তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী। এ ছাড়া উবিনীগের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ইউএডিআএ-এর স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারপার্সন জনাব ফরহাদ মজহার বিশেষভাবে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়েছেন। আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

উবিনীগের অনেক কর্মী এই গবেষণার সাথে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যুক্ত থেকেছেন এবং প্রতিবেদনটি প্রকাশ করতে সহায়তা করেছেন। এদের মধ্যে পলাশ বড়াল, গোলাম রাব্বী বাদল ও রুশিযা বেগম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তিনটি গবেষণা এলাকায় নয়াকৃষির গ্রাম কর্মী, কৃষক এবং কেন্দ্রের সকল কর্মীরা এই গবেষণায় সবসময় সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণাটির মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি থাকলে তার সকল দায় দায়িত্ব আমাদের। তবে এই গবেষণাটি চলছে। কাজেই তথ্যের পরিমার্জনা সব সময়ই হতে থাকবে।

ফরিদা আখতার
সকল গবেষকদের পক্ষ থেকে

কুড়িয়ে পাওয়া শাকের তথ্য সংগ্রহকারী কর্মীদের নাম

উবিনীগের সব গবেষণাই আমাদের সকল কর্মীদের অংশগ্রহণে হয়, বিশেষ করে যারা নয়াকৃষি আন্দোলনের সাথে যুক্ত তারা নানাভাবে এই গবেষণায় যুক্ত ছিলেন। তবে কয়েকজন নির্দিষ্টভাবে কাজ করেছেন তাদের নাম দেয়া হলো।

শাহীনুর বেগম
রোকেয়া খানম টুলু
সামছুন্নাহার
হালিমা পারভীন
এলিচ পারভীন
গ্রাম কর্মী
রেখা বেগম - টাঙ্গাইল
রং বাহার - টাঙ্গাইল
নবিরন বেগম - টাঙ্গাইল
আনোয়ারা বেগম - টাঙ্গাইল
শাকেরা বেগম - কক্সবাজার
আনসারা বেগম (দাই) - কক্সবাজার
জাহানারা বেগম - কক্সবাজার
পুষ্প রাণী - ঈশ্বরদী
ছামিদা বেগম - ঈশ্বরদী
জিন্নাত আলী - ঈশ্বরদী

সম্পাদনা
ফরিদা আখতার
সীমা দাস সীমু

দ্বিতীয় প্রকাশের কথা

'আমাদের কুড়িয়ে পাওয়া শাক' গবেষণা গ্রন্থটি দ্বিতীয় সংস্করণ বের করতে পেরে আমরা খুশি। প্রথম সংস্করণ ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। তবে দ্বিতীয় সংস্করণে আমরা কিছুটা পরিবর্তন করেছি। আশা করি পাঠকরা এই গ্রন্থ ব্যবহার করে প্রাণবৈচিত্র্য রক্ষার সাথে আমাদের খাদ্যের যোগানোর সম্পর্কটি উপলব্ধি করতে পারবেন।

দক্ষিণ এশিয়ায় মানুষের জীবনধারণ প্রাণবৈচিত্র্যের ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের মতো দেশেও খাদ্য নিরাপত্তার প্রশ্নটি শুধুমাত্র আবাদী ফসলের ওপরই নির্ভরশীল নয়। আমাদের চারিদিকে অনেক কিছু গড়ে ওঠে যা আবাদ করা হয় না কিন্তু খাওয়া হয়। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরণের খাদ্যাভ্যাস আছে। এ খাদ্যকে আমরা কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য বলে আখ্যায়িত করেছি। কারণ যা আবাদ হয় তার আহরণ এবং অনাবাদি ফসলের আহরণের মধ্যে পার্থক্য আছে। কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য বলতে আপনাতে এসে খাওয়া খাদ্য নয়, আপনাতে গড়ে ওঠে কিন্তু যাকে আহরণ করতে হয় এবং এই খাদ্য রক্ষার জন্যে পরিকল্পনা করতে হয়। গ্রামের মানুষ স্বাভাবিক জীবনেই এই খাদ্যের ওপর নানা কারণে নির্ভরশীল।

কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের এই গবেষণাটি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের গবেষণার একই সময় পরিচালিত হয়েছে। এই গবেষণার মধ্য দিয়ে আমরা যারা প্রাণবৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির কাজ করছি তারা দেখাতে চেয়েছি যে খাদ্য নিরাপত্তার প্রশ্নটি কেবলমাত্র আবাদি ফসল দিয়ে সমাধান করা যাবে না। এর সাথে সরাসরি যুক্ত রয়েছে অনাবাদি ফসল এবং তার ওপর জনগণের অধিকারের প্রশ্ন।

এই গবেষণাটি সকল ধরণের কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের ওপর করা হয় নি। কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের মধ্যে অর্থাৎ গাছ-গাছালি লতা-গুল্ম ইত্যাদি অনেক বড় খাদ্যের যোগানদার। এর সাথে রয়েছে কুড়িয়ে পাওয়া মাছ। কিন্তু আমরা খুবই সচেতনভাবে শুধু শাক নিয়ে কাজ করেছি। খাদ্যের মধ্যে শাকের যে গুরুত্ব এবং একই সাথে খাদ্য নিরাপত্তার দিক থেকেও ভাতের পরেই শাক কত বড় ভূমিকা রাখে তা দেখাতে চেয়েছি। শাক চেনা, তোলা এবং রান্না করা সব মিলিয়ে খাদ্য হিসেবে শাকের ওপর এই গবেষণাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করেছে। গ্রামের নারীর জীবনে শাক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণত ধরে নেয়া হয় যে কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য কেবল মাত্র দুর্যোগের সময় এবং বিশেষ করে খাদ্য সংকটের সময়কার খাবার। এ ধারণা ভুল। এই গবেষণায় আমরা দেখেছি কুড়িয়ে পাওয়া শাক সারা বছরই এবং সকল অবস্থাতে খাচ্ছে। এটা স্বাভাবিক খাবারের অংশ।

গবেষণা কাজটি অনেক বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। আমরা আমাদের গ্রাম পর্যায়ের কর্মী এবং কৃষকদের নিয়ে এই গবেষণার যে তথ্য তুলে ধরেছি, তা একেবারে নতুন এবং বাস্তব।

সূচি

অধ্যায় ১: কি করে এই গবেষণা করা হোল

কুড়িয়ে পাওয়া শাকের গবেষণা ৩
কুড়িয়ে পাওয়া শাকের তথ্য সংগ্রহের কাঠামোর বর্ণনা ৮
তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ৯
তথ্য সংগ্রহের সময় সমস্যা ১১

এলাকা ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের অভিজ্ঞতা ১১
১. সমতল ভূমি ও বন্যা কবলিত অঞ্চল - টাঙ্গাইল ১২
ক. নয়াকৃষি তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্রের সুবিধা ১৬
খ. তথ্যের বৈচিত্র্য ১৭
গ. বিশেষ অবস্থায় কুড়িয়ে পাওয়া শাকের প্রাপ্তি ১৮

বিল ও খরাপিড়িত অঞ্চল- ঈশ্বরদী ১৯
পাহাড়ী ও উপকূলীয় অঞ্চল - কক্সবাজার ২৪
তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সুবিধা ও অসুবিধা ২৯
গবেষণার কয়েক ধাপ ৩১

তিনটি গবেষণা এলাকার তথ্যের রকমফের ৩২
ক. তিন গবেষণা এলাকায় তথ্য প্রদানকারীদের পরিচয় ৩৩
খ. বিশেষ অবস্থায় কুড়িয়ে পাওয়া শাকের প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ৩৩
গ. মৌসুম অনুযায়ী শাকের প্রাপ্তির তথ্য সংগ্রহ ৩৪
ঘ. কুড়িয়ে পাওয়া শাকের ওপর গরিব মানুষের নির্ভরশীলতা ৩৪
ঙ. কুড়িয়ে পাওয়া শাকের রান্না সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ৩৪

অধ্যায় ২: শাক কি ? কোথায় পাওয়া যায়

শাক সম্পর্কে সাধারণ তথ্য ৩৭
ক. শাক কি ? ৩৭
খ. কুড়িয়ে পাওয়া শাক কি ? ৩৮
গ. শাকের নাম ৪০
শাক কোথায় পাওয়া যায় ? ৪৬
শাক সংগ্রহ ৪৯

অধ্যায় ৩: শাক রান্না ও খাওয়া

শাক রান্না ৬১

ক. কুড়িয়ে পাওয়া শাক রান্নার রকমফের ৬১

খ. গবেষণা এলাকায় রান্না ৬২

গ. টাঙ্গাইল, ঈশ্বরদী এলাকায় রান্নার পদ্ধতি ৬৭

ঘ. বদরখালী এলাকার রান্নার পদ্ধতি ৬৯

ঙ. শাক রান্নায় হলুদ, পিঁয়াজ ও তেলের ব্যবহার ৭০

চ. শাক রান্নায় ব্যবহৃত মসলার ফিরিস্তি ৭৪

ছ. রান্না বর্ণনায় শব্দের ব্যবহার ৭৯

জ. রান্নার জন্যে ব্যবহৃত সরঞ্জাম ৮১

ঝ. শাক রান্না এবং মিশানো শাক ৮৩

কুড়িয়ে পাওয়া শাক খাওয়ার সময় ৮৭

কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য ও শাক ৯৬

গ্রামীণ পরিবারের খাদ্যের কত অংশ কুড়িয়ে পাওয়া ? ১০২

অধ্যায় ৪: ছবিতে কুড়িয়ে পাওয়া শাক ১৩৫

অধ্যায় ১: কি করে এই গবেষণা করা হোল

কুড়িয়ে পাওয়া শাকের গবেষণা

কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের গবেষণা করা সহজ কোন ব্যাপার নয়। এর সাথে অনেক কিছু জড়িত আছে। অনেক জ্ঞানেরও প্রয়োজন। আমরা যে সকল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিজেদের গবেষণার জন্যে তৈরি করেছি তার বিস্তারিত বর্ণনা এখানে দেয়া হয়েছে। প্রথমে বিভিন্ন কেন্দ্রের কর্মীরা তাদের নিজ নিজ এলাকার প্রেক্ষিতে কি ধরণের কাজ করেন তার বর্ণনা দেন। তাদের অভিজ্ঞতার বিশাল ভাণ্ডার একে অপরের কাছে তুলে ধরেন। এই বিনিময়ের মধ্যে আনন্দ ছিল, আবার তর্কও ছিল। কারণ সবার তথ্য সবাই মেনে নিয়েছেন এমন ছিল না।

কর্মীদের দলীয়ভাবে আলোচনা

অংশগ্রহণকারী কর্মীরা ৫টি দলে ভাগ হয়ে কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য নিয়ে প্রাপ্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করতে শুরু করে। দলে দলে সিরিয়াস আলোচনা চলছে। এক ধরণের প্রতিযোগিতাও শুরু হয়ে যায়, কোন্ দল বেশী তথ্য দিতে পারে। কেউ কিছু ভুল তথ্য দিলে বা একটু অন্য ধরণের কথা বললেই হাসির রোল ওঠে। তখন অন্য দলের সদস্যরা আড় চোখে তাকায়। এই কাজের জন্যে কর্মীদের কেন্দ্র এবং কেন্দ্রের আশেপাশে গিয়ে শাকগুলো কুড়িয়ে আনতে হয় এবং সেই হিসাবে তাদের লিখতে হবে। এক পর্যায়ে কর্মীদের সাহায্যে মাইক নিয়ন্ত্রকারী নিজামও জড়িয়ে পড়ে। তার জানামতে শাকটি সে কুড়িয়ে এনে একটি দলকে দিয়ে দেয়। তার এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সকলকে খুবই আনন্দ দিয়েছে।

এই সভায় আমরা কুড়িয়ে পাওয়া শাকের সংজ্ঞা নিয়েও একটা বিপদে পড়ে গেলাম। যে শাক আবাদ হয় না, তাকে কুড়িয়ে পাওয়া শাক বলা তো খুবই সহজ কিন্তু লাউ শাক বা কুমড়ার পাতাকে আমরা কি বলব? অর্থাৎ এমন কিছু শাক আমরা আবাদ করি কিন্তু যে অংশটি শাক হিশেবে খাই তা কুড়িয়ে আনা হয়। তাকে আবাদিও বলা যাচ্ছে না, আবার অনাবাদিও বলা যাচ্ছে না। এই সমস্যাটার সমাধান আমরা সেই সভায় তৎক্ষণাৎ করে ফেলার প্রয়োজন মনে করি নি। বিষয়টিকে খোলা বিতর্ক আকারে আমরা রেখে দিয়েছি এবং গবেষণার মধ্য দিয়ে বিষয়টির একটি মীমাংসা হবে বলে ধরে নিয়েছি। আমরা আবাদি উৎস থেকে কুড়িয়ে পাওয়া শাককে আবাদি আর অনাবাদি উৎস থেকে কুড়িয়ে পাওয়া শাককে অনাবাদি বলে তখনকার মতো চালিয়ে দিয়েছি। আবাদি শাকের সংখ্যা সেই সভায় ছিল ২১টি এবং অনাবাদি ৩৬টি। এই ৫৫টি শাকের তথ্য মোটামুটি বদরখালী, টাঙ্গাইল এবং ঈশ্বরদীতে আমাদের কাজের এলাকার অভিজ্ঞতা থেকে শনাক্ত করা হয়েছে।

যে ৫৫টি শাকের নাম ও তথ্য আমরা পেয়েছি তার তালিকা নীচে দেওয়া হোল। আবাদি ও অনাবাদি শাকের তালিকা আলাদাভাবে দেয়া হয়েছে। আমাদের এই তথ্য সংগ্রহের কাজের মধ্যে দেখা গেল ২ ধরণের থানকুনি আছে অথচ বৈজ্ঞানিকদের তথ্যে থানকুনির একটাই জাত।

৫৫টি শাকের নাম -

১. মোরগ শাক, ২. ইছা শাক, ৩. তেলাকুচা, ৪. খুইরা কাটা, ৫. হেঞ্চি শাক, ৬. বতুয়া শাক, ৭. দুধলী শাক, ৮. ন্যাটাপেটা শাক, ৯. কানাই শাক,১০. হেলেঞ্চা, ১১. গিমা শাক, ১২. দুরমা পাতা, ১৩. চিনতন পাতা, ১৪. পুঁইশাক, ১৫. কলমি শাক, ১৬. সেঞ্চি, ১৭. ঢেঁকি শাক, ১৮. পিপুল শাক, ১৯. শান্তি শাক, ২০. নটেশাক, ২১. চিরকুটি, ২২. ক্যাথাপাটা, ২৩. থানকুনি, ২৪. কচু শাক, ২৫. খুড়েকাটা (কাটানটে), ২৬. নুনিয়া শাক, ২৭. গিন নারিস, ২৮. খারকোন, ২৯. কস্তুরি, ৩০. আমরুল, ৩১. নুন খুরিয়া (বুলখুরিয়া), ৩২. গন্ধভাদালী, ৩৩. শুশনী শাক, ৩৪. শিয়ালমুতি, ৩৫. তেলাকুচা শাক, ৩৬. নিলিচি, ৩৭. মুনসি শাক, ৩৮. হরি শাক, ৩৯.

থ্যানথ্যানে, ৪০. খ্যাটখ্যাটি, ৪১. বনঝুড়ি ৪২. হাগড়া, ৪৩. চিনিগুড়ি, ৪৪. মরিচপাতা ৪৫. বনপাট, ৪৬. হুটকা, ৪৭. মিষ্টি আলু শাক, ৪৮. ডাটা শাক, ৪৯. চালকুমড়া পাতা, ৫০. মিষ্টিকুমড়ার শাক, ৫১. লাউ শাক, ৫২. পালং শাক, ৫৩. সাজনা পাতা, ৫৪. মোরগশাক, ৫৫. মটর শাক।

পরবর্তী পর্যায়ে দেখা গেল আমাদেরকে কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত করার জন্য বিশদভাবে গাছ-লতা-পাতা চেনার প্রয়োজনীয়তা দেখা গেল। বৈজ্ঞানিকভাবে তারা একই পরিবারভুক্ত কি না বোঝার চেষ্টা করে পৃথক তালিকা করতে হবে। স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে গাছ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য জানতে হবে এবং তা লিপিবদ্ধ করতে হবে। এই কাজই হবে আসল বৈজ্ঞানিক কাজ। গ্রামে গিয়ে নয়াকৃষির গ্রামকর্মীদের নিয়ে এই তথ্য সংগ্রহের কাজ করে যেতে হবে। কর্মশালার মাত্র তিন দিনের কাজে পরস্পরের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময়, কথা আলোচনায় শাক সম্পর্কে কর্মীদের ধারণা অনেক বিকশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতায় কয়েকটি উল্লেখ করার মতো দিক তুলে ধরা হচ্ছে:

* যমুনা নদীর এপার ওপারের কারণে শাক (কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য) সংগ্রহ, রান্নায় অনেক বৈচিত্র্য রয়েছে।

* শাক সম্পর্কে মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেরাও অনেক তথ্য জানেন, রান্না করার পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা রাখেন।

* শাকের সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতির অনেক বিষয় যুক্ত। এলাকা ভেদে সংস্কৃতির মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য রয়েছে।

* শাকের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অনেকগুলো ওষুধী গুণ আছে। মানুষ প্রতিদিন তার ব্যবহার করছে।

* আকালের এলাকাগুলোতে কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য প্রাধান্য পায়।

শাকের ধরণ	গ্রামে সরাসরি খোঁজ নেবার আগে নাম ও প্রাথমিক তথ্য জানা শাকের সংখ্যা	গ্রামে সরাসরি খোঁজ নিয়েই নাম ও প্রাথমিক তথ্য জানা গেছে, সেই সব শাকের সংখ্যা	মোট
আবাদি	২১	১৫	৩৬
অনাবাদি	৩৪	২৯	৬৩
মোট	৫৫	৪৪	৯৯

আমরা ৬ থেকে ১২ অক্টোবর ১৯৯৭ সালের সভার পর নিজ নিজ কাজের এলাকায় ফিরে যাই। তখন সরাসরি গ্রামে আমাদের কাজের এলাকায় শাকের তথ্য প্রাথমিক ভাবে নেওয়া শুরু করি। এবার আরও ৪৪টি (আবাদি ১৫ এবং অনাবাদি ২৯) শাক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। নতুন ৪৪টি মিলে আমরা শাকের নাম ও প্রাথমিক তথ্য পেলাম ৯৯ টির।

শাক বা গাছ-গাছালির খাদ্য হিশেবে ব্যবহারের তিন ধরণের বিষয় ধরা পড়ে,

১. শাক হিশাবে খাওয়া, তথ্য পাওয়া যায় ৬৩টি শাক সম্পর্কে। এর মধ্যে আবাদি আছে ৩৯টি আর অনাবাদি আছে ২৪টি।

২. ওষুধী হিশাবে খাওয়া, তথ্য পাওয়া যায় ১৬টি শাক সম্পর্কে। এর মধ্যে আবাদি আছে ৯টি অনাবাদি আছে ৭টি।

৩. গাছে পাতা এবং কান্ড পর্যন্ত শাক হিসেবে গণ্য করা হয় কিন্তু কিছু গাছের ফুলও কুড়িয়ে এনে খায়। এমন তথ্য পাওয়া গেছে ১১টি গাছের ফুল সম্পর্কে।

৪. শাক হিসাবে শনাক্ত করতে অসুবিধা হয়েছে ১০টি।

সহজেই লক্ষ্য করা যাবে যে কুড়িয়ে পাওয়া শাকের সংজ্ঞার ব্যাপারটা আগাগোড়া একটা মুশকিল হয়েই রয়েছে। ফলে আবাদি উৎস থেকে কুড়িয়ে পাওয়া শাকের সংখ্যা এই তালিকাতেও খুব কম নয়। গবেষণার দিক থেকে এটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা। এতে শুরুতেই আমরা স্পষ্ট হয়ে গেলাম যে খাদ্যের উৎপাদন ও খাদ্য সংগ্রহের উৎসের দিক থেকে প্রকৃতির মাঝখানে একটা মোটাদাগ কেটে আবাদি ও অনাবাদি নামে যে দুটো ভাগ আমরা আছে বলে ধরেই নিয়েছি, সেটা ঘোরতর প্রশ্নের সম্মুখিন হয়ে পড়েছে। প্রকৃতিকে দুই ফালি করে কাটা ও সেই ভাবে ভাবতে শিখবার ব্যাপারটা কি খুব নতুন? হয়তো গ্রামের মানুষ এই রকম করে ভাবে না। এই ভাবনার জন্য আমাদের শহুরেপনা হয়তো দায়ী। খাদ্য যদি কুড়িয়েই সংগ্রহ করতে হয় তাহলে হয়তো আবাদি উৎস আর অনাবাদি উৎস থেকে খাদ্য সংগ্রহ দুটোই গ্রামীণ সমাজের কাছে একই অর্থ বহন করে, আমরা ভাগ করে বিচার করতে বসলেও। কারণ আবাদি আর অনাবাদি দুটোই সমান ভাবে খাদ্য সংগ্রহের উৎস। যিনি কুড়িয়ে খাদ্য সংগ্রহ করছেন তাঁর সামনে দুটোর ভেদ লুপ্ত হয়ে যায়। তখন যে সত্যটা বরং প্রকট হয়ে ওঠে সেটা হোল খাদ্য সংগ্রহের অধিকারটা তাঁর আছে কি না। নিজের জমি থেকে তো তিনি সংগ্রহ করতেই পারছেন কিন্তু শুধু সেই দিকটা দিয়ে কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের ব্যাপারটা পুরোপুরি বোঝা যাবে না। তিনি সরকারি বা খাস জমি থেকে কুড়িয়ে পাওয়ার অধিকার ভোগ করছেন কি না কিম্বা অন্যের জমি থেকে শাক-লতা-পাতা সংগ্রহ করলে তাঁকে বাধা দেওয়া হয় কি না। কিম্বা গ্রামের মানুষের মধ্যে সেই বিবেক বা নীতি কি এখনও কাজ করে যে, তাদের প্রতিবেশী গরিব পরিবারটি যখনই প্রয়োজন তখনই অনাবাদি বা আবাদি যে কোন উৎস থেকে খাদ্য সংগ্রহ করলে তাঁকে বাধা দেওয়া তাঁরা অন্যায় বলে মনে করেন। যতক্ষণ না তিনি যে ফসলের জন্য আবাদ করা হয়েছে সেই ফসল তোলেন বা নষ্ট না করেন। একের প্রতি সমষ্টির সামাজিক নিরাপত্তারই হয়তো এগুলোর অংশ।

ধরা যাক, গ্রামে গরিব পরিবারটির কোন সদস্য যখন অন্যের জমি থেকে বথুয়া শাক তোলে তখন তো দেখা যায় তাকে বাধা দেওয়া হয় না। বা বাধা দেওয়াটা সমাজ অনৈতিক বলে মনে করে। কারণ এই খাদ্য কুড়িয়ে পাবার অধিকার গরিব পরিবারটির আছে বলেই তারা ধরে নেয়। ঘরে ছোট মাছ আছে কিন্তু পাক করবার মতো কোন শাক নেই। তখন প্রতিবেশীর কুমড়ার চালা বা লাউয়ের মাচান থেকে শাক কুড়িয়ে নেওয়া অপরাধ নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে আনন্দের। কারণ ছোট মাছ সেই শাকের সঙ্গে রাঁধার পর প্রতিবেশীর বাড়িতে পাঠানোটাই এই ক্ষেত্রে অলিখিত রীতি। তারপর কলতলায় দাঁড়িয়ে সেই শাক কেমন লাগল সেই প্রশ্ন তোলার ছুতোয় আরও হাজারো কথাবার্তা। এই ব্যাপারগুলো এমন কিছু গভীর সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে জড়িত যে-বিষয়ে বাংলাদেশে গবেষণা হয় নি বললেই চলে। অথচ এর সঙ্গে পরিবারে ও গ্রামীণ পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তার প্রশ্নটা অঙ্গাঙ্গী ভাবেই জড়িত। এই দিকগুলোকে বিদেশীরা ঈড়সসড়হ চৎড়ঢ়বৎঃু জবমরসবং আখ্যা দিয়ে থাকেন। আধুনিক সমাজ বিজ্ঞান সবকিছুই সম্পত্তির মানদণ্ড দিয়ে বিচার করে বলে জীবনযাপন ব্যবস্থার এই সকল নৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকটাকেও তারা সম্পত্তির ধারণা দিয়ে বিচারের চেষ্টা করে। এই দিকটা যদি আমরা মনে রাখি তাহলে খাদ্য উৎপাদন, সংগ্রহ ও নিজের পরিবার বা অপরের সঙ্গে মিলেজুলে খাওয়ার ব্যাপারগুলো নিশ্চয়ই কোন না কোন আচার, বিধান, সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য আকারে আমাদের সমাজে রয়েছে। উৎপাদন, ভোগ ও বিনিময়ের সম্পর্ক বিভিন্নভাবে অভিব্যক্তি লাভ করে। আবাদি ও অনাবাদির মুশকিল আমাদের এই সকল অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ভাবতে সহায়তা করেছে।

ফসল কাটা ও ঘরে তোলা ফসল উৎপাদন ও সংগ্রহের একটা বিশেষ দিক। উৎপাদন ও সংগ্রহের এই পর্যায় থেকে হয়তো কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যকে বিচার করা ঠিক হচ্ছে না।

আর অনাবাদি জমি দুটোই আবাদি ও অনাবাদি - প্রকৃতির এই দুই মানচিত্রের মাঝখানে আরও গভীর রহস্য ও জটিলতা রয়ে যাচ্ছে আসলেই আবাদি আর অনাবাদি এই দুটো কথার মানে কি? একটি কি অন্যটির বিপরীত? নাকি আবাদি মাত্রই একই সঙ্গে অনাবাদি খাদ্যের উৎস। জীবনের শর্ত হিসাবে প্রকৃতিকে চাষাবাদ মানেই কি আবাদ করা? অথবা চাষ বলতে বা কৃষিকাজ বলতে আমরা এখন যা বুঝি তার অর্থ আর আবাদ এই প্রশ্ন আমাদের মাথায় এলো। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্য সংগ্রহ কাজের শুরু

টাঙ্গাইল রিদয়পুর কেন্দ্রের ১৯৯৭ সালের অক্টোবরের ছয় থেকে বারো তারিখের সেই সভাই আমাদের তথ্য সংগ্রহের শুরু বলা যায়। অক্টোবরের সভায় যে ৫৫টি শাকের নাম ও তথ্য আমরা বলতে পেরেছিলাম তাদের সম্পর্কে আরও খোঁজখবর কীভাবে নেওয়া যায় সেই বিষয়ে আলাপ আলোচনা চলে। একটা বিষয় শুরুতেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে প্রতিটি শাকের স্থানীয় নাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একই শাকের নাম এক এক এলাকায় একেকরকম, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিল আছে আবার কোন কোন শাকের নামের একেবারেই মিল নেই, অথচ শাক একই। অতএব সেই সভায় আমরা শাকগুলোর অতি পরিচিত নাম বা একটি সাধারণ নাম নির্ধারণ করে তাদের এলাকাভিত্তিক নামগুলোর তালিকা করলাম। তারপর কুড়িয়ে পাওয়া শাক সম্বন্ধে আরও নিবিড় ভাবে তথ্য সংগ্রহের জন্য একটা প্রাথমিক কাঠামো খাড়া করা হলো। সেই কাঠামোতে প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা কি কি তথ্য সংগ্রহ করব তার একটা নির্দেশনা ছিল।

কুড়িয়ে পাওয়া শাকের তথ্য সংগ্রহের কাঠামোর বর্ণনা

কুড়িয়ে পাওয়া শাক সম্বন্ধে আরও নিবিড় ভাবে তথ্য সংগ্রহের জন্য যে প্রাথমিক কাঠামো খাড়া করা হয়েছে, সেই কাঠামোতে ১৫টি বিষয়ের উল্লেখ ছিল। এই ১৫টি বিষয় হচ্ছে -

১. শাকের সাধারণ নাম/ জাতীয় নাম

২. শাকের স্থানীয় নাম

৩. কোন পরিবেশে জন্মে

৪. সাধারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে

৫. মৌসুম প্রসঙ্গে

৬. শাক সংগ্রহের পদ্ধতি

৭. খাওয়া পদ্ধতি

৮. পরিবেশ পদ্ধতি

৯. ক্ষুধা/দুর্ভিক্ষ বা অন্য কোন বিশেষ অবস্থায় ব্যবহার

১০. গবাদী পশু ও অন্যান্য প্রাণীর খাবার হিসেবে ব্যবহার

১১. শাক সংরক্ষণ পদ্ধতি

১২. সংস্কার, সংস্কৃতি ও কাহিনী

১৩. শাকের ওষুধী গুণাগুণ

১৪. শাক নিয়ে সামাজিক সম্পর্ক

১৫. শাকের বাণিজ্যিক দিক

কাঠামোতে কিছুটা বিজ্ঞান, কিছুটা আর্থ-সামাজিক দিক, আবার বেশ খানিকটা খাদ্যের সংস্কৃতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। আমাদের কাছে মনে হলো প্রাথমিক ভাবে কাজ শুরু করার জন্য গবেষণা কাঠামোটি মন্দ নয়, তবে কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য সম্পর্কে আরও গভীরভাবে জানার জন্য কাঠামোটি যথেষ্ট নয়। অন্যদিকে আমরাও খুব পরিষ্কার ছিলাম না, ঠিক কীভাবে উদ্ভিদের অর্থবিজ্ঞান (Economic Botany) মার্কা প্রচলিত গবেষণার ধারার বাইরে গিয়ে আমরা এই বিষয়ে আরও গভীরে প্রবেশ করতে পারবো। সাধারণত দেখা যায় খাদ্য হিসাবে বুনো গাছপালার ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা যথেষ্টই উৎসাহী। কিন্তু আজ অবধি তাঁরা কখনই সেগুলোর চেনা জানা নাম, পাশে

তাঁদের বৈজ্ঞানিক নামকরণের কাঠামোয় ফেলে দূর্বোধ্য ল্যাটিন নাম গোত্র বা পরিবারের হদিশই আমাদের দিয়েছেন, কিম্বা বলা যায় পেশাগত কারণে তাঁরা এতোটাকুই তাঁদের কর্তব্য জ্ঞান করেছেন।

আমরা নাম আর তাদের পণ্ডিতি মার্কা বৈজ্ঞানিক নাম ও গোত্রে তেমন উৎসাহী ছিলাম না। যদিও এর দরকার আছে, কারণ বাংলাদেশের একটি শাকের নামে বিজ্ঞানীরা তাকে চিনবেন না, ফলে তাঁদেরই ভাষায় তাকে একটা খটমট নামে আমাদের চেনাতে হবে। উপায় কি? কিন্তু কথা হোল, এটাই আমাদের গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু শুরুর দিকে আমাদের মনে হয়েছে এই কাজটিও বাংলাদেশের কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের ক্ষেত্রে করা হয় নি। অতএব শুরুতে যে কাঠামো আমরা তৈরি করেছিলাম তার মধ্যে এইভাবে বোটানিকাল কায়দায় নামের তালিকা বানাবার একটা ঝোঁক আমাদের মধ্যে ছিল।

এই কাঠামোর ভিত্তিতেই আরও তথ্য অনুসন্ধান ও তা লিপিবদ্ধ করার কাজ শুরু হয়। ব্যাপারটি আত্মস্থ করার জন্য আমরা অক্টোবরে ছোট ছোট পাঁচটি দলে ভাগ হয়ে যাই এবং শাক সম্পর্কে যতটুকু আমরা জানি প্রণীত কাঠামোর ভিত্তিতে তথ্য লিখে বোঝার চেষ্টা করি, তৈরি করা কাঠামোটা কেমন ফলপ্রসু। কর্মীদের পাঁচটি গ্রুপ মোট ২৬টি কড়িয়ে পাওয়া শাকের উপর তথ্য লেখে। পরবর্তীতে কাজটি যেন ধারাবাহিকভাবে চলে তার জন্য আমাদের তিনটি কাজের এলাকা ও কেন্দ্র থেকে কর্মীদের ওপর সুনিদষ্টভাবে দায়িত্ব দেয়া হয়, কুড়িয়ে পাওয়া শাকের ওপর তথ্য সংগ্রহের জন্য।

অক্টোবরের ১৩ তারিখ থেকেই এই কাজ শুরু হয়। যে ২৬টি শাকের তথ্য কর্মীরা লিখেছিলেন রিদয়পুর কেন্দ্রে বসেই তাকে গুছিয়ে নেয়া হয়। একই সাথে সবগুলো শাকের হার্বেরিয়াম তৈরী করা হয়।

পাঁচটি গ্রুপ থেকে পাওয়া ২৬টি শাকের বিভিন্ন তথ্যগুলিকে সাজিয়ে নেয়া হয়। একই সঙ্গে রিদয়পুর কেন্দ্রের (টাঙ্গাইল) আশপাশ থেকেই ৩৭টি শাকের হার্বেরিয়াম শিট তৈরী করে ফেলা হয়। পরে এই শিটগুলো নতুন গবেষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে বিভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন নামে একই গাছ চেনার জন্যও হার্বেরিয়াম শিট ব্যবহার করা হয়। সাধারণভাবে এই প্রক্রিয়া উবিনীগ ও নয়াকৃষি কেন্দ্রের সকল কর্মীদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও পদ্ধতিগত গবেষণার শক্তি বৃদ্ধি করেছে। এখান থেকেই আমরা নিয়মিত এই ধরণের চর্চাকে সংগঠনের নিয়মিত প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করি। আঠারোই অক্টোবর থেকেই পুরোদমে কাজ শুরু হয়ে যায়।

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তিন এলাকাতে প্রায় একই ধরণের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। তথ্য সংগ্রহের সময় কখনও বা কাঁধে ঝুলানো ব্যাগ, এর সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও হার্বেরিয়াম শিট তৈরী করার জিনিস পত্রাদি থেকেছে। কখনও আবার ব্যাগ ছাড়াই তথ্য সংগ্রহের কাজ চালিয়েছেন কর্মীরা। তথ্য আনতে প্রয়োজন মত হাঁটা পথ ও যানবাহন ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রকল্পের কৃষি বিভাগের কর্মীদের নিয়ে কয়েকটি গ্রুপ করা হয়। তারপর তথ্য সংগ্রহের জন্য এই গ্রুপগুলোকে বিভিন্ন গ্রামে পাঠানো হয়। একনাগাড়ে কয়েকদিন তথ্য আনার পর গ্রুপের সদস্যরা সবাই একত্রে সংগৃহীত শাকের (নামের) চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরী করে। প্রতিবেদন তৈরীর পর গ্রাম কর্মী ও অভিজ্ঞ দাইদের সাথে খসড়া প্রতিবেদনটি নিয়ে আলোচনা করে প্রতিবেদনটিকে আরও সমৃদ্ধ করা হয়। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গ্রাম কর্মীরা সার্বক্ষণিক ভাবে সহায়তা করেছে। এদের মধ্যে অভিজ্ঞ গ্রাম কর্মীদের একত্রে ডেকে কুড়িয়ে পাওয়া শাকের তথ্য সংগ্রহের বিষয়গুলো ভাল করে বুঝিয়ে দেয়া হয়। তারা সে অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রাম থেকে এ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে এনে দেন। গ্রামের প্রবীণ মহিলা ও অভিজ্ঞ কবিরাজ বিশেষ করে মহিলা কবিরাজদের কাছ থেকে অধিকাংশ তথ্য পাওয়া গেছে।

তথ্য সংগ্রহকারী কর্মীরা পথে হাঁটতে হাঁটতে চেনা অচেনা গাছ ও লতা পাতা যা দেখেছেন এরমধ্যে প্রয়োজনীয়গুলো কুড়িয়ে ব্যাগে ঢুকিয়েছেন। চলার পথে প্রয়োজন বোধে একটি বাড়িতে ঢুকে হার্বেরিয়াম করার

সময় বাড়ির মেয়েরাই তাঁদেরকে বাড়ির আশপাশ ও আগান-বাগান থেকে গাছ ও লতা পাতা কুড়িয়ে এনে দিয়েছেন। এদের সাথে অধিকাংশ সময়ে গাছ ও লতা পাতা সংগ্রহের স্থানে গিয়েছেন। তাতে করে গাছ চিনতে ও জন্মানোর পরিবেশ স্বচক্ষে দেখা হয়েছে। ফলে শাকটি সমন্ধে পুরা তথ্য লিখতে সুবিধা হয়েছে। খাতায় তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন কখনও হাঁটিতে হাঁটতে, কখনও গাছতলায় বসে, কখনও বা কারও বাড়িতে বসে।

একটি শাকের বিষয়ে যখন দুই রকম তথ্য এসেছে তখন গ্রামের অন্যান্য প্রবীণ বা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে যেতে হয়েছে। গাছ জন্মানোর স্থানে যেয়ে তথ্যের সত্যতা যাচাই করা হয়। আবার এমনও দেখা গেছে দুই একটি শাকের নাম পাওয়া যায় নি কিন্তু গ্রামের লোকেরা এটা খেয়ে থাকে ও ওষুধ হিশেবেও ব্যবহার করে। দূর দূরান্তের অভিজ্ঞ কবিরাজদের কাছ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া শাকের তথ্য নেয়া হয়েছে। এর ফলে এদের কাছ থেকে নিবিড়ভাবে তথ্য নেয়া সম্ভব হয়েছে। আবার প্রকল্পে সকল কর্মীদের কাছ থেকেও তথ্য নেয়া হয়। কর্মীরা রাতে যখন তাদের কাজের টেবিলে বসে, তখন কর্মীদের কাছ থেকে পর্যায়ক্রমে তথ্য নেয়া হয়। আবার নতুন শাক পেলে গবেষকরা যখন যে কর্মীকে সামনে পেয়েছে তখনই তার কাছ থেকে তথ্য জেনে নিয়েছে। কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ চলাকালে অভিজ্ঞ কৃষকদের কাছ থেকেও কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের উপর তথ্য নেয়া হয়েছে। তবে প্রতিটি তথ্য সঠিক কি না তা বার বার পর্যালোচনা করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের সময় সমস্যা

সময়ের স্বল্পতার কারণে আরও নতুন নতুর অঞ্চলে যাওয়া সম্ভব হয় নি। গেলে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যেত। অনেক গাছ এলাকায় খুবই বিরল মনে হয়েছে। এলাকাবাসীরাই বলছে এইসব গাছ আর সচরাচর দেখা যাচ্ছে না। যেমন, পুটি শাক ও চুকা কলা। হয়তোবা এই গাছ অচিরেই হারিয়ে যাবে। এইসব বিলুপ্ত প্রায় গাছের ছবি রাখা দরকার ছিল।

অনেক সময় একটি শাক সম্বন্ধে দুই জায়গাতে বা দুই ব্যক্তির কাছে দুই ধরণের বিপরীতমুখী তথ্য পাওয়া গেছে। যখনই এই তথ্য সম্পর্কে মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে, সন্দেহ ঘুচানোর জন্য গাছ জন্মানোর স্থানে গবেষকরা গিয়েছেন আবার অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে গিয়ে তথ্য যাছাই করেছেন তারপর খাতায় লিপিবদ্ধ করেছেন।

শাকের সাধারণ নাম দেয়া নিয়ে একটু বিভ্রান্তিতে পড়তে হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় - একটি শাক দুইটি অঞ্চলে দুই নামে পরিচিত অর্থাৎ দুই অঞ্চলে তারা শাকটিকে দুই নামেই চিনে। এই ক্ষেত্রে শাকটির সাধারণ নাম কি হবে, যে নামটি দিলে মোটামুটি সবাই চিনবে, চিন্তা করা হয়েছে। সাধারণ নাম যখন পাওয়া যায় নাই তখন প্রতিবেদনে শুধুমাত্র আঞ্চলিক নামই ব্যবহার করতে হয়েছে। এলাকার প্রাকৃতিক ভিন্নতার কারণে একই শাক ঋতুভেদে একই সময় জন্মায় না। ফলে কোন্ শাক কোন্ সময়, কোন্ এলাকায় জন্মায় তা সাধারণভাবে বলা অনেক সময় কঠিন ছিল।

এলাকা ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের অভিজ্ঞতা

কুড়িয়ে পাওয়া শাকের গবেষণাটি তিনটি জেলায় পরিচালিত হয়েছে। এই তিনটি এলাকা বেছে নেয়ার প্রথম কারণ ছিল এখানে নয়াকৃষি আন্দোলনের কাজ খুব জোরালোভাবে আছে। রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার বন্ধ হবার পর এখানে কুড়িয়ে পাওয়া শাকের প্রাপ্তি ও ব্যবহার আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। সে কারণে এই গবেষণার জন্য তথ্য নয়াকৃষি এলাকাগুলো থেকেই প্রধানতঃ নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় কারণটি ছিল, এই তিনটি এলাকায় তিনটি ভিন্ন ধরণের ভৌগলিক পরিস্থিতি পাওয়া যায়, যা গবেষণায় তথ্যের বৈচিত্র্য আনার জন্যে খুবই জরুরী।

এই তিন প্রকৃতির অঞ্চল হচ্ছে:

১. সমতল ভূমি ও বন্যা কবলিত অঞ্চল - টাঙ্গাইল

২. বিল ও খরা পিড়িত অঞ্চল - ঈশ্বরদী

৩. পাহাড়ী ও উপকূলীয় অঞ্চল - কক্সবাজার

১. সমতল ভূমি ও বন্যা কবলিত অঞ্চল - টাঙ্গাইল

প্রাকৃতিক দিক থেকে টাঙ্গাইল অঞ্চল সমতল ভূমি ও বন্যা কবলিত অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, ভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী টাঙ্গাইলে রয়েছে আরও ছোট ছোট কয়েকটি পৃথক অঞ্চল।

ক. নদী বিধৌত সমতল ভূমি এলাকা (এই এলাকার মাটি, পলি ও দো-আঁশ)

খ. নদী বিধৌত চর ও সমতল এলকা (এই এলাকার মাটি বেলে ও বেলে দো-আঁশ)

গ. সমতল ও বনাঞ্চল এলাকা (এই এলাকার মাটি এটেল ও দো-আঁশ)

ঘ. বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর নিয়ন্ত্রণাধীন সমতল ও নীচু এলাকা
(এই এলাকার মাটি প্রধানতঃ পলি ও দো-আঁশ)

টাঙ্গাইল এলাকার এই চারটি অঞ্চলেই কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের ওপর গবেষণা হয়েছে। এখনো নিয়মিতভাবে তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে।

টাঙ্গাইল এলাকায় কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের গবেষণার কাজ যেভাবে শুরু হয়

১৯৯৭ সালের অক্টোবর মাসে টাঙ্গাইল এলাকায় কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের গবেষণার কাজ প্রথম শুরু হয়। টাঙ্গাইল ও ঈশ্বরদী এলাকা থেকে প্রাপ্ত প্রাথমিক কিছু তথ্য নিয়ে টাঙ্গাইলে নিজেদের মধ্যে একটি আলোচনা ও তথ্য বিনিময় সভা হয়। ঐ সভায় বদরখালী, ঈশ্বরদী, টাঙ্গাইল ও ঢাকার মোট ৩৮ জন কর্মী অংশগ্রহণ করেন। ঐ সভায় বদরখালী, ঈশ্বরদী ও টাঙ্গাইল এলাকায় কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের গবেষণার কাজে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মীবাহিনী এবং গবেষণার পদ্ধতি ঠিক করা হয়। এরপর বিভিন্ন কেন্দ্রের কর্মীরা নিজ নিজ এলাকায় কাজ শুরু করেন।

এলাকা নির্বাচন: দেলদুয়ার উপজেলা, টাঙ্গাইল

ভৌগলিক দিক থেকে দেলদুয়ার উপজেলা সমতল ও নদী বিধৌত সমতল এলাকার মধ্যে পড়েছে। এক যুগেরও বেশী সময় ধরে আমরা এই এলাকায় কাজ করছি। ফলে দীর্ঘদিনের কাজের অভিজ্ঞতা এবং এলাকার লোকদের সাথে সম্পর্ক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনুকূল ও ইতিবাচক বাস্তবতার কারণে দেলদুয়ার উপজেলাকে গবেষণার প্রধান এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। দেলদুয়ারের বাইরে বাসাইল, ভুয়াপুর, মধুপুর এবং নাগরপুর এলাকা থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

টাঙ্গাইলের ৪টি এলাকাকে প্রধানত: কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের গবেষণার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। এই ৪টি এলাকা হচ্ছে:

ক. দেলদুয়ার ও বাসাইল উপজেলা: নদী বিধৌত সমতল ভূমি এলাকা, এই এলাকার মাটি, পলি ও দো-আঁশ।

খ. ভুয়াপুরঃ এখানে নদী বিধৌত চর ও সমতল এলাকা, এই এলাকার মাটি বেলে, বেলে দো-আঁশ ও পলি দো-আঁশ।

গ. টাঙ্গাইল সদরঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর নিয়ন্ত্রণাধীন সমতল ও নীচু এলাকা, এই এলাকার মাটি প্রধানতঃ পলি বেলে ও দো-আঁশ।

দেলদুয়ার ও বাসাইল উপজেলা

প্রাকৃতিক ভিন্নতা অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহের জন্য দুটি এলাকাকে আরও ৪টি উপ-অঞ্চলে ভাগ করা হয়।

১. নীচু ও বিল এলাকা: এখানে গড়ে বছরের প্রায় ৮ মাস পানি থাকে। এই এলাকায় শাপলা, শালুক, ঢ্যাপ ও চেঁই্চাসহ পানিতে হয় এমন কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের বৈচিত্র্য অনেক। এই এলাকার অতি গরিব পরিবারের মহিলারা শাপলা, শালুক, ঢ্যাপ, চেঁই্চা ও মাছসহ কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য সারা বছরের জন্য সংরক্ষণ করে রাখেন।

২. সমতল এলাকা: এই এলাকায় বছরে দুই থেকে তিনটি ফসলের আবাদ হয়। ধান, পাট, আখ, গম, ডাল, সরিষা, পায়রা ও শাকসবজি এই এলাকার প্রধান ফসল। দেলদুয়ার উপজেলার দক্ষিণ পশ্চিম পাশে যমুনা ও ধলেশ্বরী নদীর অবস্থান। উপজেলার অভ্যন্তরে রয়েছে লৌহজং নদী। নদীর অববাহিকায় নানান জাতের কুড়িয়ে পাওয়া শাক পাওয়া যায়। বর্ষা মৌসুমে নদী থেকে প্রচুর পলি জমিতে পড়ে। ফলে প্রাকৃতিকভাবে এই এলাকার জমি তুলনামূলকভাবে উর্বর। বিভিন্ন মৌসুমে এখানে বিচিত্র রকমের কুড়িয়ে পাওয়া শাক পাওয়া যায়। শীতকালে সরিষা ও শাক-সবজির জমিতেও বথুয়াসহ নানান জাতের কুড়িয়ে পাওয়া শাক পাওয়া যায়।

৩. নয়াকৃষি এলাকা: গবেষণা চলাকালীন সময় পর্যন্ত এই এলাকার ১৬টি গ্রামকে নয়াকৃষি গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই গ্রামগুলোতে কোন ধরণের রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা হয় না। গ্রামগুলো কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যসহ প্রাণবৈচিত্র্যে ভরপুর এবং সমৃদ্ধ।

৪. রাসায়নিক কৃষি এলাকা: এই এলাকার যেসব গ্রামগুলোতে এখনও রাসায়নিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ (অর্থাৎ রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার) হচ্ছে ঐ গ্রামগুলোতে কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যসহ প্রাণবৈচিত্র্য নয়াকৃষি এলাকার তুলনায় অনেক কম।

ভুয়াপুর উপজেলা

ভুয়াপুর এলাকার একটি ইউনিয়ন হতে কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ইউনিয়নের নাম গোবিনদাসী। ভুয়াপুর উপজেলার গা ঘেষে যমুনা নদীর অবস্থান। যমুনা সেতু নির্মানের জন্য যমুনা নদীর ৮ কিলোমিটার প্রশস্থতাকে সংকুচিত করে ৪.৫ কিলোমিটার করার ফলে এই এলাকায় নদী ভাঙ্গন মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। ভুয়াপুর থানার একটি বড় অংশ এই ভাঙ্গনের কবলে পড়েছে। পাশাপাশি এলাকার বিশাল অংশ জুড়ে বালুর চর পড়েছে। কৃষি আবাদ ও প্রাণবৈচিত্র্য এই এলাকায় মারাত্মকভাবে লোপ পেয়েছে। যমুনা নদী থেকে একটি বেড়ি বাঁধ গোবিনদাসী ইউনিয়নের ভিতর দিয়ে ভুয়াপুর ঘাটের সাথে মিশেছে। এর ফলে বাঁধের ভিতরে নদী থেকে পানি আসতে না পারার ফলে এখনকার সমতল ভূমিতে স্বাভাবিক পলি পড়ে না। আমরা বাঁধের অভ্যন্তর এবং বাঁধের বাহির দুই এলাকা থেকেই কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের তথ্য সংগ্রহ করেছি।

মধুপুর উপজেলা

মধুপুর উপজেলা অরণখোলা ইউনিয়ন থেকে কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই ইউনিয়নের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল সমতল এবং বাকী অংশ শালবন। অবশ্য এখন শালবনে শালগাছের চেয়ে এ্যাকাশিয়া গাছের প্রাধান্য অনেক বেশী। শালবনের ভিতরে মাঝে মাঝে নীচু সমতল ভূমি রয়েছে। শালবন এলাকা একসময় গারো অধ্যুষিত এলাকা হিশেবে পরিচিত থাকলেও বর্তমানে অনেক মুসলমানও ঐ এলাকায় বসবাস করছেন। বনাঞ্চল ও সমতল এলাকার মিশ্রণ এবং সমতল এলাকায় কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের ভিন্নতা রয়েছে। মধুপুর বনাঞ্চলে বিশেষ জাতের কচু, তোক্মা ও বিশেষ কিছু জাতের বনআলুসহ নানান রকমের কুড়িয়ে পাওয়া শাক পাওয়া যায়। আমরা দুই এলাকা থেকেই কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের তথ্য সংগ্রহ করেছি।

টাঙ্গাইল সদর উপজেলা

বাংলাদেশ, নেদারল্যাণ্ড এবং জার্মান সরকারের যৌথ আয়োজন ও অনুদানে বন্যা কার্যক্রম পরিকল্পনা ফ্যাপ-২০ নামে একটি প্রকল্প নেয়া হয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের নামে অপরিকল্পিতভাবে বাঁধ ও স্লুইজগেট তৈরী করে ধ্বংস করা হয়েছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। এলাকার প্রাণসম্পদ ও প্রাণবৈচিত্র্য প্রায় বিলুপ্তির পথে। ফ্যাপ-২০ আওতাধীন মোট জমির পরিমাণ ১৩,৩০৫ হেক্টর। এই এলাকায়ও আমরা কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের উপর কাজ করেছি।

টাঙ্গাইল এলাকায় তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি:

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কতগুলো সাধারণ নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে।

এক: এমন পরিবারের কাছ থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে যারা কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য সংগ্রহের সাথে সরাসরি যুক্ত এবং অভিজ্ঞ।

দুই: অভিজ্ঞ দাই ও কবিরাজ, যারা কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য এবং ওষুধী গাছ নিয়ে এলাকায় কাজ করছেন।

তিন: কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য ও এলাকার চাষাবাদ সম্পর্কে অভিজ্ঞ প্রবীণ কৃষক।

চার: নয়াকৃষির সাথে সরাসরি যুক্ত কৃষক।

পাঁচ: নয়াকৃষি করছেন না এমন কৃষক।

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে প্রধানতঃ তিন পদ্ধতিতে:

১. দলীয় আলোচনার ভিত্তিতে

২. একক আলোচনার ভিত্তিতে

৩. পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে

দলীয় আলোচনার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ

দলীয় আলোচনা কখনও নয়াকৃষি কেন্দ্রে হয়েছে, কখনও আবার গ্রামে কৃষকদের বাড়িতে হয়েছে। দলীয় আলোচনা কয়েকটি রূপে হয়েছে। যেমন,

এক: গ্রামকর্মী, অভিজ্ঞ কৃষক, অভিজ্ঞ কবিরাজ ও কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের উপর নির্ভরশীল নারী সদস্যদের নিয়ে নয়াকৃষি কেন্দ্রে কুড়িয়ে পাওয়া বিভিন্ন খাদ্যের উপর আলোচনার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বিষয়টি সমন্ধে কেন্দ্রের সকল কর্মীই অবহিত থাকার ফলে কেন্দ্রে দলীয় আলোচনার সময় কেন্দ্রের অন্যান্য কর্মীদের সহযোগিতা পাওয়া গেছে।

দুই: গ্রামে কৃষকদের বাড়িতে কৃষক, ধাত্রী ও কবিরাজসহ গ্রামের অন্যান্য কৃষক মিলে আলোচনার সময়ও গ্রামকর্মীরা সরাসরি সহায়তা করেছেন।

তিন: গবেষণা কর্মীরা গ্রামে কোন কৃষকের বাড়িতে কুড়িয়ে পাওয়া শাক সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলে আস্তে আস্তে আশে পাশের এলাকা থেকে লোকজন আসতে শুরু করে এবং এক পর্যায়ে এই একক আলোচনাটি দলীয় আলোচনায় রূপ ধারণ করে।

চার: নয়াকৃষি দলীয় আলোচনা সভায় কৃষকদের সাথে আলোচনা করেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

দলীয় সভায় অনেক কৃষক নিজ নিজ অঞ্চল থেকে কুড়িয়ে পাওয়া শাক ও লতা পাতা সাথে নিয়ে এসেছেন। আবার মাঠে (জমির আইল, ফসলের জমি, রাস্তার পাশ) গিয়ে শাক দেখে অন্য কৃষকদের সাহায্যে নিশ্চিত হয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব শাক ও লতাপাতা সাথে সাথেই হার্বেরিয়াম করা হয়েছে। গবেষণা কর্মীরা প্রতিটি শাক ধরে ধরে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

একক আলোচনার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ

গ্রামে কৃষকদের বাড়িতে এক একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে শুধুমাত্র সেই পরিবারের মহিলার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। একক সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে ওসব পরিবারকে শনাক্ত করা হয়েছে যারা সারা বছর কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য সংগ্রহের সাথে সরাসরি যুক্ত।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ

তথ্য সংগ্রহকারীরা অনেক সময় কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের উপর তথ্য আনতে গিয়ে গাছ জন্মানোর স্থান যেমন মাঠ, ফসলের জমি, আইল, রাস্তাঘাট, খাল, বিল ও অন্যান্য জলাশয়ের আশপাশে গিয়ে সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শাক সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তথ্যের নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের বিষয়টি খুবই ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে।

কেইস স্টাডি: কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের উপর নির্ভরশীল অতি গরিব পরিবারের কিছু কেইস স্টাডি নেওয়া হয়েছে। কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের পর্যাপ্ততা এবং বৈচিত্র্যের সাথে গ্রামের গরিব পরিবারের খাদ্যের সরাসরি সম্পর্কের বিষয়টি সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা এই কেইস স্টাডিগুলো থেকে পাওয়া গেছে।

কুড়িয়ে পাওয়া শাকের ওষুধী ও পুষ্টিগুণ এবং রন্ধন প্রণালী সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

ক. নয়াকৃষি তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্রের সুবিধা

কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য গবেষণার একটি বড় সুবিধা ছিল গবেষণা এলাকাতেই নয়াকৃষি তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্রের অবস্থান। এই পর্যন্ত সংগৃহীত শাকের বেশীর ভাগই নয়াকৃষি তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্রের অভ্যন্তরে কিংবা আনাচে কানাচে ছিল। ফলে যে কোন শাকের পরিবেশ বৈশিষ্ট্যসহ শাক সম্পর্কে খোঁজখবর ও পর্যবেক্ষণ নয়াকৃষি কেন্দ্রে সহজেই করা গেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গবেষণা কর্মীরা গ্রামের কৃষকদের কেন্দ্রে নিয়ে এসে আলোচনা সভার মাধ্যমেও অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং গ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করেতে পেরেছেন। গবেষণা এলাকাতেই নয়াকৃষি তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্রের অবস্থানের ফলে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে এলাকার লোকজনের আন্তরিক সহযোগিতা সবসময়ই পাওয়া গেছে, যাতায়াতে সময় কম লেগেছে এবং অধিক সময় তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে।

খ. তথ্যের বৈচিত্র্য

টাঙ্গাইলের ৪টি থানায় প্রধানত কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের এই গবেষণা হয়েছে-

এক: এলাকাভেদে একই শাকের বিভিন্ন নাম দেখা গেছে। যেমন- দেলদুয়ারে থানকুনীকে বলা হয় ক্ষুইদামানকুনি, বাসাইলের কিছু এলাকায় থানকুনিকে বলা হয় টেহা পাতা। হেলেঞ্চা শাককে বাসাইলে (টাঙ্গাইল) বলা হয় বইর‍্যান। দেলদুয়ারে শাপলাকে বলা হয় হাপলা, বাসাইলে বলা হয় হাবলা। দেলদুয়ারে তেলাকুচাকে বলা হয় তেলাকুচি, ভুয়াপুরে বলা হয় তেলাকুচ, বাসাইলে বলা হয় কাইয়ার কাঁঠাল। নাগরপুরে বতুয়া শাককে বলা হয় বাইতা, বাসাইলে বলা হয় বউত। বেশীর ভাগ শাকের ক্ষেত্রে এলাকাভেদে নামের এই বৈচিত্র্যতা দেখা গেছে। এমনকি একই জেলার বিভিন্ন থানায় নামের পার্থক্য দেখা গেছে।

দুই: শাক খাওয়ার ক্ষেত্রেও এলাকাভেদে বৈচিত্র্যতা ও ভিন্নতা লক্ষ্য করা গেছে। যেমন, দেলদুয়ার ও ভুয়াপুর এলাকায় রসুন শাক হিশেবে খাওয়া হয় কিন্তু বাসাইল এলাকায় রসুন শাক খাওয়া হয় না, ঘাস হিসেবে গবাদী পশুকে খাওয়ানো হয়।

তিন: শাক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এলাকাভেদে তারতম্য দেখা গেছে। যেমন, দণ্ডকলস শাক দেলদুয়ারে ব্যবহার হয় শাক ও ওষুধ হিশেবে, ভুয়াপুর ও বাসাইলে শুধু ওষুধ হিশেবে ব্যবহার হয়।

চারঃ শাক রান্নার ক্ষেত্রে ধনী ও গরিব পরিবারের মধ্যে তথ্যের পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। দেখা গেছে গরিব পরিবারের রান্নার মধ্যে কয়েকটি শাক একসাথে মিশিয়ে রান্না করা হয়, কিন্তু ধনী পরিবারে সাধারণত এক ধরণের শাকই রান্না করা হয়।

পাঁচঃ শাক রান্নার সময় দেখা গেছে ধনী পরিবারে অনেক বেশী মসলা ব্যবহার করা হয় এবং গরিব পরিবারে খুব কম মসলা ব্যবহার করা হয়।

ছয়ঃ তথ্য আনতে গিয়ে দেখা গেছে সাধারণত ধনীদের তুলনায় গরিবরা অনেক বেশী শাক খায়।

সাতঃ শাক সংগ্রহের ক্ষেত্রেও ধনী ও গরিব পরিবারের মধ্যে পার্থক্য দেখা গেছে। সাধারণত গরিবরা শাক কুড়িয়ে আনেন এবং ধনীরা বাজার বা গরিবদের কাছ থেকে কিনে খান।

গ. বিশেষ অবস্থায় কুড়িয়ে পাওয়া শাকের প্রাপ্তি

খরার সময়

১৯৯৮ সালে বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ মাসে যথেষ্ট বৃষ্টি না হওয়ার ফলে খরা ভাব দেখা দেয়। তখন মাঠ ঘাট শুকিয়ে যায় এবং অনেক ফসলেরই অসুবিধা দেখা দেয়। এ সময় আমরা তিন এলাকাতেই কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের অবস্থা এবং তা মানুষের খাদ্য কতটুকু যোগান দিতে পারে এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে তথ্য সংগ্রহ করেছি।

বন্যার সময়

১৯৯৮ সালের ভাদ্র-আশ্বিন মাসে সারাদেশে দীর্ঘস্থায়ী বন্যা হয়। বন্যার পানি নামার পরপরই আমরা তিন এলাকাতেই কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের পর্যাপ্ততা, অবস্থান এবং গ্রামীণ পরিবারগুলো কতটুকু এবং কি পরিমাণ সংগ্রহ করতে পারছেন এই সব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছি।

বন্যার সময় গ্রামীণ পরিবারগুলো কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের উপর কতটুকু নির্ভরশীল ছিলেন এই বিষয়ে আমরা টাঙ্গাইলে **১০০**টি পরিবারের ৭ দিনের খাবারের উপর একটি পর্যবেক্ষণ করেছি।

সারা বছরের কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য

দুইটি গ্রামে কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এমন **২৫**টি পরিবারের সারা বছরে কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য কি কি এবং কি পরিমাণ খান এর উপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের উপর নির্ভরশীল এমন **১০**টি পরিবারের কেইস স্টাডি নেওয়া হয়েছে।

কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের রান্না

এলাকাভেদে রন্ধন প্রণালীর বৈচিত্র্যতার উপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। রন্ধন প্রণালীর উপর তথ্য সংগ্রহের সময়কাল ছিল **১৯৯৯** - ২০০০ সাল।

শাকের মনোগ্রাফঃ

প্রতিটি শাক সম্পর্কে জানার জন্য একটি কাঠামো তৈরী করা হয়েছে। ঐ কাঠামো অনুযায়ী প্রতিটি শাকের মনোগ্রাফ করা হয়েছে।

বিল ও খরাপিড়িত অঞ্চল - ঈশ্বরদী

পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানায় আমাদের কাজ শুরু হয় একটু দেরীতে। টাঙ্গাইলে কাজের ওপরই প্রথম অবস্থায় বেশী গুরুত্ব দেয়া হয় কিন্তু পরে ঈশ্বরদীতেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

ঈশ্বরদী থানার উত্তর পাশে নাটোর জেলার বড়াই গ্রাম থানা। উত্তর-পশ্চিমে নাটোর জেলার লালপুর থানা। পশ্চিমে ও দক্ষিণে পদ্মা নদী। দক্ষিণ-পূর্বে পাবনা সদর থানা এবং পূর্বে আটঘরিয়া থানা। ঈশ্বরদী থানায় মোট ৭টি ইউনিয়ন আছে। এগুলো হলো ১. মুলাডুলি, ২. দাশুড়িয়া, ৩. ছলিমপুর, ৪. সাহাপুর, ৫. লক্ষ্মীকুন্ড, ৬. পাকশী ও ৭. সাড়া ইউনিয়ন।

ক. ইউনিয়নগুলোর অবস্থান ও ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য

১. ঈশ্বরদী থানার উত্তর-পশ্চিমে সাড়া ইউনিয়ন

এই ইউনিয়নের আয়তন ৫,৩১৭ একর। মোট লোক সংখ্যা ২০,০৭১ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ১০,৩২০ জন, মহিলা ৯,৭৫১ জন। শিক্ষার হার ৩২.১%। সাড়া ইউনিয়নের উত্তর পাশে লালপুর থানার পশ্চিমে পদ্মা নদী। পূর্বে পাকশী ইউনিয়ন এবং উত্তরে ঈশ্বরদী পৌরসভা। এই ইউনিয়নটি পদ্মা নদীর পাড়ে অবস্থিত বলে এখানকার জমির মাটিতে বালির পরিমাণ বেশী। এখানকার কিছু এলাকা নিচু এবং কিছু উঁচু এলাকা। উঁচু জায়গায় কিছু কিছু চৈতালী এবং আউশ ধান হয়। নিচু এলাকায় কিছু উফসী ধানের চাষ হয় আবার বর্ষা মৌসুমে কিছু আমন ধানের চাষ হয়। চর এলাকার কারণে এখানে গাছ পালার সংখ্যা খুব কম। এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ খুব রুক্ষ। গরমের সময় খুব গরম এবং শীতের সময় খুব শীত পড়ে। এখানে বেশী আখের চাষ হয়।

২. পাকশী ইউনিয়ন

সাড়া ইউনিয়নের ঠিক পূর্ব পাশে পাকশী ইউনিয়ন অবস্থিত। দক্ষিণে পদ্মা নদী, পূর্বে লক্ষ্মীকুন্ড ইউনিয়ন। উত্তরে ঈশ্বরদী পৌরসভা এবং ছলিমপুর ইউনিয়ন। পাকশীর দক্ষিণে পদ্মা নদীতে একটা নৌকা ও ফেরীঘাট রয়েছে এবং বাংলাদেশের বিখ্যাত রেল সেতু পাকশী অবস্থিত। এই রেল সেতু পদ্মা নদীর উপর দিয়ে উত্তরবঙ্গের সাথে দক্ষিণ বঙ্গের যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটা বন্ধু হিশাবে কাজ করছে। পাকশী ইউনিয়নের আয়তন ৪৮০২ একর। মোট জনসংখ্যা ৩০৪৮৭ জন। মহিলা ১৪,৮৬৬ জন এবং পুরুষ ১৫, ৬২১ জন। শিক্ষার হার মোট ৫৩%। ঈশ্বরদী থেকে রেল লাইন পাকশীর ভিতর দিয়ে কুষ্টিয়ার দিকে চলে গেছে। এখানে একটি কাগজ কল আছে। রেল লাইনের পূর্ব পাশের এলাকা উঁচু। এখানে শাক-সবজিসহ অন্যান্য ফসল বেশী হয় এবং ভাল হয়। জমির মাটি বেলে দোঁ-আঁশ মাটি। এখানে বড় বড় ফলের গাছ ও অন্যান্য গাছ-পালা বেশী। ইক্ষুর আবাদ বেশী হয়। রেল লাইনের পশ্চিম পাশের জমি নিচু। এখানে কিছু আমন ধান হয়। সেই সাথে উফশীর চাষ হয়। গাছপালার সংখ্যা খুবই কম। জনবসতি কম। এই ইউনিয়নের ভিতর দিয়ে ছোট বড় কয়েকটি পাকা রাস্তা রয়েছে। এখানে ব্যবসায়ীক লোক বেশী।

৩. লক্ষ্মীকুন্ড ইউনিয়ন

পাকশী ইউনিয়নের সোজা পূর্ব পাশে লক্ষ্মীকুন্ড ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নে মোট ৩৬টি গ্রাম আছে। আয়তন ১২,৫০৩ একর। মোট জন সংখ্যা ১৫,৮২৩ জন। মহিলা ৭,৪৭৫ জন, পুরুষ ৮,৩৪৮ জন। শিক্ষার হার মোট ২১.১%। এই ইউনিয়নের অবস্থান পদ্মা নদীর পাড়ে। এখানে বেলে দো-আঁশ মাটি বেশী। কোন জায়গায় বালি খুব বেশী। বেড়ি বাঁধের উত্তর পাশ দিয়ে প্রচুর শাক সবজি ও অন্যান্য ফসল ভাল হয়। এখানে কিছু জায়গায় বেশ উফশীর চাষ হয়। এখানে আম, কাঁঠালের গাছ বেশী আছে। এছাড়া অন্যান্য গাছপালা যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। তারপরেও প্রকৃতি কিছুটা রুক্ষ। গরমের সময় বেশী গরম পড়ে আবার শীতের সময় বেশী শীত পড়ে।

৪. সাহাপুর ইউনিয়ন

লক্ষ্মীকুন্ড ইউনিয়নের উত্তর পাশে সাহাপুর ইউনিয়ন অবস্থিত। আয়তন ৬,৭৯০ একর। জনসংখ্যা ৩২,৬৩৯ জন। পুরুষ ১৬,৭৭৫ জন এবং মহিলা ১৫,৮৪৬ জন। শিক্ষার হার মোট ২৬.৬%। সাহাপুর ইউনিয়ন ঈশ্বরদী থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। এই ইউনিয়ন দক্ষিণ-পূর্বে লক্ষ্মীকুন্ড ইউনিয়ন, পূর্ব পাশে পাবনা, উত্তর পাশে

ছলিমপুর ইউনিয়ন, পশ্চিম পাশে পাকশী ইউনিয়ন। এখানে বেলে দোআঁশ মাটি। এখানে বিভিন্ন ধরনের ফলের গাছ এবং অন্যান্য গাছ পালা পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। এখানে বাণিজ্যিকভাবে সবজি এবং কাঁঠাল ও লিচুর চাষ হয়। এলাকায় যথেষ্ট গাছপালা থাকা সত্তেও গরমের সময় খুব গরম এবং শীতের সময় খুব শীত পড়ে। সাহাপুর ইউনিয়নের কিছু জায়গায় সামান্য উফশী ধানের চাষ হয়। গরু-ছাগলের সংখ্যা খুব কম।

৫. ছলিমপুর ইউনিয়ন

ঈশ্বরদী থেকে দক্ষিণ-পূর্ব কোনে ছলিমপুর ইউনিয়নের অবস্থান। উত্তরে মুলাডুলি ইউনিয়ন, পশ্চিমে পাকশী ইউনিয়ন। উত্তর-পশ্চিম কোনে ঈশ্বরদী পৌরসভা। দক্ষিণে সাহাপুর ইউনিয়ন এবং পূর্বে দাশুড়িয়া ইউনিয়ন। আয়তন ৮,২৫৫ একর। মোট জনসংখ্যা ৩২,৪৯৫ জন। মহিলা ১৫,৪৫৩ জন, পুরুষ- ১৭০৪২ জন। শিক্ষার হার ৩২.১%। এখানকার মাটির ধরণ বেলে দো-আঁশ। এখানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শাক সবজির চাষ হয়। ফলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, পেঁপে, কাগজী লেবু বাণিজ্যিক ভাবে চাষ হয়। এছাড়া অন্যান্য ফলের গাছ এবং বনজ গাছপালা পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। এখানে সামান্য আউশ ধান ছাড়া অন্য কোন ধানের চাষ হয় না। চৈতালীর মধ্যে কিছু গম ও মশুর ডাল হয়। গরু-ছাগল খুব কম। এই এলাকায় কখনও বন্যার পানি হয় না। তবে অত্যাধিক গরম ও শীত পড়ে।

৬. দাশুড়িয়া ইউনিয়ন

ঈশ্বরদী থেকে পূর্ব দিকে দাশুরিয়া ইউনিয়নের অবস্থান। উত্তরে মুলাডুলি, দক্ষিণে ছলিমপুর, পশ্চিমে ছলিমপুর ও মুলাডুলি ইউনিয়ন। পূর্বে আটঘরিয়া থানা। আয়তন ৭,৩৪৭ জন, জনসংখ্যা ২১,৫৯০ জন। পুরুষ ১১,২২৯, মহিলা ১০,৩৬১। শিক্ষার হার ২৮.১%। এই ইউনিয়নের বেশীর ভাগ এলাকা নিচু। এখানে শাক সবজির আবাদ খুব কম। উফশী ধানের আবাদ বেশী এমনকি তিনটা মৌসুমে এখানে উফশীর চাষ করা হয়। তবে আমন মৌসুমে অল্প কিছু স্থানীয় আমন ধানের চাষ করা হয়। ফলসহ অন্যান্য গাছপালা খুব কম। গরমের সময় খুব গরম এবং শীতের সময় খুব শীত পড়ে। এখানে দো-আঁশ মাটি আছে তবে এঁটেল, দো-আঁশ মাটি বেশী। বন্যার সময় কিছু এলাকায় পানি থাকে।

৭. মুলাডুলি ইউনিয়ন

ঈশ্বরদী থেকে উত্তর-পূর্ব পাশে মুলাডুলি ইউনিয়ন অবস্থিত। উত্তরে নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম থানা। পূর্বে আটঘরিয়া থানা। দক্ষিণে দাশুড়িয়া ও ছলিমপুর ইউনিয়ন। পশ্চিমে পৌরসভা। আয়তন ১০,৫৪৮ একর। জনসংখ্যা ৩২০৮৭ জন, পুরুষ ১৬,৫৪৮ জন, মহিলা ১৫,৫৩৯ জন। শিক্ষার হার মোট ২২.৭%। এই ইউনিয়নের মাঝখান দিয়ে ঢাকা-রাজশাহী রোড চলে গেছে। গোটা ইউনিয়নটাই বলতে গেলে নিচু। বন্যার সময় সব জায়গাতেই কম-বেশী পানি হয়। বছরের তিনটা মৌসুমে এখানে উফশী ধানের চাষ হয়। আমন মৌসুমে সব জায়গাতে কিছু স্থানীয়জাতের আমন ধান হয়। এই ইউনিয়নে সবচেয়ে বেশী আখের চাষ হয়। সবজির মধ্যে সবচেয়ে বেশী সীম, ভেন্ডীর চাষ হয়। এই ইউনিয়নে গাছপালার সংখ্যা খুবই কম। প্রকৃতি বেশ রুক্ষ। গরমের সময় খুব গরম এবং শীতের সময় খুব শীত পড়ে। এখানে বেলে দো-আঁশ এবং এঁটেল, দো-আঁশ, এই দুই ধরণের মাটি আছে।

মুলাডুলি ইউনিয়নে মোট ২৭টি গ্রাম আছে। গ্রামগুলো হলো মুলাডুলি, শেখপাড়া, গোয়াল বাথান, আটঘরিয়া, ফতেপুর, লক্ষ্মী খোলা, চাঁদপুর, হাজারী পাড়া, মৃধাপাড়া, সরইকান্দি, রামচন্দ্রপুর, দেবীপুর, বহরপুর, রামনাথপুর, দেদুনদিয়া, বালিয়া ডাঙ্গা, বাঘহাছলা, বাঘবাড়িয়া, আরাপাড়া, আরাকান্দি, মোকারমপুর, দুবলা চড়া, পতিরাজপুর, বেতবাড়িয়া, শ্রীপুর, নিকড়হাট, ফরিদপুর ও আব্দুল্লাপুর।

এই ইউনিয়নের ৩ ভাগের ২ ভাগ জমি উচু সমতল ভূমি। বাকি এক ভাগ এলাকা নিচু। মুলাডুলি ইউনিয়নের মধ্যে ছোট ছোট ২টি বিল আছে। এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য বিল হচ্ছে ঝিনির বিল।

ঝিনির বিল

মুরাডুলি ইউনিয়নের হাজারী পাড়া গ্রামের ঠিক উত্তর পাশে ঝিনির বিল অবস্থিত। বিলের উত্তর পাশে গোয়াল বাথান গ্রাম, পূর্বে আঠারো খাদার বিল ও গজারী বিল রয়েছে। পশ্চিমে শেখ পাড়া, মৃধাপাড়া। এই বিলে প্রায় ৩০০ একর (৯০০ বিঘা) জমি আছে। এই বিলের ঠিক দক্ষিণে হাজারী পাড়া গ্রাম। এই গ্রামের দক্ষিণ পাশ দিয়ে পূর্বে কমলা নামে একটা নদী ছিল। এখন আর সে নদী নেই। কমলা নদী ছিল পদ্মার একটি শাখা নদী। আস্তে আস্তে এই নদী ভরাট হয়ে গেছে। আগে এই নদীর পানি ঝিনির বিলে পড়তো। এখন শুধু একটা জোলা (ক্যানাল) আছে। এই জোলা দিয়ে দক্ষিণ পাশের জমে থাকা বিভিন্ন মাঠের পানি ঝিনির বিলে পড়ে।

এই বিলে আগে স্থানীয় জাতের বিভিন্ন আউশ-আমন ধানের চাষ হতো বেশী। সেই সাথে চৈতালীর সময় গম, যব, খেসারী, মটর, মশুর, ছোলা, তিষি, তিল, রাই-সরিষাসহ নানা রকম চৈতালীর আবাদ হতো। বিলের চার পাশ দিয়ে থাকতো অনেক গো-খাদ্যসহ কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য। আগে ঝিনির বিলে প্রচুর শাপলা-শালুক পদ্ম ফুল পাওয়া যেত। পাওয়া যেতো কলমি, হেঞ্চি, হেলেঞ্চা ইত্যাদি। অনেকেই এই সমস্ত কুড়িয়ে পাওয়া শাক সবজি খেতো।

কিন্তু বর্তমান সময়ে রাসায়নিক কৃষির প্রভাবে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারে দিন দিন এই সমস্ত কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য মাছসহ বিভিন্ন জলজপ্রাণী প্রায় বিলুপ্তির পথে। কুড়িয়ে পাওয়া শাক-সবজি যেমন, হেলেঞ্চা, কলমি, হেঞ্চি, শান্তিশাক, তেলাকুচা, নুন শাক, দুবলা শাক, দন্ডকলস, কচু, বনরাকচু, বতুয়ার শাক, আমরুল, বনপালং, খারকুন, থানকুনি, বনপুঁই, কাটানটে, চাপড়া নটে, ফুল নটে, পোড়া নটে, তেলাকুচা এগুলো পাওয়া যেতো। এসব শাক-সবজি এখন হাড়িয়ে যাওয়ার পথে।

ঝিনির বিলের নামকরণঃ হাজারী পাড়া গ্রামের উত্তর পাশে যে বিল অবস্থিত তার আয়তন ৩০০ একর (৯০০ বিঘা)। এই বিলে আগে প্রচুর পরিমাণে ঝিনুক পাওয়া যেত বলে এলাকাবাসী ঝিনির বিল বলে আখ্যা দেয়। সেই থেকে এই বিল ঝিনির বিল নামে পরিচিত। এই বিলে আষাঢ় মাস থেকে পৌষ মাস পর্যন্ত পানি থাকে। মাঘ মাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত শুকনা থাকে।

প্রায় ৩০/৩৫ বছর আগে এখানে কোন রকম ফসলের আবাদ হত না। সেই সময় চৈত্র মাসেও বিলের মাঝখানে প্রায় এক মানুষ বা ৩/৪ হাত পানি থাকতো। এই বিলে তখন নল ও অন্যান্য ঘাস প্রচুর পাওয়া যেত। সারা বছর এই বিলে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। যেমন শিং, মাগুর, কই, পুঁটি, বোয়াল, গজার, শোল, রুই, কাতল, মৃগেল, বর বাইম, কালবাওষ, সরপুঁটি, বাতাসী, বুজরী, তিন কাঁটা, টেংরা, মৌচি, রইনা (ভেদা) ডানকীনি, চাঁদা, চিংড়ি, পাইবা (পাবদা), ফলি, চিতল, খলসে, তিতপুঁটি, চাটা, গুছি মাছ, গরপুন, গুথুম, বাইলা, চেলা, কাঁইকা, টাকি, ঘারি মাছ ইত্যাদি। শুকনা মৌসুমে বিলের দুই পাশ দিয়ে শুকিয়ে গেলে এলাকার মানুষ গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া ছেড়ে রাখতো। এরা নিজের মত করে সারা দিন বিলের ঝোপঝাড়ে ঘাস খেয়ে বেড়াতো। আগে দেখা যেতো এই বিলে হরেক রকম ছোট বড় পাখি থাকতো। এই বিলে আগে প্রচুর পরিমাণে পদ্ম ফুল এবং শাপলা শালুক পাওয়া যেত। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে নানা রকম উফশী ধানের আবাদ আসার ফলে বিলে এই সমস্ত মূল্যবান সম্পদ নষ্ট হতে থাকে। তখন এই বিলে আগের মত মাছ পাখি, ঝিনুক, শাপলা-শালুক, পদ্ম কিছুই নাই। এখন এসব কথা শুনলে স্বপ্নের মত মনে হয়। এখন এই বিলে শুধু উফশী ধানের চাষ হয়। আমন মৌসুমে কিছু স্থানীয় জাতের পাকরী, বিনাশাইল, কাজল গরি নামের ধান হয়। কোন প্রকার চৈতালী ফসল হয় না। উফশী ধানের আবাদ আসার ফলে অতি মাত্রায় রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহার করার ফলে বিলের সব জলজ সম্পদসহ অন্যান্য অনেক প্রাণসম্পদ হারিয়ে গেছে। বিলের মাটি আগের মত উর্বর নেই।

আরশিনগর কেন্দ্র

উবিনীগ আরশিনগর কেন্দ্রের পশ্চিম পাশে হাজারীপাড়া, মৃধাপাড়া উত্তর-পশ্চিমে শেখ পাড়া, দক্ষিণে হাজারীপাড়া ও খয়ের বাড়ী, দক্ষিণ পশ্চিম পাশে হাজারীপাড়া মীরের পাড়া ও লক্ষ্মীখোলা, পূর্বে হাজারীপাড়া ও সুলতানপুর। এই কেন্দ্রের দক্ষিণ পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছিল কমলা নদী। এটা পদ্মার একটি শাখা নদী। আস্তে আস্তে নদী ভরাট হওয়ার কারণে এখন তার আর কোন চিহ্ন নেই। তবে এখন জোনা (ক্যানাল) আকারে আছে। এলাকাবাসী এখন এটাকে ফুটকাবাসী জোনা বলে। কিন্তু অতীতে এই নদী দিয়ে অনেক লঞ্চ, স্টিমার চলাচল করতো। অনেক সওদাগরের পানসী যাতায়াত করতো। এই কমলা নদী থেকে একটি নালা বের হয়ে আরশিনগর কেন্দ্রের পূর্ব পাশ ঘেঁষে ঝিনির বিলে পড়েছে। আগে এই নদীতে প্রচুর বড় বড় মাছ পাওয়া যেত।

উবিনীগ আরশিনগর কেন্দ্রের চার পাশে যে এলাকাগুলো রয়েছে এখানকার প্রকৃতি বেশ রুক্ষ। গাছ পালার সংখ্যা খুব কম। গরমের সময় প্রচন্ড গরম এবং শীতের সময় প্রচন্ড শীত পড়ে। স্যালো ডিপটিউবয়েলের প্রভাবে ফাল্গুন চৈত্র মাসে এলাকার পানির জলের খুব সংকট দেখা দেয়। গরমের দিনে জনজীবন অতিষ্ট হয়ে পড়ে। এই এলাকায় গরু মহিষের সংখ্যা বর্তমানে খুব কম।

পাহাড়ী ও উপকূলীয় অঞ্চল - কক্সবাজার

কক্সবাজার অঞ্চলকে প্রধানত উপকূলীয় অঞ্চল হিসেবেই গণ্য করা হয়। কিন্তু এই কক্সবাজারেই রয়েছে পৃথক বৈশিষ্টপূর্ণ অঞ্চল, যেমন,

ক. পাহাড়ী এলাকা/বনাঞ্চল

খ. সমতল ভূমি/বন্যা বিধৌত

গ. উপকূলীয়/লবণাক্ত এলাকা

ঘ. পাহাড়ী/উপকূলীয় এলাকা।

উল্লেখিত এলাকাগুলোতে মাটিরও পার্থক্য রয়েছে। যেমন, পাহাড়ী এলাকার মাটি, প্রধানত বেলে, বেলে দো-আঁশ ও লাল মাটি, সমতল ভূমির মাটি পলি ও দো-আঁশ, বেলে মাটি (মাতামুহুরী নদীর চর), উপকূলীয়/লবণাক্ত এলাকায় মাটি- এটেল, কশ মাটি, সইনা মাটি, এবং পাহাড়ী উপকূলীয় এলাকার মাটি-এটেল ও বেলে দো-আঁশ মাটি।

পাহাড়ী এলাকা / বনাঞ্চল

কক্সবাজার জেলার পাহাড় দুই ধরণের। এক ধরণের পাহাড় যেখানে বৃক্ষরাজী নেই, কিন্তু অন্যান্য সম্পদ রয়েছে, তার মধ্যে ওষুধী গাছ প্রধান। ফলের গাছপালা বিশেষ করে-কাঠ জাতীয় গাছে ভরপুর। সেখানে কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। যেমন, টেকনাফ এলাকার পাহাড়ের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

সমতল ভূমি

এই এলাকা মূলত মাতামুহুরী নদী বেষ্টিতে। পাহাড়ী ঢল ও বন্যায় কবলিত হয় এই অঞ্চল, ফলের গাছের সংখ্যা বেশী। শাকসবজি আবাদও হয় বেশী। এই এলাকার মধ্যে চকরিয়া থানার পূর্ব বড় ভেওলা, আছারবিল, কৈয়ারবিল, বিনমচর, বরইতলা উল্লেখযোগ্য।

উপকূলীয়/ লবণাক্ত এলাকা

এই এলাকায় প্রধানত লবণ চাষ হয় এবং ধানের চাষাবাদ হয়। গাছের বৈচিত্র্য কম, নির্দিষ্ট কিছু প্রজাতির গাছ পালা রয়েছে এই এলাকায়। আবহাওয়ার তারতম্য বিশেষভাবে অনুভব করা যায় না। এ এলাকার মধ্যে বদরখালী পশ্চিম বড় ভেওলা, মগনামা রাজাখালী, টেটং ইত্যাদি।

পাহাড়ী লবণাক্ত এলাকা

একদিকে পাহাড় অন্যদিকে লবণাক্ত এলাকা দুইটি পৃথক বৈশিষ্ট্যের সহঅবস্থান, যেমন টেকনাফ, প্রাণবৈচিত্র্যের দিক থেকে অনেক সমৃদ্ধ।

কক্সবাজার জেলার ৪টি অঞ্চলের মধ্যে ২টি অঞ্চলে কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের ওপর গবেষণা করা হয় প্রথম দিকে। বাকি ২টি অঞ্চলেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে পরবর্তী ধাপে। টেকনাফ এলাকায় কাজ করা হয় নি। কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের ওপর গবেষণার জন্য টেকনাফ, মহেশখালীর পুরো এলাকায় কাজ করা প্রয়োজন। তাহলে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। কারণ পাহাড়ের পাদদেশে, অনেক বাস্তহারা পরিবার থাকে তাদের জীবনজীবিকা ও খাদ্যের প্রশ্নে কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

কক্সবাজার এলাকায় গবেষণা কাজের শুরু

১৯৯৮ সনের ফেব্রুয়ারি ২০ তারিখে বদরখালী, কক্সবাজার এলাকায় কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের গবেষণা কাজ প্রথম শুরু হয়। প্রথমে কর্মীরা একত্রে টাঙ্গাইল ও ঈশ্বরদী এলাকা থেকে পাওয়া তথ্যগুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। এর পর গবেষণা দলের সদস্যরা বদরখালী কেন্দ্রের কর্মীদের সাথে বসে কাজের এলাকা ও কাজের পদ্ধতি ঠিক করে।

এলাকা নির্বাচন

১. চকরিয়া থানায় বদরখালী ইউনিয়ন

বদরখালী এলাকা ভৌগলিক ভাবে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং মাটির ধরণ একটু ভিন্ন। দীর্ঘ দিনের কাজের অভিজ্ঞতা ও এলাকার জনগণের সাথে পরিচয় হয়েছে ফলে বদরখালী ইউনিয়নকে তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচন করা হয়। বদরখালী ইউনিয়নকে কাজের সুবিধার জন্য মূলত ৫টি ভাগে ভাগ করা হয়।

ক. মাতামুহুরী নদীর কূল ঘেঁষে বেড়ী বাঁধ সংলগ্ন এলাকা। এখানে অধিকাংশ মানুষ গরিব এবং জেলে পরিবার। বেড়ী বাঁধের ভিতরে লবণের জমি আছে, লবণাক্ততার কারণে এ এলাকায় প্রাণ বৈচিত্র্যেরও পার্থক্য আছে।

খ. মহেশখালী চ্যানেল ঘেঁষে প্রায় ১০ কি: মি: দীর্ঘ এলাকায় এখানে ধানের চাষ ও লবণ চাষ হয়। এখানে ধনী পরিবারও আছে কিন্তু গরিবদের সংখ্যাই বেশী। এখানে ম্যানগ্রোভের বাগান রয়েছে ফলে অন্য এলাকার চেয়ে কিছুটা ভিন্নতাও রয়েছে।

গ. বদরখালী ইউনিয়ন চারিদিকে বেড়ী বাঁধ দ্বারা বেষ্টিত। তিন দিকে মাতামুহুরী নদী ও একদিকে মহেশখালী চ্যানেল। এখানকার প্রাকৃতিক অবস্থাটাও একটু ভিন্ন, মাটির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। পুরো এলাকাটাই ছোট বড় ৮টি খালে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। খালের পানিতে লবণাক্ততা নেই, কৃষকেরা চাষাবাদে ঐ সমস্ত খালের পানি ব্যবহার করে। মিঠা পানির খালের অবস্থানের ফলে খালেরআশে পাশের এলাকাগুলো প্রাণবৈচিত্র্য সমৃদ্ধ কুড়িয়ে পাওয়া শাকের প্রাপ্যতাও বেশী। এখানে শাক সবজির চাষাবাদও হয় বেশী।

ঘ. কিছু কিছু গ্রাম যেমন: খোশপাড়া, দাতিনাখালীপাড়া, টুটিয়াখালী পাড়া যেখানে নয়াকৃষি ঐ সময় পর্যন্ত শুরু হয় নি আধুনিক কৃষির ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে।

৬. নয়াকৃষি গ্রাম বা পাড়া যেমন-দাতিনাখালী পাড়া, ছনুয়াপাড়া সেখানে কীটনাশক মুক্ত চাষাবাদ, মিশ্রফসল, আন্তঃফসল, ফসল চক্র অর্থাৎ যেখানে কৃষকরা নয়াকৃষি পদ্ধতিতে চাষাবাদ শুরু করেছেন।

২. মহেশখালি থানার ২টি ইউনিয়ন

কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের গবেষণার জন্য কক্সবাজার জেলার চকরিয়া থানার বদরখালী ইউনিয়নকে প্রধান এলাকা হিশেবে নির্বাচন করা হলেও মহেশখালী এলাকায় ঐ সময় কিছু কাজ করা হয়। মহেশখালী একটি দ্বীপ, যেখানে তিন ধরণের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পাহাড়ী এলাকার সমতল ভূমির উপকূলীয় বা লবণাক্ত অঞ্চল। ঐ সময় অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি '৯৮ মাসের গবেষণা দলের কর্মীরা মহেশখালী থানার ২টি ইউনিয়নকে কাজের জন্য নির্বাচন করেন। এই ইউনিয়নগুলো হলো: ১. শাপলাপুর ইউনিয়ন, এবং ২. গোরকঘাটা ইউনিয়ন।

শাপলাপুর ইউনিয়নঃ বদরখালীর কূল ঘেষে মহেষখালী চ্যানেলের বিপরীতে পশ্চিম প্রান্তে শাপলাপুর। পাহাড়ী এবং সমতল এলাকা। পাহাড়ী এলাকায় প্রচুর কুড়িয়ে পাওয়া শাক পাওয়া যায় এবং এখানকার সমতল ভূমিতে বেলে, দোঁ-আশ মাটি থাকায় চাষাবাদের পদ্ধতিও ভিন্ন বৈচিত্র্য সম্পন্ন। ঐ এলাকায় তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

মহেশখালী থানা সদর ইউনিয়নে গোরকঘাটা ইউনিয়ন। এখানে জেলেদের প্রধাণ্য বেশী, তাই সেখানে মূলত কুড়িয়ে পাওয়া শাক ছাড়া অন্য খাদ্যও কুড়িয়ে পাওয়া যায় যেমন শুঁটকী মাছ। রাখাইন সম্প্রদায় এবং হিন্দু পরিবারগুলোতে গিয়ে কুড়িয়ে পাওয়া শাক খাদ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত কি না, বিশেষ করে তাদের খাদ্যভাস, কুড়িয়ে পাওয়া শাক খায় কি না ইত্যাদি যাচাইয়ের জন্য মহেশখালীর গোরকঘাটা ইউনিয়নে যাওয়া হয়।

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ

বদরখালী এলাকাকে ৫টি অঞ্চলে ভাগ করে গবেষকরা সরাসরি তথ্য সংগ্রহের কাজে গ্রামে চলে যান। অঞ্চল অনুযায়ী গ্রাম এবং পাড়া নির্বাচন করে কাজ শুরু করেন। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ সহযোগিতা করেন নয়াকৃষি আন্দোলনের কৃষক, আধুনিক কৃষির কৃষক পরিবারের সদস্যরা, বিশেষ করে এই সকল পরিবারের মহিলারা। মহিলাদের মধ্যে যারা বয়সে বৃদ্ধ, যারা দীর্ঘদিন এই এলাকায় বসবাস করেছেন তাঁরাই বেশী সহযোগিতা করেছেন। যে সব মহিলাদের মধ্য থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তাঁদের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় নজরে রাখা হয়েছিল।

১. যারা গরিব এবং দীর্ঘদিন এলাকায় বসবাস করেছেন;

২. যাদের বয়স ৫০ বছরের বেশী।

৩. যারা নয়াকৃষি করছেন।

৪. কবিরাজী বা বনৌষধী চিকিৎসা দিয়ে থাকেন (এর মধ্যে পুরুষও রয়েছে)

৫. দাইমার কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যারা এ সম্পর্কে বেশী জানেন।

৬. পুরুষ কৃষক, যাদের বয়স বেশী এবং যারা এই এলাকায় চাষাবাদের ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত, নয়াকৃষির অভিজ্ঞ।

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

গবেষণা কর্মীরা গ্রামে গিয়ে প্রথমে 'কুড়িয়ে পাওয়া শাক' খাদ্য সম্পূর্ণ ধারণা আছে এমন মানুষের সন্ধান করেন। তারা মাঠ, জমিতে, বাজারে, ছোট ছোট চায়ের স্টলে, দোকানের লোকজন, গ্রামে হাঁটতে হাঁটতে বিভিন্ন লোকজনের কাছ থেকে তথ্য নেন। এছাড়া মানুষের সাথে পূর্বে কাজের মাধ্যমে সম্পর্ক থাকায় তথ্য প্রদানকারীকে চিনতে তেমন সমস্যা হয় নি।

তথ্য সংগ্রহ হয়েছে যে ভাবে

কৃষকের বাড়ি গিয়ে। নির্দিষ্ট কোন কৃষকের নাম ধরে তাঁর বাড়ি যাবার পর এ সম্পর্কে আলোচনা শুরু হলে ধীরে ধীরে পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে লোকজন আসতে শুরু করে এবং বড় একটা দল হয়ে যায়। সকলে মিলে দলীয়ভাবে তথ্য দেন। গবেষণা কর্মীরা তথ্য সংগ্রহ করে সরাসরি শাক কোন্ পরিবেশে জন্মায় তা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করেন। কথা বলার সময় কৃষকরা হাতে করে গাছপালা, লতা নিয়ে আসেন। গবেষণা কর্মীরা এককভাবে তথ্য সংগ্রহ করেন নি, তারা যে কয়জন একসাথে গেছেন তাঁরা সকলে মিলেই শাক ধরে ধরে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

কৃষকের বাড়ি ছাড়া মাঠে গিয়েও জমির আইলে, ফসলের ক্ষেতে গিয়ে মাঠে কর্মরত কৃষকদের সাথে কথা বলে তথ্য সংগ্রহ করেন। তথ্য সংগ্রহ করা হয় তিন ভাবে-

এক: প্রথমে শাকের নাম জেনে, শাক খুঁজে বের করে পরে অন্যকে দেখিয়ে, নিশ্চিত, হয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অন্যদিকে আগে তথ্য নিয়ে পরে শাক দেখা ও সংগৃহীত প্রতিটি তথ্য বিভিন্নভাবে পাল্টা খোঁজ খবর নিয়ে মিলিয়ে নেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, দলীয়ভাবে যে সকল মহিলারা তথ্য দিয়েছেন সেগুলো অন্য এলাকায় গিয়ে মিলিয়ে নেয়া হয়েছে। কিছু কিছু শাক, পাতা বা গাছ চিনতে সমস্যা হলে, হার্বেরিয়াম করে, অন্য এলাকায় নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মাঠ থেকে সংগৃহীত তথ্য কেন্দ্রে এসে, কর্মীদের সাথে বসে, আলোচনা করেও যদি সংশোধন করার থাকে তা করা হয়েছে।

দুই: শাকের তথ্য সংগ্রহের পর কিছু কিছু কেইস স্টাডি বা নজির পেশ করা হয়েছে। গরিব পরিবার কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল এমন পরিবারের ওপর কেইস স্টাডি বা নজির পেশ করা হয়েছে।

তিন: তথ্য সংগ্রহের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল, সরাসরি পর্যবেক্ষণ। যেমন- অনেকেই তথ্য দিয়েছেন, তথ্য প্রদানের সময় পর্যবেক্ষণ করেছেন কর্মীরা, অনেক ক্ষেত্রে মনে হয়েছে তথ্য গোপন করা হয়েছে বা সঠিক তথ্য আসে নি, সেক্ষেত্রে কর্মীরা অন্য কৃষকের সাথে বসেছেন। সরাসরি মাঠে, পুকুর পাড়ে, নদীর ধারে, নালার পাশে, জমির আইলে,পাহাড়ে গিয়ে সরাসরি পর্যবেক্ষণ করেছেন।

তথ্য সংগ্রহ শেষে যেগুলো শাক ওষুধী ও পুষ্টিগুণ হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এগুলোকে আলাদা ভাগে ভাগ করা হয়। ভাগ করে পুনরায় গ্রামে গিয়ে শাকের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সুবিধা ও অসুবিধা

১. সুবিধার দিক

ক. এলাকায় আগে থেকেই কাজের অভিজ্ঞতা এবং পরিচিতি আছে। ফলে লোকজন গবেষণার কর্মীদের চেনেন, কর্মীরাও এলাকা এবং মানুষ চেনেন। এছাড়া নয়াকৃষিতে কাজ শুরু করার পর কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য, খাদ্য সার্বভৌমত্ব বিষয়টি সম্পর্কে কৃষকদের নিজেদেরই ধারণা ছিল। যখন গবেষণা দল এভাবে এলাকায় আসে, তখন ফেব্রুয়ারি মাস, ফলে রাস্তাঘাট শুকনো থাকায় কাজ করতে সুবিধা হয়েছে।

খ. নয়াকৃষি আন্দোলনের কৃষকরা এবং দাইরা তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন। অনেক সদস্যরা সারাদিন কর্মীদের সাথে থেকেছেন এবং একসাথে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন। নয়াকৃষি চাষাবাদ শুরু হওয়ায় অনেক ধরণের শাকও এলাকায় বেড়েছে। ফলে তথ্য সংগ্রহ ও মাঠ পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে।

গ. এর আগে কুড়িয়ে পাওয়া শাকের ওপর পাবনা ও টাঙ্গাইল এলাকায় তথ্য সংগ্রহের অভিজ্ঞতার ভাল মন্দ দিক জেনে কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে।

২. অসুবিধার দিক

ক. বর্ষাকালে কুড়িয়ে পাওয়া শাক বেশী পাওয়া যায়। ঐ সময় গবেষণার কাজ হলে তথ্যের সাথে সরাসরি শাককে পর্যবেক্ষণ করা যেত। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এ কাজ অবশ্যই গবেষণার পরবর্তী ধাপে করা হয়েছে।

খ. দলবদ্ধভাবে তথ্য দিতে গিয়ে অনেকেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন, ফলে সঠিক তথ্য বের করতে কষ্ট হয়েছে। একজনকে প্রশ্ন করলে ৫ জন উত্তর দিয়েছে, এটা একটা সমস্যা ছিল।

গ. কিছু কিছু ক্ষেত্রে গরিব মহিলারা কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের তথ্য দিতে একটু সংকোচ বোধ করেছেন। তারা জানেন এটা গরিবের খাবার। বিশেষ করে রন্ধন পদ্ধতির তথ্য দিতে বেশী শরম পেয়েছেন। কারণ তেল, পিঁয়াজ, তাঁরা সাধারণত দেন না। অথচ ধনীরা দেয়। এ ছাড়া খাওয়ার তথ্য দিতে অনেকেই লজ্জিত হয়েছেন।

ঘ. অনেক সময় মহিলারা বাড়িতে নিজেদের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, কাজের ফাঁকে ফাঁকে তথ্য নিতে হয়েছে। এতে কিছুটা সমস্যা হয়েছে।

ঙ. কৃষকেরা মাঠে কাজ করার সময় তথ্য পাওয়া যায় নি। সেক্ষেত্রে একবারের জায়গায় দুইবার যেতে হয়েছে।

চ. অনেকেই প্রশ্ন করেছেন এসব তথ্য নিয়ে কি হবে? আর কত কাল এভাবে তথ্য দিব, এ কোন প্রকাশনা বা পত্র পত্রিকায় তো দেখি না ?

ছ. নয়াকৃষি গ্রাম ছাড়া অন্য গ্রামে, বিশেষ করে আধুনিক কৃষির প্রচলন বেশী আছে এমন এলাকায় তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে কিছুটা সমস্যা হয়েছে। সেখানে অনেক শাক এখন গরুকে খাওয়ায়। তাদের কাছে শাক সম্পর্কে জানতে চাইলে বলেছে, এগুলো আগে মানুষ খেতো এখন খায় না।

জ. ১৯৯৭ সনের মে মাসে একটি ঘুর্ণিঝড় আঘাত হেনেছিল বদরখালী এলাকায়। কিছু কিছু স্থানে লবণ পানি ঢুকেছিল। ফলে অনেক সাধারণ শাক, ঘাস, লতাপাতা সাময়িকভাবে নষ্ট হয়, অর্থাৎ জন্মায় নি। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সনের বন্যার এবং পাহাড়ী ঢলে মাটির লবণাক্ততা কেটে গিয়ে সেগুলো আবার দেখা যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে সাময়িকভাবে হলেও শাক পাওয়ার সম্পর্ক আছে এবং সেটা আমাদের গবেষণার ক্ষেত্রেও ঘটেছে। তবে গবেষণার পরবর্তী ধাপে তা কাটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।

তথ্যের বৈচিত্র্য

ক. তথ্য সংগ্রহের সময় বদরখালীকে যে ভাবে ভাগ করা হয় সেভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা গেছে, একই এলাকার উত্তর, দক্ষিণ এলাকার মধ্যে পার্থক্য আছে। বদরখালী ইউনিয়নের মধ্যেই দক্ষিণ মাথায় (এলাকায় দক্ষিণ দিকের বসতীকে দক্ষিণ মাথা বলে) যেটা শাক হিশাবে খায়, উত্তর মাথায় বা অন্য পাড়া সেটা শাক হিসাবে খায় না। শুধু তাই নয় তাঁরা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছেন এমন শাক তাঁরা কখনোই খান নি বলে। এটা তথ্যের বৈচিত্র্য বাড়িয়েছে বটে তবে সাময়িকভাবে গবেষকরা বিভ্রান্ত হয়েছেন এবং তথ্য নেবেন কি না ভাবতে হয়েছে। তবুও এ বিষয়টি শাকের পরিচয়ের বাইরেও যে মানুষের সেই শাক ব্যবহারের সাথে সম্পর্ক রয়েছে তা প্রত্যক্ষভাবে ধরা পড়েছে এবং আমাদের ধারণাকে সমৃদ্ধ করেছে।

খ. এমন হয়েছে এক পাড়ায় যে শাককে ওষুধী হিশেবে মহিলারা বলেছেন অন্য এলাকায় শাক হিশাবে খায় শুধুমাত্র। এর ওষুধী গুণাগুণ সম্পর্কে তাঁরা কিছুই জানেন না।

গ. অর্থনৈতিক অবস্থার পার্থক্যের সাথে তথ্যের পার্থক্য হয়েছে। যেমন একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা যেভাবে শাক রান্না করেন তাতে তথ্যের সাথে গরিব মহিলাদের রান্নার পদ্ধতির কোন মিল পাওয়া যায় নি। এই ভিন্নতা সম্পর্কে জানা খুব দরকার ছিল।

ঘ. একটি শাকের নামের ক্ষেত্রে বেশী সমস্যা হয়েছে তাহলো ইলিচি ও নিলিচি। এই শাক অন্য এলাকায় হেলেঞ্চা নামে পরিচিত। তবে তার চেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, এই শাককে হিন্দুরা মালঞ্চ শাক বলেন। চট্টগ্রামের চন্দনাইশ থানার হিন্দুরা এবং বরিশালের হিন্দুদের কাছ থেকে এই শাককেই মালঞ্চ শাক বলতে দেখা গেছে।

ঙ. যারা গরিব তাদের শাকের নাম বলা আর একটু স্বচ্ছলদের ক্ষেত্রে শাকের নামের মধ্যে পার্থক্য দেখা গেছে।

নোনাবাড়ী কেন্দ্রের সুবিধা

এই গবেষণার একটা বড় সুবিধা ছিল নিজেদের কেন্দ্র থেকে গবেষণা কাজের নিযুক্ত থাকার সুবিধা। গ্রাম থেকে তথ্য আনার পরও শাকগুলো সরাসরি পর্যবেক্ষণ করতে সুবিধা হয়েছে। আবার কেন্দ্রের মধ্যে যে সকল শাক ছিল বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন স্থানে, সেগুলো দেখে গ্রামে তথ্য সংগ্রহ করার সময়, বিষয়টি মাথায় ছিল। নিজেদের কেন্দ্রে নয়াকৃষি সম্পূর্ণ অনুশীলন করার কারণে বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন ধারনের শাক পাওয়া যায়। বদরখালী এলাকার কুড়িয়ে পাওয়া শাকের মধ্যে বেশীর ভাগ শাক, মগনামাপাড়ায় অবস্থিত নয়াকৃষি কেন্দ্রেই আছে।

গবেষণার কয়েক ধাপ

কুড়িয়া পাওয়া শাকের এই গবেষণা কয়েক দফায় করা হয়েছে। প্রথম ধাপে সাধারণ তথ্য নেয়া হয়েছে। এর পরের দুটি ধাপে আছে।

ক. গবেষণার দ্বিতীয় ধাপ

দ্বিতীয় দফায় কুড়িয়ে পাওয়া শাকের ওপর কাজ শুরু হয় সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ সালে। টাঙ্গাইলের রিদয়পুর কেন্দ্রে কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের ওপর কর্মশালাকে কেন্দ্র করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয় বদরখালী, পূর্ব বড় ভেওলা, মহেশখালীর কালারমারছড়া ইউনিয়নে।

তথ্য সংগ্রহের কাজের মধ্যে ছিল শাকের নাম, গাছের বর্ণনা, পরিবেশ বিশিষ্ট্য ও মৌসুম। ওষুধীগুণ, শাক সংগ্রহ থেকে খাওয়া, প্রতিটি ধাপে ধাপে তথ্য সংগ্রহ করা এবং কেইস স্টাডি করা, তিনটি ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ

এলাকায়। এই কাজটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণার দ্বিতীয় ধাপে মোট ১৭টি শাকের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই ১৭টি শাক হচ্ছে:

১. খেতাপাটা (কাউয়ার ঝাই), ২. থানকুনি (আদা গুণগুনি অথবা মাসুলি), ৩. হেলেঞ্চা (ইলিচি), ৪. নুইন্নে শাক, ৫. আডোয়া মারিস, ৬. কাটা মরিস, ৭. গিরমি তিতা, ৮. বিন্নি ঝুড়া, ৯. গিননারিস শাক, ১০. আই শাক, ১১. দুধ শাক, ১২. কলমি শাক (কয়মা শাক), ১৩. বাতুয়া শাক, ১৪. মাদার পাতা শাক, ১৫. হরি শাক, ১৬. পুন্নমা শাক এবং ১৭. অজাত কচু শাক।

খ. গবেষণার তৃতীয় ধাপ

তৃতীয় ধাপে তথ্য সংগ্রহ করা হয় ২০০০ সালের অক্টোবর মাসে। এ পর্যায়ে শাকের রন্ধন পদ্ধতি, স্বাদ, খাওয়ার সময়, ওষুধী গুণ হিসেবে খায় বা পুষ্টিগুণ বিবেচনা করে খায় এবং শাকের মিশ্রণ, সংস্কৃতি ইত্যাদির ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ পর্বে ৪৩টি শাকের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই শাকগুলো হচ্ছে:

১. কাটা মারিস, ২. কলমি শাক (লাল ও সাদা), ৩. দন্ড কলস, ৪. গিরমিতিতা ৫. মরিচ পাতা ৬. থানকুনি। ৭. হেলেঞ্চা (হেলিছি), ৮. খেতাপাটা, ৯. মিষ্টি আলু (সাদা), ১০. আপাং, ১১. লাউ শাক, ১২. পান্নে মাদার। ১৩. বকফুল, ১৪. খ্যাটখেটি, ১৫. নিলিচি শাক, ১৬. মনসি শাক, ১৭. হরি শাক, ১৮. বরবটি পাতা। ১৯. ঢেঁড়শ পাতা, ২০. বতুয়া শাক, ২১. সরিষা পাতা, ২২. নুইন্নে শাক, ২৩. থ্যানথেনে শাক, ২৪. আলমুশ। ২৫. গিন নারিস, ২৬. মিঠা নরিস, ২৭. তিতা নরিস, ২৮. বিন্নি ঝাড়া, ২৯. টিয়াটুই, ৩০. তেরিশাক। ৩১. ফুরমিতিতাম, ৩২. কালাউনা, ৩৩. কুকুর মুতা, ৩৪. ঢেঁকি শাক, ৩৫. হাচু শাক, ৩৬. দাউদ পাতা। ৩৭. আডোরা মারিস, ৩৮. কচু শাক (আর গেয়া), ৩৯. কালা কচুর পাতা, ৪০. গুরা কচুর পাতা। ৪১. পুনন্নমা শাক, ৪২. ডুয়া শাক, ও ৪৩ সজনা শাক।

তিনটি গবেষণা এলাকার তথ্যের রকমফের

টাঙ্গাইল, বদরখালি ও ঈশ্বরদী প্রধান গবেষণা এলাকা হলেও টাঙ্গাইলে তথ্য সংগ্রহের দিক থেকে বেশী জোর দেয়া হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, প্রাধান গবেষকের সাথে তথ্য সংগ্রহকারীদের নিয়মিত যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা, টাঙ্গাইল এলাকায় নয়াকৃষির কর্মী ও গ্রাম কর্মীদের সক্রিয়তা, এবং মৌসুমের বিভিন্নতা অনুযায়ী তথ্য সুবিধা। টাঙ্গাইলে গ্রাম ধরে তথ্য নেয়া হয়েছে, আবার পরিবার ধরে কুড়িয়ে পাওয়া শাকের ব্যবহার নিয়ে পর্যবেক্ষণমূলক তথ্য নেয়া হয়েছে।

কক্সবাজারের তথ্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানে নয়াকৃষি কর্মী এবং গ্রাম কর্মীরা উপকূলীয় অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শাক ছাড়াও অন্যান্য প্রাণী যা মানুষ খাদ্য হিশাবে ব্যবহার করে তার তথ্য সংগ্রহ করেছে।

ঈশ্বরদী এলাকা থেকে খরার সময় প্রাপ্ত তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তবে অন্য সময়ে কর্মীর অভাবে তথ্য সংগ্রহ করা যায় নি।

ক. তিন গবেষণা এলাকায় তথ্য প্রদানকারীদের পরিচয়

টাঙ্গাইল এলাকায় মোট ২৬টি গ্রাম থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। যাঁরা তথ্য দিয়েছেন তাঁরা বিভিন্ন বয়সের। এদের মধ্যে সর্বোচ্চ বয়স ৭০, সর্বনিম্ন বয়স ১৫ বছর। তবে ৪০ বছর বয়সের মধ্যে বেশী মহিলা ও পুরুষ তথ্য প্রদান করেছে, এদের সংখ্যা হচ্ছে ৩১।

পাবনা ঈশ্বরদী এলাকায় মোট গ্রাম ১৫টি গ্রাম থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যাঁরা তথ্য দিয়েছেন তাঁদের সর্বোচ্চ বয়স ৫৫ বছর আর সর্বনিম্ন বয়স ৩২ বছর। সাধারণভাবে বয়স ৪০ থেকে ৪৯ বছর বয়েসের ১৭ জন বেশী তথ্য দিয়েছেন।

কক্সবাজারে মোট ১৭টি গ্রাম থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যারা তথ্য দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সর্বোচ্চ বয়স ছিল ৭৮ বছর এবং সর্বনিম্ন ২৯ বছর। তবে সাধারণত তথ্য প্রদানকারীদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন ৫০ বছর বয়সের মধ্যে। সবচেয়ে বেশী তথ্য প্রদান করেছেন ১০ জন্য।

তিন এলাকার তথ্য প্রদানকারীদের নাম এই প্রতিবেদনের শেষে পরিশিষ্টতে দেয়া হয়েছে।

খ. বিশেষ অবস্থায় কুড়িয়ে পাওয়া শাকের প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ

কুড়িয়ে পাওয়া শাকের গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এই শাক খাদ্য হিসাবে বিশেষ অবস্থায় এর প্রাপ্তি এবং মানুষের খাদ্য হিসাবে এর ব্যবহার। সাধারণত প্রাকৃতিক কারণে আবাদি ফসলের প্রাপ্তিতে অসুবিধা হতে পারে দুটো কারণে, এক: সময়মতো এবং যথেষ্ট বৃষ্টি না হলে খারার দশা হয়। তখন মাঠ–ঘাট শুকিয়ে যায় এবং ফসলের অসুবিধা ঘটে। এই সময় কুড়িয়ে পাওয়া শাক আদৌ পাওয়া যায় কি না, আর গেলে সেগুলো কি? দুই: অধিক বৃষ্টি বা বন্যার পানি এসে মাঠ–ঘাট পানিতে ডুবে থাকলে এবং ফসলের ক্ষতি হলে কুড়িয়ে পাওয়া শাকের কি অবস্থা হয় এবং তা মানুষের খাদ্য যোগান দিতে পারে কি না ?

১৯৯৮ সালের বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠ মাস খরা দেখা দিয়েছিল। বিশেষ করে উত্তর বঙ্গে টিউবওয়েলের পানিও শুকিয়ে গিয়েছিল। অন্যান্য এলাকায় যেমন টাঙ্গাইল এবং কক্সবাজারেও খরার অবস্থা থাকাকালীন অবস্থায় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

সারা দেশে ১৯৯৮ সালের ভাদ্র–আশ্বিন মাসে দীর্ঘস্থায়ী বন্যা হয়। বিশেষভাবে গবেষণার এলাকা টাঙ্গাইল ও পাবনা প্লাবিত হয়, কক্সবাজারে তার আগেই পাহাড়ী ঢল এসে ফসলের ক্ষতি করে। এই সময় কয়েকটি গ্রামে বন্যার পানি নেমে যাবার পর পরেই কমপক্ষে এক সপ্তাহ সময় ধরে গ্রামীণ পরিবারগুলো কি খেয়ে দিনযাপন করেছেন তার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, দিন, তারিখ মিলিয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে।

বন্যা এবং খরার অবস্থা পরের বছরও একইভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। যখনই স্বাভাবিক অবস্থার বাইরে ভিন্ন পরিস্থিতি হয়েছে তখনই গবেষকরা তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

গ. মৌসুম অনুযায়ী শাকের প্রাপ্তির তথ্য সংগ্রহ

এক এক মৌসুমে কুড়িয়ে পাওয়া শাকের প্রাপ্তি এক এক রকম হয়। সে অনুযায়ী দুটি প্রধান মৌসুম ধরে কুড়িয়ে পাওয়া শাকের তথ্য বিস্তারিতভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে। যেমন শীতকালীন কুড়িয়ে পাওয়া শাক। এই সময় আবাদি ফসলের পরিমাণও বেশী এবং একই সাথে মিশ্র ফসলের ক্ষেতে অনাবাদি শাক গড়ে ওঠে অনেক ধরণের। আবার বর্ষা কালে আবাদি সবজির পরিমাণ কম। সে সময় অনাবাদি শাকের অবস্থা কেমন তা জানার জন্যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে প্রধানত ১৯৯৯ এবং ২০০০ সালে।

ঘ. কুড়িয়ে পাওয়া শাকের ওপর গরিব মানুষের নির্ভরশীলতা

এই গবেণষার অন্যতম প্রধান দিক হচ্ছে যে গ্রামের মানুষ নানাভাবে এবং নানা কারণে কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য বিশেষ করে শাকের ব্যবহার করে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, যাদের জমি নেই, আবাদ করতে পারেন না তারা কি করে প্রতিদিনের খাদ্য এবং বছরের বিভিন্ন সময়ে কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের ওপর নির্ভর করে চলেন তা বোঝা। এর জন্য নিয়মিতভাবে গ্রামের মহিলাদের সাথে বসে বসে তথ্য সংগ্রহকারীরা তথ্য সংগ্রহ করেছেন। কোথাও কোথাও গ্রামের মহিলাদের সপ্তাহের কয়েকদিনের রান্নাও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ২০০০ সালে।

ঙ. কুড়িয়ে পাওয়া শাকের রান্না সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ

কুড়িয়ে পাওয়া শাকের গবেষণায় শুধু শাকের বর্ণনা নয়, এর রান্না সম্পর্কে জানাটাই সবচেয়ে জরুরী। একই শাকের নানা প্রকার রান্নার ধরণ, এলাকা ভেদে রন্ধন প্রণালী পার্থক্য জানার জন্যে প্রত্যেক এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে টাঙ্গাইল প্রকল্পে কর্মীরা রান্নার তথ্য প্রদানে কাজে বেশী সময় দিয়েছেন। এখানে বিভিন্ন জেলার কর্মীরা তাঁদের নিজ নিজ এলাকার রান্নার প্রণালীর সম্পর্কেও তথ্য দিয়েছেন। এই তথ্য ১৯৯৯ সালে এবং ২০০০ সালে সংগ্রহ করা হয়েছে।

অধ্যায় ২ : শাক কি ? কোথায় পাওয়া যায়

শাক সম্পর্কে সাধারণ তথ্য

কুড়িয়ে পাওয়া শাকের কোন মালিক নাই, যা খুশি ইচ্ছামত খাওয়া যায়। এই শাক তোলার ক্ষেত্রে কাউকে বলতে হয় না। - বিমলা রাণী মন্ডল

‘থাক-গা তোমার মাছের ঝোল, আমি শাক দিয়েই দুইটা ভাত খাব’- পুষ্প রানী শীল, ঈশ্বরদী।

শাক দিয়ে ভাত খাইলে মুখ ছাব ছাব (পরিষ্কার) লাগে’ হাজেরা বেগম, টাংগাইল।

মনে হয় শাক হইলে একটু ভাত খাইতে পারি’- হাসিনা বেগম, বদরখালি।

ক. শাক কি ?

শাক কথাটি কে না বোঝে? সাধারণভাবে খাদ্যের তালিকায় শাক থাকে সবজির সাথে সাথে। ভাল ও পুষ্টিকর খাদ্যের কথা বললে শাক-সবজির কথা আসবেই। কিন্তু শাক কি এই কথাটি কাউকে জিগ্যেস করলেই একটু থমকে যেতে হয়। এতো বেশী জানা কথা যে উত্তর খুঁজে পেতে সময় লেগে যায়। গবেষক হিসেবে লিখতে গিয়ে আমার প্রথমেই একবার বাংলা অভিধানে শাক সম্পর্কে কি বলা হয়েছে তা দেখার চেষ্টা করি। দেখতে চেয়েছি বাংলা শব্দ হিসেবে শাক কথাটির অর্থ কি? অভিধানে লেখা আছে ‘রাঁধিয়া খাইবার যোগ্য লতাবৃক্ষপত্রাদি (নটে শাক, কলমি শাক, লাউ শাক)’। অভিধানে আরও বলা হয়েছে শাক অর্থ নিরামিষ ও অকিঞ্চিতকর আহার্য। বিশেষণ হিসেবে শাকান্ন অর্থ হচ্ছে উপকরণহীন বা ব্যঞ্জনবর্জিত খাদ্য, অত্যন্ত দরিদ্রের উপযোগী খাদ্য। (সূত্র: সংসদ বাঙ্গালা অভিধান সংশোধিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা ১৯৮৮)। বাঙ্গালী অভিধানের এই অর্থের সাথে এই গবেষণার মূল অর্থের ভাল মিল আছে। তবে দেখা যাক, মহিলারা নিজেরা ‘শাক কি’ সে বিষয়টি কি ভাবে দেখেন ?

গ্রামের মহিলাদের যখন জিগ্যেস করা হোল শাক কি, তখন তাঁরা প্রথমে হেসেই কুটি কুটি হলেন, এ কি প্রশ্ন? শাক কি এটা কি কোন প্রশ্ন হতে পারে! কে না জানে শাক কি ? কিন্তু আমরা নাছোড়বান্দা। বলা হোল আসলেই আমরা জানতে চাই শাক কি ? তখন প্রথম উত্তর এলো সবুজ পাতা হলেই শাক হয়। তাহলে কি ঘাসকে শাক বলবো, বট পাতা কি শাক হবে ? উত্তর এলো, না তাতো হবে না। খাওয়ার উপযুক্ত হতে হবে। কিন্তু খাওয়ার উপযুক্ত হলেই কি শাক হয়? তখন একজন বলে উঠলেন, শোনেন, আমরা কি করি। আমরা আলানে পালানে গিয়ে কয়েক রকম ‘শাক’ কুড়িয়ে এনে পিঁয়াজ, রসুন একটু কাচা মরিচ দিয়ে রান্না করি, পরে সোম্বার বা বাগার দেই। তখন সেটাকে শাক বলে। কিন্তু যদি ঝোল করি। তাহলে তরকারি বলি, অন্য যে কোন সবজি মিশিয়ে রান্না করলেও তরকারি বলি। ওটাকে তখন শাক বলি না। তাহলে তো শাক কথাটির সাথে রান্নার সরাসরি সম্পর্ক হয়ে গেলো এবং তাও বিশেষ ধরণের রান্না হলেই শাক হবে।

খাবারের মধ্যে যদি শাক না থাকে তাহলে আমাদের মোটেও ভাল লাগে না। এই ধরণের কথা মহিলারা হরদম বলতে থাকেন। এটা পরিষ্কার কোন পাতা, শাক হতে হলে তাকে রান্না করতে হবে, রান্না ছাড়া শাক হয় না। কাঁচা পাতার ব্যবহারকে শাক বলে না। অর্থাৎ থানকুনি পাতা বা পুদিনা পাতার কাঁচা ভাবে ভর্তা করলে তা শহুরে ভাষায় সালাদ হবে, গ্রামের ভাষায় ভর্তা হবে কিন্তু শাক হবে না।

এই উত্তরের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি তথ্য হচ্ছে। যেমন-

১. সব পাতাই শাক হবে না।

২. কাঁচা পাতা খাদ্য হিসেবে ব্যবহারকে শাক বলে না: অর্থাৎ সালাদকে শাক বলা যাবে না।

৩. সব ধরণের পাতা রান্নাকেও শাক বলে না। শাক হিসেবে রান্নার মধ্যে তরকারির ভাব থাকবে না।

৪. তবে একটি কথা পরিষ্কার- গাছ, লতা-গুল্ম জাতীয় হতে পারে কিন্তু তার কচি পাতার অংশকেই শাক হিসেবে তোলা হয়।

খ. কুড়িয়ে পাওয়া শাক কি ?

এ শাক কি জানার পর প্রশ্ন আসতে পারে এর সাথে কুড়িয়ে পাওয়া বিষয়টি কেন জুড়ে দেয়া হোল ? কুড়িয়ে পাওয়া বলতে প্রথমত যে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে, তা হোল শাক কোন আবাদি ফসল নয়। ধান, পাট, বা অন্যান্য সবজির যেমন আবাদ করা হয়, শাক সেভাবে করা হয় না। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমরা গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা শাকের কথা বলছি, বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা শাকের কথা বলছি না। বর্তমানে লাল শাক, পুঁই শাক, পালং শাক এমন কি লাউ শাক বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হয়। এই সকল বাণিজ্যিক শাকের কথা এখন থাক। এর সাথে মানুষের সম্পর্ক খুবই কম, বিশেষ করে নারীর সম্পর্ক তো মোটেই নেই। এই গবেষণার উদ্দেশ্যের মধ্যে কুড়িয়ে পাওয়া শাকের কথা আছে, যে কোন শাকের কথা নয়। তাহলে কুড়িয়ে পাওয়া বলতে আমরা কি বুঝি।

গ্রামের মানুষ অবশ্য কুড়িয়ে পাওয়া শাক বলেন না। এক এক এলাকায় এক এক নামে এই শাক সম্পর্কে বলেন। যেমন গোপালগঞ্জে টোয়াইয়া শাক বলে। আমাদের তিনটি গবেষণা এলাকায় অনেক পাথর্ক্য আছে। পাবনায় বলে খুইটা শাক, বদরখালিতে বলে তোয়াইন্না ফেডাইন্যা শাক, আর টাঙ্গাইলে বলে কুরাইন্যা কারাইন্যা শাক। অর্থাৎ তিনটি এলাকার মধ্যে অবশ্য শাকের কুড়িয়ে আনার বিষটির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। স্থানীয় ভাষাতেই কোথাও 'খুইটা খাইটা', কোথাও 'তোয়াইন্না ফেডাইন্যা' এবং 'কুরাইন্যা কারাইন্যা' বলছে। এই কথাই একটি সার্বজনীনভাবে আমরা নাম দিয়েছি 'কুড়িয়ে পাওয়া শাক' শাকের প্রাপ্যতার উৎসের সাথে মিলিয়েও শাক কুড়িয়ে পাওয়া বা অনাবাদি শাক বলার ব্যাপার আছে। খাদ্য সংগ্রহ এখন খুব স্বাভাবিক কিংবা সহজ ব্যাপার নয়। যতোই রাস্তাঘাট হচ্ছে, আবাদী জমি নির্দিষ্ট হয়ে যাচ্ছে ততোই সংগ্রহ করা খাদ্যের ধারণা কমে যাচ্ছে। তবে অন্যান্য খাদ্যের বেলায় এই প্রশ্নটি বেশী কার্যকরী হলেও শাকের ব্যাপারে দেখা গেছে কুড়িয়ে পাওয়া, সংগ্রহ করা এখনও গ্রামের মানুষের অভ্যাস এবং কাজের মধ্যেই আছে। এখনও বিলুপ্ত হয়ে যায় নি।

প্রথম পর্যায়ে আমরা কুড়িয়ে পাওয়া শাকের সংজ্ঞা নিয়েও একটা বিপদে পড়ে গেলাম। যে শাক আবাদ হয় না কিন্তু শাক হিসেবে খাওয়া হয় তাকে কুড়িয়ে পাওয়া শাক বলা তো খুবই সহজ। কিন্তু লাউ শাক বা কুমড়ার পাতাকে আমরা কি বলব ? এগুলো তো খুবই মজার শাক এবং শাকের তালিকায় আসবেই। অর্থাৎ এমন কিছু শাক আমরা খাই কিন্তু তাকে আবাদিও বলা যাচ্ছে না, আবার অনাবাদিও বলা যাচ্ছে না। এই সমস্যাটার সমাধান আমরা তৎক্ষণাৎ করে ফেলার প্রয়োজন মনে করি নি। বিষয়টিকে খোলা বিতর্ক আকারে আমরা রেখে দিয়েছি এবং গবেষণার মধ্যে দিয়ে বিষয়টির একটা মীমাংসা হবে বলে ধরে নিয়েছি।

গ্রামের মহিলারা বলেন লাউ শাক বা কুমড়া শাক কুড়িয়ে পাওয়া এই কারণে যে, কেউ শুধুমাত্র শাক খাওয়ার জন্যে এই গাছ লাগায় না। এই গাছ লাগানো হয় লাউ বা কুমড়ার জন্যেই। এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাড়ির

আঙ্গিনার ফসল। বাড়ির চাল যেমনই হোক তার ওপর লাউ বা কুমড়া প্রায় প্রত্যেক গ্রামীণ বাড়িতেই দেখা যাবে। মহিলারাই লাগিয়ে দেন। এর মাধ্যমে তাদের বিশেষ আয় হয়। সংসারের খাবার জোটে। কিন্তু লাউ পাতা বা কুমড়া পাতাও একইভাবে নিয়মিতভাবে খাওয়া হয়। এই পাতা খেতে হলে ফলের ক্ষতি যাতে না হয় এমনভাবে পেড়ে নেয়া হয়। কারণ ফলটাই মূল উদ্দেশ্য। শাকটি যেহেতু বাড়তি পাওয়া, তাই যে লাগিয়েছে শুধু সে খাবে এমন কথা নেই, পাড়া প্রতিবেশীরাও পাতা পেড়ে নেয়ার অধিকার রাখেন। একে অপরকে দেয়া এটা একটা সামাজিক রীতি। ঠিক যেমন আবাদি ফসলের উদ্বৃত্ত জমি থেকে নিতে পারে তেমনি আবাদি গাছের পাতা পেড়ে নেয়ার অধিকার সামাজিকভাবে স্বীকৃত।

একইভাবে আবাদি জমিতে অনেক শাক জন্মায়, যা বিশেষ ফসলের সাথী ফসল। এই শাক তখন জন্মাবে যখন বিশেষ ফসলের আবাদ করা হবে। সাথী শাকের মধ্যে সবচেয়ে চেনা শাক হচ্ছে বতুয়া শাক। এই শাক গমের ক্ষেতে শীতকালীন ফসলের মাঠে বিপুল পরিমানে জন্মায়। তেমনি আরো অনেক শাকই সাথী শাক হিসেবে চিহ্নিত। আমরা শাকগুলোর ভাগ করেছি অনাবাদি ও সাথী এবং আবাদী শাক হিসেবে। সাথী শাকও অনাবাদী কিন্তু এটা হয় কেবল আবাদি ফসলের সাথে। এইটুকুই শুধু পার্থক্য।

কুড়িয়ে পাওয়া শাক হতে হলে এর সাথে কুড়িয়ে আনার বিষয়টি জড়িত থাকছে। একে শাক তুলে আনাও বলে। সকালে বা দুপুরে গ্রামের মহিলারা ঘরের আঙ্গিনায়, আশে পাশে, আলানে পালানে, রাস্তার ধারে, পুকুর পাড়ে, এমনকি চকে বা দূরে গিয়ে শাক কুড়িয়ে এবং তুলে নিয়ে আসেন। গ্রামের মানুষের জন্যে খাদ্যের এই উৎসটি এখন আছে। কুড়িয়ে আনা কথাটি আক্ষরিক অর্থেই সত্য। শাক কুড়িয়ে আনতে হয় এবং এর জন্যে যতো দূরে যাওয়া যায় ততো দূরেই যাওয়া সম্ভব। এই বিষয়ে আমরা শাক রান্নার অধ্যায়ে বিস্তারিত লিখবো। এখন কুড়িয়ে পাওয়া বলতে কোন প্রকার সন্দেহ যেন কারও মনে না থাকে তাই বলা প্রয়োজন যে, কুড়িয়ে পাওয়া শাক সত্যি প্রকৃতির দান। এলাকায় যত বেশী গাছ পালার বৈচিত্র্য থাকবে এবং যত বেশী কৃষি ফসলের বৈচিত্র্য বাড়বে, পরিবেশ নিরাপদ এবং বিষমুক্ত হবে, ততোবেশী কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের সমৃদ্ধি ঘটবে। কুড়িয়ে পাওয়া অন্যান্য খাদ্য নিয়ে আমাদের এই গবেষণা নয় বলে আমরা সেই তথ্য এখন দিচ্ছি না। তবে কুড়িয়ে পাওয়া যে কোন খাদ্যের মধ্যে কুড়িয়ে পাওয়া শাকই সবচেয়ে বেশী। সব শাকই কোন না কোনভাবে কুড়িয়ে পাওয়া, তা সে একেবারে অনাবাদী হোক, আবাদি হোক কিংবা হোক সাথী।

গ. শাকের নাম

শুধু শাক বলে কিছু নেই। ইরেজিতে ংঢ়রহধপয বলে সব ধরণের সবুজ পাতার তরকারিকেই বোঝানো হয়। এই তালিকায় নির্দিষ্ট কয়েকটি সবুজ পাতা ছাড়া আর কিছু নেই। বিশেষ করে পালং শাককেই স্পিনাচ হিশেবে ধরা হয়। পালং শাক আবাদী শাক। কুড়িয়ে পাওয়া নয়। বাংলায় যদিও শাক বলে বিশেষ একটি শব্দ আছে কিন্তু শুধু শাক বলে কিছু নেই। প্রত্যেক শাকেরই একটা নাম আছে। নামছাড়া শাক নেই, ঠিক যেমন নাম ছাড়া মানুষ নেই। শাকের নামের মধ্যে দিয়ে শাক সম্পর্কে চেনার বিষয়টি ফুটে ওঠে। বিশেষ করে এটা খাবার অযোগ্য কি না সেই বিষয়টি জানা হয়ে যায়। যারা কোন একটি শাক চেনে না তার অর্থ এই যে তারা শাকের নামও জানে না এবং সেই শাকের খাবার পদ্ধতিও তাদের জানা নেই।

তবে সব শাকের নাম সবখানে একরকম নয়। একই শাক বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন নামে পরিচিত। অনেক সময় নামের পার্থক্য কেবল এলাকা ভেদে উচ্চারণের পার্থক্যের মতোই শোনায় কিন্তু কোথাও নামের পার্থক্য এতই বড় যে একই শাক কি না সন্দেহের সৃষ্টি হয়। সে ক্ষেত্রে শাকের পূর্ণ বর্ণনা পাওয়ার পর কিংবা সরাসরি চোখে দেখে ঠিক করা হয় যে একই শাকের কথা ভিন্ন নামে বলা হচ্ছে। গবেষণার প্রথম স্তরে উবিনীগের কর্মীদের মধ্যে শাকের নাম নিয়ে আলোচনা হয়। যেহেতু কর্মীদের নিজ গ্রামের বাড়ি বিভিন্ন জেলায় রয়েছে তাই কর্মীদের মাঝে থেকেই নামের বিভিন্নতা সম্পর্কে একটা ধারণা করার জন্যে চর্চা করি। এই চর্চা খুবই আনন্দদায়ক ছিলো। শেষে শাকের নামের একটি তালিকা তৈরী হয়েছে। এই তালিকা গবেষণার পর আরও পূর্ণাঙ্গ করে তৈরি করা

হয়েছে। এখানে আবাদী এবং অনাবাদী শাকের নামের তালিকা আলাদাভাবে দেয়া হোল। মোট ৪৫টি অনাবাদী শাকের তালিকা এখানে দেয়া হোল। অনাবাদী শাকের মধ্যে সাথী ফসল হিসেবে গড়ে ওঠা শাকও রয়েছে।

লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, এখানে একই শাক একেক জেলাতে একেক নামে পরিচিত। এই তালিকা করতে গিয়ে কর্মীদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক, হাসাহাসি, ঠাট্টা এমনকি নাম এবং শাক খাওয়া নিয়ে পরস্পরের মধ্যে মৃদু ঝগড়া-বিবাদও দেখা গেছে। নাম বলার ক্ষেত্রে যখন একই শাকের কথা বলা হচ্ছে কি না সন্দেহ জেগেছে তখন দৌড়ে বাইরে গিয়ে সেই শাক কুড়িয়ে আনার চেষ্টাও হয়েছে। তবে উল্লেখিত সব শাক এই মৌসুমে এবং টাঙ্গাইলে পাওয়া যায় নি। তখন কর্মীরা ছবি এঁকে পাতার রকম, কোথায় জন্মায়, খেতে কেমন লাগে বিস্তারিত বর্ণনা দেবার চেষ্টা করেছেন। শেষ পর্যন্ত সকলে একমত হয়ে শাকের নামের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছে। এই চর্চার মধ্যে শাক সম্পর্কে কর্মীদের জ্ঞানের একটা বিরাট রকমের পরীক্ষা হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, গ্রামে যারা বড় হয়েছেন তাঁদের ভূমিকা এখানে বেশী সক্রিয় ছিল। আর যারা শহরে বড় হয়েছেন তাঁদের পক্ষে এতো শাক চেনা বা নাম জানা সম্ভব ছিল না। তাঁরা গোবেচারা ভাব নিয়ে তাকিয়ে থেকেছেন। তবে এই চর্চার মধ্যে তাঁদের জ্ঞান সমৃদ্ধ হয়েছে।

আবাদিসুত্র থেকে পাওয়া শাকের নামের মধ্যে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এখানে শাক না বলে অনেক ক্ষেত্রে পাতা বলা হচ্ছে। যে ফসল যে কারণে আবাদ করা হয়েছে তার বাইরে পাতাটাও সংগ্রহ করা হচ্ছে। সেই পাতা আবাদী ফসলের অংশ নয়। তাই একে শুধু পাতা বলা হচ্ছে এবং তা ফসলের অংশ হিসেবে ধরা হচ্ছে না।

ক. শাকের নাম সংগ্রহের কাজ এখানেই শেষ হয়ে যায় নি। এরপর শুরু হয় তিনটি গবেষণা এলাকার গ্রামে তথ্য সংগ্রহের কাজ। সেই কাজের মধ্যে প্রধান অংশ ছিল শাকের নাম জানা। আমরা শাকের নাম ও প্রাথমিক তথ্য পেলাম ৪৬ অনাবাদী ও সাথী শাক ৩১টি আবাদী শাকের। এছাড়া আরও অনেক শাকের নাম পাওয়া গেছে তবে সেগুলো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ওষুধী হিসেবে ব্যবহার হয়, দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় কম থাকে বলে এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

এটা পরিষ্কার যে অনাবাদি সূত্র থেকে পাওয়া শাকের নামে ততো বৈচিত্র্য নেই। আবাদি শাকের নামকরণ আবাদি ফসলের নামকরণের সাথেই হয়ে যাচ্ছে, কাজেই শাকের নামের মধ্যে নতুন কিছু যুক্ত হচ্ছে না। কিন্তু অনাবাদি শাকের মধ্যে শাকের ধরণ এবং এর বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে একটা নামকরণ হয়ে যাচ্ছে। সেটা এক এক এলাকায় এক এক ধরণের হয়েছে এবং সেভাবেই নামকরণ হয়েছে।

শাকের নামের অর্থ কি ? এর প্রথমে অর্থ হচ্ছে, এর সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য জানা আছে, বিশেষ করে এর ব্যবহার সম্পর্কে জানা আছে। কেউ যখন শাক দেখেই তার নাম বলতে পারেন তখন বুঝতে হবে তিনি একই সাথে এর ব্যবহারও জানেন। সেটা খাদ্য হিসেবে হোক কিংবা ওষুধী হিশেবে।

শাক হিশেবে বললে চিনতে এবং এর সম্পর্কে আলাপ আলোচনা যত সহজে হয় এবং একে অপরকে চেনায়, ওষুধী গাছ ততো সহজে চেনা যায় না। যারা ওষুধীগাছ হিসেবে ব্যবহার করেন তাঁরা এর সম্পর্কে সঙ্গত কারণেই সেখানে বলাবলিও করতে চান না। এতে ওষুধের অপব্যবহার হতে পারে। ফলে ভালোর চেয়ে মন্দই হতে পারে। ওষুধী গাছ বলে কোন গাছ নেই, ওষুধী গুণের গাছ পালা আছে। সেই ওষুধী গুণ চেনা এবং নির্দিষ্ট অসুখের জন্যে সেই ওষুধী ব্যবহার করতে পারাটাই হচ্ছে তাদের জ্ঞানের অংশ। কাজেই কোন গাছ সম্পর্কে তথ্য দিলে, তার ওষুধী ব্যবহার সম্পর্কে তথ্য দিলে, তার, ওষুধী ব্যবহার সম্পর্কেও জানা যাবে এমন কোন কথা নেই। সেই গাছের পাতা কখনো শাক হিসেবেও ব্যবহার হতে পারে। সেক্ষেত্রে ধরে নেয়া উচিত হবে না যে ওষুধী গুনাগুণ জেনেই খাওয়া হচ্ছে। অবশ্য শরীরে এর গুণ কি হবে সেটা নির্ভর করবে এর রন্ধন প্রণালীর ওপর।

শাকের নাম এবং একই সাথে তার ব্যবহার সম্পর্কে জানাকেই আমরা শাক চেনা বলতে পারি। তাই শাকের নাম খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের গবেষণার প্রক্রিয়া হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল যে শাকের নাম ও তার ব্যবহার নিয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন এলাকা থেকেই শাকগুলোর সাধারণ পরিচিতি ঠিক করা।

নামের পার্থক্য, এমন কি কোথাও কোথাও ব্যবহারের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমরা শাকের দীর্ঘ একটি তালিকা করতে পেরেছি। এই শাকগুলো মানুষ খায়। গ্রামের মহিলারা বলেন, শাক ছাড়া ভাত খাওয়া যায় না। কাজেই শাক খাওয়ার সাথে সখের খাবার খাওয়ার ব্যাপারও ঘটে। গরিব মানুষ ভাতের সাথে শাক খেয়ে ক্ষুধা মেটায়, মাছ মাংস কিংবা অন্যান্য আবাদী সবজির আশায় বসে থাকে না।

গ্রামের মহিলারা শাকের নাম বলার সময় শুধু নাম বলেন না, এই শাকের পাতা এবং ডাটা কত বড়, কোথায় পাওয়া যায় ইত্যাদি তথ্যসহ পূর্ণ বর্ণনা গড় গড় করে বলতে পারেন। তখন তাদের থামিয়ে বলতে হয়, আগে নামটাতো লিখে নেই। অর্থাৎ যিনি নাম জানেন তিনি একেবারে এর সকল বৈশিষ্ট্যসহ জানে। আর যে জানে না, তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

টাঙ্গাইল, কক্সবাজার এবং পাবনা এই তিন এলাকায় ভাষার অনেক পার্থক্য রয়েছে, ফলে নামের পার্থক্য থাকলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু তবুও শাকের মধ্যে নামের মিল পাওয়া গেছে। অনাবদি ও সাথী শাকের মধ্যে নামের মিল তিন এলাকায় পাওয়া গেছে এমন শাকের সংখ্যা হচ্ছে মাত্র ৫টি। আমরা এই ছকে তাদের কাছাকাছি বলে উল্লেখ করেছি। এগুলো হচ্ছে বতুয়া, পিপুল, কানাই, ক্যাথাপাটা এবং হাগড়া। এই তালিকায় ৯টি শাক আছে যা তিনটি এলাকাতেই পাওয়া যায় কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন নামে পরিচিত। নাম শুনে বোঝার উপায় নেই যে একই শাকের কথা বলা হচ্ছে। তবে এই শাকগুলো বর্ণনা ধরে বোঝা গেছে যে একই শাক। এই ৯টি শাক হচ্ছে, সেঞ্চি, নটেশাক, মোরগশাক, থানকুনি, খুড়েকাটা, ডন্ডকলস, নুনিয়াশাক, শুশনীশাক এবং চুকাকলা। দুটি এলাকায় যেমন টাঙ্গাইল এবং পাবনায় ৭টি শাকের নামের মিল পাওয়া গেছে কিন্তু কক্সবাজারে সেই শাক সম্পূর্ণ ভিন্ন নামে পরিচিত। এই শাকগুলো হচ্ছে হেলেঞ্চা, ঢেঁকি, গিমা, তেলাকুচা, বিষকচু, গন্ধভাদালী এবং হুটকা। কুড়িয়ে পাওয়া শাক সব এলাকায় একভাবে পাওয়া যায় না, কিংবা পাওয়া গেলেও খায় না। এই তালিকায় ১৩টি শাক আছে যা কক্সবাজার এলাকায় শাক হিশেবে চেনে না কিন্তু টাঙ্গাইল এবং পাবনায় পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে খারকোন, কস্তুরি, পিপুল, আমরুল, নুনঘুরিয়া, বিষ কচু, গন্ধভাদালী, দুধলী, রসুন, চিরকুটি, কাটাকচু, হুটকা এবং বনঝুরি। তেমনি টাঙ্গাইলে ৮টি শাক চেনে না। এগুলো হচ্ছে চিরকুটি, নিলিচি, মরিশাক, গিননারিস, খ্যাটখেটে, চিনিগুড়ি এবং মরিচপাতা। তিনটি গবেষণা এলাকায় ৭টি শাক এমন আছে যা শুধু মাত্র একটি পাওয়া গেছে বা শাক হিশেবে চিনেছে। এগুলো হচ্ছে রসুন শাক (শুধু টাঙ্গাইলে), নিলিচি, হরিশাক, গিননারিস এবং খেটখ্যাটে (শুধু কক্সবাজারে) এবং চিরকুটি ও বনঝুড়ি (শুধু পাবনায়)। যে এলাকায় 'চেনে না' বলছে ছকের মধ্যে সেখানে আমরা শূন্য চিহ্ন ব্যবহার করেছি।

আবাদি শাকের নামের ক্ষেত্রেও তিনটি এলাকায় পার্থক্য দেখা গেছে। এটা একদিকে ভাষার পার্থক্য হিসেবে আবার অন্যদিকে একেবারেই ভিন্নভাবে নামকরণ করা হয়েছে বলে। ভাষার কারণে ৪টা শাক একেবারে ভিন্ন। এগুলো হচ্ছে সীম, লাউ, মিষ্টিকুমড়া এবং ধুন্দল।

আবাদি ও অনাবাদি উৎস এবং কুড়িয়ে পাওয়া শাকের সংজ্ঞার প্রশ্ন

সহজেই লক্ষ্য করা যাবে যে কুড়িয়ে পাওয়া শাকের সংজ্ঞার ব্যাপারটা আগাগোড়া একটা মুশকিল হয়েই রয়েছে। যেমন, যা মোটেও আবাদ করা হয় নি, তা নিয়ে কোন সমস্যা নেই কিন্তু যা আবাদ করা হয়েছে কিন্তু তার পাতা বা অন্য অংশ খাওয়া হচ্ছে, তার ক্ষেত্রেই সমস্যাটা দেখা যাচ্ছে। এবং দেখা যাচ্ছে আবাদি উৎস থেকে কুড়িয়ে পাওয়া শাকের সংখ্যা এই তালিকাতেও খুব কম নয়। গবেষণার দিক থেকে এটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা। এতে শুরুতেই আমরা স্পষ্ট হয়ে গেলাম যে খাদ্যের উৎপাদন ও খাদ্য সংগ্রহের উৎসের দিক থেকে প্রকৃতির মাঝখানে একটা মোটাদাগ কেটে আবাদী ও অনাবাদি নামে যে দুটো ভাগ আমরা আছে বলে ধরেই নিয়েছি, সেটা ঘোরতর প্রশ্নের সম্মুখিন হয়ে পড়েছে। প্রকৃতিকে দুই ফালি করে কাটা ও ভাবতে শেখবার ব্যাপারটা কি খুব নতুন? হয়তো গ্রামের মানুষ এইভাবে ভাবে না। এই ভাবনার জন্য আমাদের শহুরেপনা হয়তো দায়ী। খাদ্য যদি কুড়িয়েই সংগ্রহ করতে হয় তাহলে হয়তো আবাদি উৎস আর অনাবাদি উৎস থেকে খাদ্য সংগ্রহ দুটোই

গ্রামীণ সমাজের কাছে একই অর্থ বহন করে, আমরা ভাগ করে বিচার করতে বসলেও। কারণ আবাদি আর অনাবাদি দুটোই সমান ভাবে খাদ্য সংগ্রহের উৎস। যিনি কুড়িয়ে খাদ্য সংগ্রহ করছেন তাঁর সামনে দুটোর ভেদ লুপ্ত হয়ে যায়। তখন যে সত্যটা বরং প্রকট হয়ে ওঠে সেটা হোল, খাদ্য সংগ্রহের অধিকারটা তাঁর আছে কি না। নিজের জমি থেকে তো তিনি সংগ্রহ করতেই পারছেন। কিন্তু শুধু সেই দিকটা দিয়ে কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের ব্যাপারটা পুরোপুরি বোঝা যাবে না। তিনি সরকারি বা খাস জমি থেকে কুড়িয়ে পাওয়ার অধিকার ভোগ করছেন কি না, কিম্বা অন্যের জমি থেকে শাক-লতা-পাতা সংগ্রহ করলে তাঁকে বাধা দেওয়া হয় কি না। কিম্বা গ্রামের মানুষের মধ্যে সেই বিবেক বা নীতি কি এখনও কাজ করে যে তাদের প্রতিবেশী গরিব পরিবারটি যখনই প্রয়োজন তখনই অনাবাদি বা আবাদি যে কোন উৎস থেকে খাদ্য সংগ্রহ করলে তাঁকে বাধা দেওয়া তাঁরা অন্যায় বলে মনে করেন। যতক্ষণ না তিনি যে ফসলের জন্য আবাদ করা হয়েছে সেই ফসল তোলেন বা নষ্ট না করেন। একের প্রতি সমষ্টির সামাজিক নিরাপত্তারই হয়তো এগুলোর অংশ।

ধরা যাক, গ্রামে গরিব পরিবারটির কোন সদস্য অন্যের জমি থেকে বতুয়া শাক তোলে। তখন তো দেখা যায় তাকে বাধা দেওয়া হয় না। বা বাধা দেওয়াটা সমাজ অনৈতিক বলে মনে করে। কারণ এই খাদ্য কুড়িয়ে পাবার অধিকার গরিব পরিবারটির আছে বলেই তারা ধরে নয়। ঘরে ছোট মাছ আছে কিন্তু রান্না করবার মতো কোন শাক নেই। তখন প্রতিবেশীর কুমড়ার চালা বা লাউয়ের মাচা থেকে শাক কুড়িয়ে নেওয়া অপরাধ নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে আনন্দের। কারণ ছোট মাছ সেই শাকের সঙ্গে রাঁধার পার প্রতিবেশীর বাড়িতে পাঠানোটাই এই ক্ষেত্রে অলিখিত রীতি। তারপর কলতলায় বা পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে সেই শাক কেমন লাগল সেই প্রশ্ন তোলার ছুতায় আরও হাজারো কথাবার্তা। এই ব্যাপারগুলো এমন কিছু গভীর সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে জড়িত যে-বিষয়ে বাংলাদেশে গবেষণা হয় নি বললেই চলে। অথচ এর সঙ্গে পরিবারে ও গ্রামীণ পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তার প্রশ্নটা অঙ্গাঙ্গীভাবেই জড়িত। এই দিকগুলোকে ইংরেজিতে ঈড়সসড়হ চৎড়ঢ়বৎঃু জবমরসবং আখ্যা দেয়া হয়। আধুনিক সমাজ বিজ্ঞান সবকিছুই সম্পত্তির মানদণ্ড দিয়ে বিচার করে বলে জীবনযাপন ব্যবস্থার এই সকল নৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকটাকেও তারা সম্পত্তির ধারণা দিয়ে বিচারের চেষ্টা করে। এই দিকটা যদি আমরা মনে রাখি তাহলে খাদ্য উৎপাদন, সংগ্রহ ও নিজের পরিবার বা অপরের সঙ্গে মিলেজুলে খাওয়ার ব্যাপারগুলো নিশ্চয়ই কোন না কোন আচার, বিধান, সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য আকারে আমাদের সমাজে রয়েছে। উৎপাদন, ভোগ ও বিনিময়ের সম্পর্ক বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নভাবে অভিব্যক্তি লাভ করে। আবাদি ও অনাবাদির মুশকিল আমাদের এইসকল অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ভাবতে সহায়তা করেছে।

দুটোই হয়তো আমরা গবেষণার বিষয় নির্ধারণেই গোলমাল পাকিয়ে ফেলেছি। ফসল কাটা ও ঘরে তোলা ফসল উৎপাদন ও সংগ্রহের একটা বিশেষ দিক। উৎপাদন ও সংগ্রহের এই পর্যায় থেকে হয়তো কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যকে বিচার করা ঠিক হচ্ছে না।

আর অনাবাদি জমি দুটোই আবাদি ও অনাবাদি- প্রকৃতির এই দুই মানচিত্রের মাঝখানে আরও গভীর রহস্য ও জটিলতা রয়ে যাচ্ছে। আসলেই আবাদি আর অনাবাদি এই দুটো কথার মানে কি ? একটি কি অন্যটির বিপরীত ? নাকি আবাদ মাত্রই একই সঙ্গে অনাবাদি খাদ্যের উৎস এবং জীবনের শর্ত হিসাবে প্রকৃতিকে চাষাবাদ মানেই কি আবাদ করা ? অথবা চাষ বলতে বা কৃষি কাজ বলতে আমরা এখন যা বুঝি তার অর্থ আর আবাদ- এই প্রশ্ন আমাদের মাথায় এলো। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শাক কোথায় পাওয়া যায় ?

যেখান থেকেই শাক তোলার অধিকার থাকুক না কেন, এর প্রাপ্তিটাই বড় কথা। অনাবাদী শাক তো যেখানে সেখানে হতে পারে এবং যেখানে সেখানে তার নিজস্ব গড়ে ওঠার পরিবেশ মতোই সেই শাকটি পাওয়া যাবে। অর্থাৎ যে শাক স্যাঁতস্যাতে জায়গা ছাড়া হবে না, গ্রামে যদি সে রকম জায়গাই না থাকে তাহলে তো আর সে শাক পাওয়া গেলো না। যেমন হেলেঞ্চা শাক স্যাঁতস্যাতে জায়গায় হয়। সেখানে থেকেই মহিলারা কুড়িয়ে নিয়ে

আসেন। কিন্তু সেই রকম জায়গার যদি অভাব ঘটে যায় তাহলে কখনোই হেলেঞ্চা শাক পাওয়া যাবে না। কিংবা পাওয়া গেলেও তার আশে-পাশে যদি বিষাক্ত বা দুষিত পরিবেশ থাকে তাহলেও সেই শাক তোলা হবে না। আধুনিক কৃষিতে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহারের কারণে বহু শাক হারিয়ে গেছে কিংবা পাওয়া গেলেও ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গেছে। তাছাড়া আধুনিক কৃষিতে আগাছার যে ধারণা আছে তাতে অনাবাদী গাছ, লতা গুল্মের ধ্বংস করাই কৃষির প্রধান কাজ হয়ে পড়ে। ফলে ফসলের সাথে অনাবাদি কোন সাথী ফসল গড়ে ওঠার সম্ভাবনাই আর থাকে না। আধুনিক কৃষিতে আগাছা পরিস্কারের জন্যে শ্রমিক খাটানো হয়, বর্তমানে আগাছানাশক নামক বিষাক্ত ওষুধ ব্যবহার করে আগাছা পরিস্কার করে ফেলা হয়। বনায়নের নামে রাস্তার ধারে ইউকেলিপ্টাসের মতো এমন গাছ লাগানো হয় যার নীচে কোন প্রকার গাছ জন্মাতে পারে না। আমাদের গবেষণায় শাক সম্পর্কে তথ্য নিতে গিয়ে এর প্রাপ্তি স্থান এবং প্রাপ্তির সময় সম্পর্কে আমরা জেনেছি। এর মাধ্যমে এটা বোঝা যাবে যে আধুনিক কৃষি এবং উন্নয়নমূলক কাজের জন্যে কত ধরণের শাক এখন হুমকির সম্মুখিন হচ্ছে। এই শাক হুমকির মধ্যে পড়লে সাধারণ মানুষের খাদ্য নিরাপত্তাও হুমকির সম্মুখিন হবে।

অনাবাদী এবং সাথী শাক

নং	শাকের নাম	প্রাপ্তি স্থান	প্রাপ্তির সময়
১	হেলেঞ্চা শাক	ছায়াযুক্ত স্থানে, পানিতে	বর্ষাকালে বেশী হয়। সারা বছরই হয়।
২	ঢেঁকি শাক	রাস্তার ও বাড়ির আশে পাশে	বর্ষাকালে ভাল হয়।
৩	সেঞ্চি শাক	স্যাঁতস্যাঁতে স্থানে	কার্তিক থেকে পৌষ মাস।
৪	নটেশাক (স্যাটা প্যাটা)	উঁচু জায়গাতে, নীচু জায়গাতে	শীত মৌসুমে বেশী হয়।
৫	মোরগ শাক	বাড়ির আশে পাশে	শীত মৌসুমে হয়।
৬	খারকোন	উঁচু জায়গাতে	বৈশাখ জ্যৈষ্ঠতে হয়। বৃষ্টি হলে বেশী হয়।
৭	গিমা শাক	বাড়ির আশে পাশে, পুকুর পাড়ে, জমিতে, রাস্তার ধারে	ফাল্গুন থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত।
৮	কস্তুরি	নীচু ও ছায়াযুক্ত স্থানে	বৈশাখ থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত।
৯	তেলাকুচা	ঝোপ জংগলে	বৈশাখ থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত।
১০	থানকুনি	ছায়ামুক্ত জায়গাতে	বর্ষাকালে বেশী হয়। সারা বৎসরই দেখা যায়।
১১	বতুয়া	আবাদি জমিতে	কার্তিক ও ফাল্গুন মাসে পাওয়া যায়
১২	পিপুল	বাড়ির আশে পাশে	বৈশাখ থেকে মাঘ মাস পর্যন্ত পাওয়া যায়।
১৩	কানাইশাক	বাড়ির আশে পাশে	বৈশাখ থেকে পৌষ মাস পর্যন্ত পাওয়া যায়।
১৪	আমরুল	ভেজা মাটিতে হয়	আশ্বিন থেকে পৌষ মাসে পর্যন্ত হয়।
১৫	নুন খুরিয়া (বুলখুরিয়া)	আঁখ ক্ষেত ও মিশ্র ফসলের জমিতে	ফাল্গুন থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত হয়।
১৬	বন কচু	রাস্তার দু'পাশে, জঙ্গলে, পুকুর ডোবার পাশে হয়	সারা বছর পাওয়া যায়।
১৭	বিষ কচু	জঙ্গলে	সারা বছর পাওয়া যায়।
১৮	গন্ধভাদালী	উঁচু ছায়াযুক্ত স্থানে	সব মৌসুমে হয়।
১৯	দুধলী	চৈতালী ফসরের জমিতে	শীতকালে পাওয়া যায়।
২০	রসুন শাক	রাস্তা ও বাড়ির আশে পাশে	সারা বছর হয়।
২১	খুড়েকাটা (কাটা নটে)	বাড়ির আঙ্গীনায়, রাস্তার আশে পাশে	সারা বছর পাওয়া যায়। তবে শীতকালে বেশী খাওয়া হয়।
২২	কলমি	পুকুরে, ডোবায়, খালে, বিলে	বর্ষা মৌসুমে বেশী হয়।
২৩	ডণ্ডকলস	চৈতালী জমিতে	শীতকালে বেশী হয়।
২৪	ক্যাথাপাটা	জমির আইলে	সারা বছর দেখা যায়। শীতকালে বেশী হয়।
২৫	চিরকুটি	উঁচু জায়গাতে, মরিচের ও জমিতে	ভাদ্র থেকে চৈত্র্য মাস পর্যন্ত থাকে
২৬	নুনিয়া শাক	রসযুক্ত মাটিতে	জ্যৈষ্ঠ - আষাঢ় মাসে বেশী হয়।
২৭	শুশনী শাক	ধানের জমিতে, পানিতে	কার্তিক - মাঘ মাস পর্যন্ত।
২৮	শিয়ালমুতি	খেসারী, মসুরী, গমের জমিতে	অগ্রহায়ণ - মাঘ মাস পর্যন্ত।
২৯	কাটাকচু	ডোবা স্থানের আশে পাশে	সারা বছর হয়।
৩০	নিলিচি	পানিতে হয়, স্যাঁতস্যাঁতে স্থানে	সারা বছর হয়। জ্যৈষ্ঠ - আশ্বিন মাস পর্যন্ত বেশী পাওয়া যায়।

৩১	মুনসি শাক	স্যাঁতস্যাঁতে স্থানে। পানিতে হয়।	সারা বছর থাকে। জ্যৈষ্ঠ - আশ্বিন মাস পর্যন্ত বেশী হয়।
৩২	হরি শাক	পানিতে, পুকুরে, খালে হয়	সারা বছর হয়।
৩৩	থ্যানথ্যানে	তিল ও ধান ক্ষেত্রে হয়।	মাঘ মাস থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত।
৩৪	গিননারিস	শুকনা জায়গাতে বৃষ্টির পানি পেলে গজায়	বৈশাখ - ভাদ্র মাসে ভাল হয়।
৩৫	খ্যাটখ্যাটি	শুকনা ও বাড়ির আশে পাশে	শীত মৌসুমে বেশী হয়। পৌষ থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত থাকে।
৩৬	চুকাকলা	বাড়ির আলানে পালানে শুকনা জায়গায় হয়।	অগ্রহায়ণ - চৈত্র মাস পর্যন্ত।
৩৭	হুটকা	পাট ও আখ ক্ষেতে ভেজা, ছায়াযুক্ত জায়গায় হয়	বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ মাসে হয়।
৩৮	পানিডাঙ্গা (গাংকলা)	পানিতে হয়	বর্ষা মৌসুমে।
৩৯	বনঝুড়ি	শুকনা জমিতে	সব মাসে পাওয়া যায়।
৪০	হাগড়া	খাল, পুকুর ও ডোবার পাড়ে বালু মাটিতে হয়।	মাঘ - চৈত্র মাস পর্যন্ত
৪১	বন কচু চিনিগুড়ি	স্যাঁতস্যাঁতে, শুকনা স্থানে হয়	শীতকালে ভাল হয়।
৪২	মরিচপাতা	জমির আইলে, বাড়ির আশে পাশে	আশ্বিন - মাঘ মাস পর্যন্ত।
৪৩	বনপাট	ভেজা জমিতে	ভাদ্র - আশ্বিন মাস পর্যন্ত।

আবাদী শাক

নং	শাকের নাম	প্রাপ্তি স্থান	প্রাপ্তির সময়
১	মিষ্টি আলু	শুকনা বালু মাটিতে	কার্তিক - চৈত্র মাস পর্যন্ত।
২	গোল আলু	উঁচু ও শুকনা জমিতে	অগ্রহায়ণ - মাঘ মাস পর্যন্ত।
৩	সিম	শুকনা জায়গায়	আশ্বিন - ফাল্গুন মাস পর্যন্ত।
৪	লাউ	বাড়িতে ও বাড়ির সাথে	সারা বছর হয়।
৫	মিষ্টিকুমড়া	বাড়িতে, জমিতে, আখ ক্ষেতে	সারা বছর হয়। শীতকালে চকে হয়। বর্ষাকালে বাড়িতে হয়।
৬	মেস্তা পাট	চকে বালু মাটিতে	বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ মাসে হয়।
৭	তোষা পাট	সব জমিতে হয়	বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ মাসে হয়।
৮	নিম	উঁচু জায়গায়, ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে পাতা থাকে না।	নিম বহু বর্ষজীবি গাছ।
৯	আম	উঁচু ও নীচু সব জায়গাতে হয়	বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ মাসে হয়।
১০	ধন্দুল	শুকনা জায়গায়	শ্রাবণ - আশ্বিন মাস পর্যন্ত।
১১	ঝিংয়ে	শুকনা জায়গায়	আষাঢ় - আশ্বিন মাস পর্যন্ত।
১২	চালকুমড়া	শুকনা জায়গায়	আষাঢ় - আশ্বিন মাস পর্যন্ত।
১৩	পেঁয়াজ পাতা	রসযুক্ত উঁচু জমিতে	কার্তিক ও অগ্রহায়ণ
১৪	রসুন পাতা	শুকনা ও উঁচু জমিতে	কার্তিক ও অগ্রহায়ণ
১৫	নাপা	আলু ক্ষেত উঁচু জায়গায় হয়	
১৬	সাজনা	শুকনা জায়গায় বসতভিটায়	সারা বছর। ফাল্গুন, চৈত্র মাসে পাতা থাকে না।
১৭	পাথরকুচি	শুকনা জমিতে	সারা বছর।
১৮	খেসারি	জমিতে ভেজা মাটিতে হয়	পৌষ - মাঘ মাস পর্যন্ত হয়।
১৯	ছোলা	শুকনা ও সমতল জমিতে	পৌষ - মাঘ মাস পর্যন্ত হয়।
২০	ডালিম	বাড়িতে শুকনা জায়গায়	সারা বছর
২১	উচ্ছে	বাড়িতে, জমিতে শুকনা জায়গায়	ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে
২২	পটল	জমিতে, উঁচু জায়গায়	ফাল্গুন - চৈত্র মাসে
২৩	মটর	শুকনা জমিতে ও পালানে হয়	কার্তিক - মাঘ মাস পর্যন্ত।
২৪	বেতের আগা	জঙ্গলে হয়	সারা বছর
২৫	চিনা বাদাম	শুকনা বালু জমিতে হয়	পৌষ - ফাল্গুন মাস পর্যন্ত
২৬	বরবটি	শুকনা উঁচু জায়গায় হয়	জ্যৈষ্ঠ - ভাদ্র মাস পর্যন্ত হয়
২৭	কাকরোল	শুকনা জায়গায়	আষাঢ় - ভাদ্র মাস পর্যন্ত
২৮	সরিষা	শুকনা জমিতে	অগ্রহায়ণ - পৌষ
২৯	পাটি বেতের ফুল	বাড়ির আশে পাশে, শুকনা, পানি সব জায়গায়	শ্রাবণ - ভাদ্র মাসে বেশী খাওয়া হয়।

৩০	ছন পাটের ফুল	শুকনা জমিতে	পৌষ ও মাঘ মাসে
৩১	পাইন্নে মাদার	শুকনা জায়গায় হয়	সারা বছর
৩২	মোরগ ফুলের পাতা	বাড়িতে নরম ও ছায়াযুক্ত জায়গায়	জ্যৈষ্ঠ - আষাঢ় মাসে
৩৩	পুদিনা পাতা	বাড়ির আশে পাশে শুকনা জায়গায়	সারা বছর থাকে। চৈত্র, বৈশাখ মাসে বেশী হয়।

আমাদের গবেষণায় যে সকল শাক অনাবাদি এবং আবাদি উৎস থেকে এসেছে তার একটি তালিকা দেয়া হলো। একই সাথে এই শাকগুলো কোথায় পাওয়া যায় এবং বছরের কোন কোন সময়ে পাওয়া যায় তার তালিকা করা হয়েছে। এই তালিকা অনাবাদি এবং সাথী ফসল এবং আবাদি শাকের জন্যে আলাদাভাবে করা হয়েছে।

শাক সংগ্রহ

শাক কোথায় পাওয়া যায় তার সাথে এর সংগ্রহের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। বাড়ির আলানে পালানে, অর্থাৎ আশেপাশে, ফসলের ক্ষেতে, পুকুর পাড়ে, রাস্তার ধারে, মাঠে, নানা জায়গায়, যেখানে থেকে লতাগুল্ম, গাছের পাতা সংগ্রহ করার অধিকার মানুষের আছে এবং যেখান থেকে সংগ্রহ করে খেলে শরীরের ক্ষতি হবে না এমন জায়গা থেকে শাক কুড়িয়ে আনা হয়। এটা ঠিক, শাক মানেই গাছের কচি অংশ। শক্ত পাতা রান্না করে কেউ খাবে না। তাই গাছের বা লতার ধরণ অনুযায়ী এই শাক সংগ্রহের পদ্ধতি আছে যা গ্রামের মহিলারা তো জানেনই, পাঁচ-ছয় বছরের ছোট মেয়েটিও জানে কি করে সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু যেহেতু প্রতিটি শাকের গাছ বা লতা এক রকম নয়, তাই আমরা শাকের তথ্য সংগ্রহের সময়, সংগ্রহের পদ্ধতির ওপর বিশেষ জোর দিয়েছি। এর একটি কারণ হচ্ছে শাক তোলার সাথে শাকের পুনরুৎপাদনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এবং ধারণা করা হয় যে যারা এভাবে লতা গুল্ম সংগ্রহ করে খায় তারা প্রাণবৈচিত্র্য ধ্বংস করে। কিন্তু আসলে কি তাই ? এই অধ্যায়ে শাক সংগ্রহের তথ্য থেকে সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে।

শাক তোলা

শাক সংগ্রহ করার কথা বলতে গিয়ে শাক তোলা কথাটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। শাক তোলা হয়, পাড়া হয় না। বড় গাছ, যেমন সাজনা শাক, গাছ থেকে পেড়ে আনলেও পুরো কাজকে শাক তোলা বলে। কারণ অধিকাংশ শাক লতা গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ থেকেই সংগ্রহ করা হয়। এই সব তুলতে হয়, পাড়তে হয় না।

মহিলারা শাক তুলতে যান একা কিংবা কয়েকজন একসাথে মিলে। বাড়ির আলানে পালানে হলে ঠিক রান্নার আগে হাতে বাঁশের ঝুড়ি কিংবা গামলা কিংবা শাড়ির আঁচলে করেই শাক তুলে নিয়ে আসেন। আবার কখন বাড়ি থেকে দূরেও যেতে হয়। কাছেই সব সময় শাক মন মতো পাওয়া যাবে এমন কথা নেই। বিশেষ করে ফসলের ক্ষেতে সাথী ফসল হিশেবে যা পাওয়া যায় তার জন্যে বাড়ি থেকে দূরেই যেতে হয়। টাঙ্গাইলের মহিলারা বলেন, চকে যেতে হয়, ঈশ্বরদীতে বলেন, মাঠ থেকে তুলে আনি আর বদরখালির মহিলারা বলেন, জমির আইল থেকে তুলে আনি। যে যেখানে যায় তার মতো করেই বলেন। তবে এটা পরিস্কার শাক তুলতে গিয়ে তারা বেশ খানিকটা দূরত্ব অতিক্রম করেন।

অনাবাদি এবং সাথী শাক

নং	শাকের নাম	প্রাপ্তি স্থান	দুরত্ব	প্রাপ্তির সময়
১	হেলেঞ্চা শাক	ছায়াযুক্ত স্থানে, পানিতে	পোয়া মাইল	নরম অংশ কাটে
২	ঢেঁকি শাক	রাস্তার ও বাড়ির আশে পাশে	বাড়ির আশে পাশে, ১ কি.মি.	মট কারে ভেঙ্গে আনে
৩	সেঞ্চি শাক	স্যাঁতস্যাঁতে স্থানে, রসালো জায়গায়	বাড়ির কাছে, কখনও ১ কি.মি. দূরে	ডগা ছিড়ে আনে
৪	নটেশাক (স্যাটা প্যাটা)	উঁচু জায়গাতে, নীচু জায়গাতে	বাড়ির আরানে পালানে	ডগা, পাতা নরম অংশ তুলে আনে

৫	মোরগ শাক	বাড়ির আশে পাশে	বাড়ির আলানে পালানে, ঘুগড়া পোকা যেখানে মোরগ শাক বেশী হয়	ডগা ছিড়ে আনে, এক ডগা ছিড়লে তিন ডগা হয়
৬	খারকোন	উঁচু জায়গাতে	বাড়ির আশে পাশে, ১/২ কি.মি.	কচি পাতা ছিড়ে আনে
৭	গিমা শাক	বাড়ির আশে পাশে, পুকুর পাড়ে, জমিতে, রাস্তার ধারে	১/২ কি.মি. ১ কি.মি.	লতা ছিড়ে আনে, পাতা বেছে নেয়
৮	কস্তুরি	নীচু ও ছায়াযুক্ত স্থানে, চকে পাওয়া যায়	বাড়ির আশে পাশে এবং ১ কি.মি.	কচি পাতা চিড়ে আনে
৯	তেলাকুচা	ঝোপ জংগলে	বাড়ির আমে পাশে	পাতা ছিড়ে আনে
১০	থানকুনি	ছায়ামুক্ত জায়গাতে	১/২ কি. মি.	পাতা চিড়ে আনে
১১	বতুয়া	আবাদি জমিতে	১ কি.মি.	ডগা, পাত তুলে শাড়ির আঁচলে টোপলা করে আনে। চালনি বা ডালা নেয় না। গ্রামের মহিলারা বলে, চালনি বা ডালায় শাক তুললে ক্ষেতে পোকা ধরে।
১২	পিপুল	বাড়ির আশে পাশে	বাড়ির আশে পাশে এবং বাঁশের তলায়। আবার অনেক সময় দূরেও যেতে হয়।	পাতা তুলে আনে
১৩	কানাইশাক	বাড়ির আশে পাশে		ডগা, পাতা দুই আঙ্গুল দিয়ে চিমটি দিয়ে তুলে আনে
১৪	আমরুল	ভেজা মাটিতে হয়, রসালো মাটিতে হয়, জমির আইলে হয়, পানিতেও হয়।	বাড়ির আশে পাশে এবং জমিতেও হয়	শুধু পাতা তুলে আনা হয়
১৫	নুন খুরিয়া (বুলখুরিয়া)	আঁখ ক্ষেত ও মিশ্র ফসলের জমিতে	১/২ - ১ কি.মি.	গাছের নরম অংশ চিমটি দিয়ে তুলে আনে
১৬	বন কচু	রাস্তার দু' পাশে, জঙ্গলে, পুকুর ডোবার পাশে হয়	বাড়ির আশে পাশে ১/২ কি.মি.	ভর্তা খাওয়ার জন্য বন কচুর মুরানো কচি পাতা দুই আঙ্গুল দিয়ে টান দিয়ে ছিড়ে। শাক খাওয়ার জন্য ডাটা, পাতা ধান কাটার কাচি দিয়ে কেটে আনে।
১৭	বিষ কচু	ছায়ামুক্ত স্থানে, জঙ্গলে, বাঁশঝাড়ের নিচে হয়	বাড়ির আশে পাশে, জঙ্গলে হয়। বৈশাখ মাসে ১ কি.মি. দূরে যেতে হয়	ভর্তা খাওয়ার জন্য কচি পাতা টান দিয়ে তুলে আনে।
১৮	গন্ধভাদালী	উঁচু ছায়াযুক্ত স্থানে হয়। সব মৌসুমে পাওয়া যায় তবে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বেশী হয়। সব বাড়িতে এই গাছ হয় না	১/২ কি.মি.	পাতা দুই আঙ্গুলে ধরে ছিড়ে আনে
১৯	দুধলী	চৈতালী ফসরের জমিতে হয়। শীতকালে বেশী পাওয়া যায়	১ কি.মি.	কচি ডগা পাতা সহ তুলে আনে
২০	রসুন শাক	চকে, রাস্তা ও বাড়ির আশে পাশে	বাড়ির কাছে, ১/৪ কি.মি.	কচি পাতা দুই আঙ্গুলে চিমটি দিয়ে তুলে আনে
২১	খুড়েকাটা (কাটা নটে)	বাড়ির আঙ্গীনায়, রাস্তার আশে পাশে	১/২ কি.মি.	গাছ যখন ছোট থাকে দুই আঙ্গুলে মাথা ছিড়ে নেয়।
২২	কলমি	জমিতে, ক্ষেতের আইলে, পুকুরে, ডোবায়, খালে, বিলে, শুকনা জমিতেও পাওয়া যায়। বর্ষা মৌসুমে বেশী হয়	বাড়ির আশে পাশে, ১ কি.মি.	নরম ডগা পাতা সহ চিমটি দিয়ে তুলে আনে
২৩	ডগুকলস	চৈতালী জমিতে, বাড়ির আশে পাশে, আলু মসুরী ক্ষেতে হয়	বাড়ির আশে পামে, ১ কি.মি.	ছোট গাছ পাতা সহ দুই আঙ্গুলে চিমটি দিয়ে তুলে আনে। আর বড় গাছ পাতা ছিড়ে আনে
২৪	ক্যাথাপাটা	জমির আইলে, বাড়ির আশে পাশে গোবর মাটিতে বেশী। পতিত জমিতে হয়	বাড়ির আশে পাশে, আরানে পারানে ১ কি.মি.	ডগা, পাতা নরম অংশ দুই আঙ্গুলে চিমটি দিয়ে তুলে আনে

২৫	চিরকুটি	বাড়ির আশে পাশে, আলানে পালানে, জমির আইলে, রাস্তার দুই পাশে	তবাড়র আশে পাশে, ১ কি.মি.	ডগা দুই আঙ্গুলে চিমটি দিয়ে তুলে আনে
২৬	নুনিয়া শাক	রসযুক্ত মাটিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বেশী হয়।	১ কি.মি.	গাছে গিট থেকে পুরো পাতা ডাটাসহ হাতের নখ দিয়ে ছিড়ে আনে
২৭	শুশনী শাক	ধানের জমিতে, পানিতে গোছা গাড়ার জমিতে হয়	১/২ কি.মি.	পাতা চিমটি দিয়ে তুলে আনে
২৮	শিয়ালমুতি	খেসারী, মসুরী, গম ও সরিষা জমিতে হয়	১/২ কি.মি.	নরম ডগা চিমটি দিয়ে তুলে আনে। এর ফল পাকলে ডাল হিসাবে খাওয়া হয়
২৯	কাটাকচু	ডোবা স্থানের আশে পাশে, ছায়াযুক্ত জায়গা, পাগাড়ের কাদায় বেশী হয়	বাপির আশে পাশে, ১/২ কি.মি.	ধান কাটার কাচি দিয়ে কচুর মাঝখানের ডাটা কেটে আনা হয়
৩০	নিলিচি	ভেজা জায়গায় ও পানিতে হয়।	বাড়ির আশে পাশে, ১/২ কি.মি.	এই শাকটির ডগা তুলে আনে
৩১	মুনসি শাক	স্যাঁত স্যাঁত স্থানে। শীতকালে বেশী হয়	বাড়ির আশে পাশে পাওয়া যায়	ডগা তুলে আনে
৩২	হরি শাক	পুকুরে, খালে বিলে, পানিতে হয়	বাড়ির আশে পাশে, ১/২ কি.মি	ডগাসহ পাতার নরম অংম চিমটি দিয়ে তুলে আনে
৩৩	থ্যানথ্যানে	শুকনা জায়গায় বেশী হয়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বেশী পাওয়া যায়	বাড়ির আশে পাশে	ডগা পাতাসহ দুই আঙ্গুলে চিমটি দিয়ে তুলে আনে
৩৪	গিননারিস	ভেজা জাযগাতে হয়	বাড়ির আশে পাশে, ১/২ কি.মি.	ডগা, পাতা তুলে আনা হয়
৩৫	খ্যাটখ্যাটি	শুকনা ও বাড়ির আশে পাশে। শীত মৌসুমে বেশী হয়	বাড়ির আশে পাশে, ১/২ কি.মি.	চিমটি দিয়ে ডগা, পাতা তুলে আনে
৩৬	চুকাকলা	বাড়ির আলানে পালানে শুকনা জায়গায় হয়। অগ্রহায়ণ, চৈত্র মাসে বেশী হয়	২/৩ কি.মি.	ডগা, পাতা সহ দুই আঙ্গুলে চিমটি দিয়ে তুলে আনে
৩৭	হুটকা	পাট ও আখ ক্ষেতে ভেজা, জমির আইলে, রাস্তার পাশে, জঙ্গলে, ছায়াযুক্ত, শুকনা জায়গায় হয়	বাড়ির আশে পাশে, ১/২ কি.মি.	ডগাসহ কচি পাতা দুই আঙ্গুলে চিমটি দিয়ে তুলে আনে
৩৮	পানিডাঙ্গা (গাংকলা)	পানিতে হয়। বর্ষা মৌসুমে হয়	বাড়ির কাছে, ১/২ কি.মি.	যখন একটা একটা করে তোলা হয় তখন দুই আঙ্গুল দিয়ে চিমটি দিয়ে তুলতে হয়। আর যখন একসাথে বেশী করে তুলে তখন মুঠি দিয়ে টান দিয়ে তুলে আনে
৩৯	বনঝুড়ি	শুকনা জমিতে হয়। সব মৌসুমে পাওয়া যায়	বাড়ির আশে পাশে হয়	
৪০	হাগড়া	খাল, পুকুর ও ডোবার পাড়ে বালু মাটিতে হয়। গাছ জ্বালানী হিশাবে ব্যবহার করা হয়। দাঁতের ব্যাথা হলে হাগড়া গাছের পাতা পানিতে দিয়ে ফুটিয়ে সেই পানি দিয়ে কুলি করলে দাঁত ব্যাথা সাড়ে। মাঘ - চৈত্র মাসে বেশী পাওয়া যায়	১ কি.মি.	ডাটাসহ কচি পাতা তুলে আনে
৪১	চিনিগুড়ি	স্যাঁত স্যাঁতে, শুকনা স্থানে হয়, বাড়ির আশে পাশে হয়। শীতকালে বেশী হয়। রাস্তার পাশে এবং জমিতে এই শাক জন্মায় না। হলুদ এবং আদার ক্ষেতে এই শাক হয়। এই শাক খেলে আমাশার উপশম হয়	বাড়ির আশে পাশে, ১ কি.মি.	পাতা তুলে আনে
৪২	মরিচপাতা	জমির আইলে, বাড়ির আশে পাশে, রাস্তায় হয়। আশ্বিন - মাঘ মাসে বেশী পাওয়া যায়। আমন ধানের জমিতে বেশী হয়। জ্বালানী এবং গরুর খাদ্য হিশাবে ব্যবহৃত হয়। মরিচ পাতা পঁচা মাছ দিয়ে রান্না করলে	বাড়ির আশে পাশে	শুধু পাতা তুলে আনে

		খেতে খুব মজা		
৪৩	বনপাট	ভেজা জমিতে হয়। ভাদ্র - আশ্বিন মাসে বেশী হয়	১ কি.মি.	শাকের কচি মাথা দুই আঙ্গুলে ছিড়ে আনে

আবাদী শাক

নং	শাকের নাম	প্রাপ্তি স্থান	দুরত্ব	প্রাপ্তির সময়
১	মিষ্টি আলু	শুকনা বালু মাটিতে হয়। চৈত্র মাসে বেশী হয়	বাড়ির আশে পাশে ও জমিতে, ১ কি.মি	কচি পাতা দুই আঙ্গুলে চিমটি দিয়ে তুলে আনে
২	গোল আলু	উঁচু ও শুকনা জমিতে হয়। অগ্রহায়ণ - মাঘ মাসে বেশী হয়	১/২ কি.মি.	কচি পাতা দুই আঙ্গুলে চিমটি দিয়ে ছিড়ে আনে
৩	সিম	শুকনা জায়গায়, সমতল জমিতে হয়। বাড়িতে হয়, জমিতেও হয়	বাড়ির আশে পাশে, ১ কি.মি.	কচি পাতা দুই আঙ্গুলে ছিড়ে আনে
৪	লাউ	শুকনা মাটিতে, বাড়িতে ও বাড়ির জমিতে হয়। শীতের দিনে চকে এবং বর্ষায় বাড়িতে হয়।	বাড়ির আশে পাশে, ১ কি.মি.	ডগা, পাতা কেটে আনে
৫	মিষ্টিকুমড়া	বাড়িতে, জমিতে, আখ ক্ষেতে, আলু ক্ষেতে হয়। শীতের দিনে চকে এবং বর্ষার দিনে বাড়িতে হয়	বাড়িতে, ১/২ কি.মি.	ডগা, পাতা কেটে আনে
৬	মেস্তা পাট	চকে বালু মাটিতে হয়। বৈশাক - জ্যৈষ্ঠ মাসে হয়	১ কি.মি.	পাতা তুলে আনে
৭	তোষা পাট	সব জিমিতে হয়। বৈশাখ মাসে হয়। ভাদ্র মাসে পাতা শুকিয়ে রাখে সারা বছর খায়। পেটের অসুখে উপকারী	১ কি.মি.	ছোট চোট গাছের মাথা এবং পাতা চিড়ে আনে
৮	নিম	উঁচু জায়গায়, ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে কচি পাতা খায়।	বাড়ির, বাড়ির আশে পাশে	কচি পাতা তুলে এনে শুধু ভাজি খায়
৯	ধন্দুল	শুকনা জায়গায় হয়	বাড়িতে	পাতা তুলে আনে
১০	ঝিংয়ে	শুকনা জায়গায়	বাড়িতে	পাতা তুলে আনে
১১	চালকুমড়া	শুকনা জায়গায়	বাড়িতে	পাতা তুলে আনে
১২	পেঁয়াজ পাতা	উঁচু জমিতে	১/২ কি.মি.	পাতা ছিড়ে এনে ভাজি খায়
১৩	রসুন পাতা	শুকনা ও উঁচু জমিতে	১/২ কি.মি.	পাতা ছিড়ে এনে ভাজি করে খায়
১৪	সাজনা	শুকনা জায়গায়, বসতভিটায়	বাড়িতে, ১/২ কি.মি.	কচি পাতার তলি এনে পাতা ছাড়য়ে নেয়
১৫	পাথরকুচি	শুকনা জমিতে	বাড়িতে	কচি পাতা তুলে আনে
১৬	খেসারি	চৈতালী ফসলের জমিতে হয়	১ কি.মি.	ডগা ছিড়ে আনে
১৭	ছোলা	শুকনা ও সমতল জমিতে	১ কি.মি.	ডগা ছিড়ে আনে
১৮	ডালিম	বাড়িতে শুকনা জায়গায়	বাড়িতে	কচি পাতা তুলে খায়
১৯	উচ্ছে	বাড়িতে, জমিতে শুকনা জায়গায়	বাড়ির আশে পাশে, ১/২ কি.মি.	কচি পাতা তুলে আনে
২০	পটল	জমিতে, উঁচু জায়গায় হয়	১ কি. মি.	কচি পাতা তুলে আনে
২১	মটর	শুকনা জমিতে হয়	১ কি.মি.	ডগা, পাতা তুলে আনে
২২	বেতের আগা	জঙ্গলে, বাঁশ বনে, থাল বিলে, পাগাড়ে হয়	২/৩ কি.মি.	কচি ডগা, পাতা তুলে আনে
২৩	চিনা বাদাম	শুকনা বালু জমিতে হয়	২/৩ কি.মি.	কচি ডগা, পাতা তুলে আনে
২৪	কাকরোল	শুকনা জায়গায়, বাড়িতে, জমিতে হয়	বাড়িতে ও জমিতে	কচি পাতা তুলে আনে
২৫	সরিষা	শুকনা জমিতে হয়	১/২ কি.মি.	ডগা, পাতা তুলে আনে
২৬	পাটি বেতের ফুল	বাড়ির আশে পাশে, শুকনা, পানি সব জায়গায়	বাড়ির আশে পাশে, ১/২ কি.মি.	ফুল তুলে এনে ভাজি খায়
২৭	ছন পাটের ফুল	শুকনা জমিতে হয়	১/২ কি.মি.	ফুল তুলে এনে ভাজি খায়
২৮	পাইন্নে মাদার	পানি ও শুকনা জায়গায় হয়	১/২ কি.মি.	গাছের কচি পাতা তুলে আনে
২৯	মোরগ ফুলের পাতা	বাড়িতে নরম ও ছায়াযুক্ত জায়গায়	বাড়িতে	কচি পাতা ও ডগা তুলে আনে
৩০	পুদিনা পাতা	বাড়ির আশে পাশে শুকনা জায়গায় হয়	১/৪ কি.মি.	শাকের কচি পাতা, ডগা তুলে আনে

শাক তোলার জন্যে বিশেষ জ্ঞান এবং দক্ষতার প্রয়োজন যা ছোট বয়স থেকে করতে করতে মেয়েরা শিখে ফেলে। জায়গা বুঝে, সময় বুঝে এবং গাছ বুঝে কোন্ শাক কেমন করে তুলতে হবে তার বিশেষ জ্ঞান এবং দক্ষতা মেয়েরা অর্জন করে ফেলে এবং শাক তোলা দেখলে বোঝা যায় এই জ্ঞান কত সুক্ষ্মভাবে অর্জিত হয়েছে। কোন প্রকার কাটার যন্ত্র ব্যবহার না করে কেবলমাত্র আঙ্গুল এবং নখের ব্যবহার দিয়ে শাক তোলা হয়। হাতকে বিশেষভাবে কাত করানো, আঙ্গুল দিয়ে আল্‌তোভাবে কাটার এই দক্ষতা না দেখলে বোঝানো মুশকিল। ছবিতে কিছুটা ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। শাক যারা তোলেন তাদের কাছে এই শাক পুনরুৎপাদনের দায়িত্ব কেউ নেবে না। ফলে এমনভাবে শাকটি তুলতে হবে যেন গাছটির কোন ক্ষতি না হয় এবং পরবর্তীকালে গাছটি যেন টিকে থাকে। এর বীজ থেকে যেন নিজেই আবার নতুর করে গজিয়ে ওঠে। আবার আবাদি ফসলের যে অংশ শাক হিশেবে খায় সেটা ফসলের খুবই প্রাথমিক অবস্থায়। তখন গাছটিও নরম থাকে। এই সময় শাক তুলতে গিয়ে জোরে টান দিলে গাছটি উপড়ে যেতে পারে কিংবা গোড়া হালকা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু না, শাক তোলার কারণে কোন ফসলের ক্ষতি হয়েছে বলে শোনা যায় নি। মিশ্র ফসলের জমিতে সাথী ফসলের বেলায় দেখা গেছে শাক এমনভাবে তোলা হয়েছে যেন একই সাথে ফসলের জন্যে নিড়ানীর কাজও হয়ে যায়। এখানে আমরা আগাছা পরিস্কার হয়েছে বলি নি খুবই সচেতনভাবে কারণ সাথী ফসল কোন আগাছা নয়। এগুলো আপনা থেকে হয় তবে এগুলো নিজেও এক ধরণের ফসল এবং উপাদেয় খাদ্য। বতুয়া শাক এর অন্যতম প্রধান উদাহরণ। বতুয়া যে ফসলের সাথে হয় যেমন গম, আঁখ, মুসুরী ডাল, সজ বা কলাই এর জমিতে। তবে মরিচের জমিতে এবং আলুর জমিতে ভাল হয়। সেখানে মূল ফসলের প্রতি মানুষের যেমন আগ্রহ থাকে বতুয়ার প্রতি আগ্রহ কোন অংশে কম থাকে না। তবে শুধু এইটুকু পার্থক্য থাকে যে মূল ফসলের ওপর জমির মালিকের একছত্র অধিকার থাকে কিন্তু সাথী ফসল অন্যরাও তুলতে পারে।

শাক তোলার জন্যে এক দুই কিলোমিটার পথ অতিক্রম করা মহিলাদের জন্যে খুব আশ্চর্য কোন ব্যাপার নয়। প্রতিদিনের খাদ্য সংগ্রহের জন্যে শাক তোলা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিশেবেই গণ্য করা হয়। তবে কোনোখানে যেতে গিয়ে পথে শাক পেলেও তুলে আনা হয়। কিছু শাক অন্য এলাকায় পাওয়া গেলে সেখানে আত্মীয় বাড়িতে বেড়াতে গিয়েও শাক তুলে নিয়ে আসে। সেক্ষেত্রে ৮ বা ১০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেয়া কোন ব্যাপারই নয়। ছাগল চড়াতে গিয়ে রাস্তার ধার থেকে বা নদীর পাড় থেকে বাচ্চারা বা বয়স্ক মহিলারা শাক কুড়িয়ে নিয়ে আসেন। এভাবে দূরত্বের বিষয়টি বলা হয়েছে।

কুড়িয়ে পাওয়া শাক তোলা নিয়ে গ্রামের ধনী ও গরিব পরিবার, বিশেষ করে যাদের জমি আছে এবং যাদের কোন জমি নেই, সেই ধরণের পরিবারের মহিলাদের মধ্যে এক ধরণের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সম্পর্কের মধ্যে লেন দেন আছে, যদিও এর মধ্যে কোন অর্থের বিনিময় খুব কম হয়। আবাদি জমির আইল থেকে কুড়িয়ে আনা শাক, কিংবা বাড়ির আশেপাশে রাস্তার ধারের শাক ধনী এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা নিজে কুড়াতে যেতে পারে না। এমনকি তাদের ছেলে মেয়েরা শাক কুড়াতে বাইরে যায় না। এই শাক গরিব মহিলারা কিংবা গরিব পরিবারের শিশুরা কুড়িয়ে এনে দেয়। এর বিনিময়ে তারা চাল কিংবা অন্যান্য ফসলের ভাগ পায়। খুদ, কুড়া, মুড়ি ইত্যাদি। এই লেনদেনের মধ্য দিয়ে ধনী ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা যেমন শাক খাওয়ার আনন্দটুকু থেকে বঞ্চিত হতে চান না তেমনি গরিব পরিবারের মহিলারা এই শাকের বদলে বিনা পয়সায় অন্য খাদ্যের নিশ্চয়তা পান। ছোট ছেলে মেয়েদের বেলায় ধনী পরিবারের মহিলারা বলেন, 'এই শাক এনে দিস পয়সা দেবো'। তাদেরকে এক বেলা ভাত দেয়। পুরনো জামা কাপড় দেয়। ব্যাপারীর বাড়িতে শাক তুলে দিলে সরিষার তেল পায়, কুমারের বাড়িতে দিলে পাতিল, তাঁতী কারিগর বাড়িতে দিলে কাথাঁ সেলাইয়ের সুতা দেয়। ঈশ্বরদীতে কচুর শাক এবং বতুয়া শাক পেলে ধনী পরিবারের মহিলারা বেশী খুশি হন। টাঙ্গাইলে ন্যাটাপ্যাটা এবং খেসারী কলই শাক, মটর কলই দিলে খুশী হন। বদরখালিতে কচুর শাক, হরি শাক দিলে খুশি। নারিস শাক এবং রাই শাক

পেলেও তারা খুব খুশি হন। ভাদ্র মাসে কলমির শাকের ডগা পানি থেকে তুলে এনে দিলে ধনী মহিলারা খুব খুশি হন।

বিক্রির জন্যে টাঙ্গাইলে ন্যাটাপ্যাটা, কলমি, বতুয়া, গিমা শাক বাজারে নিয়ে যায়। ঈশ্বরদীতে খারকোন (থানমান), কলমি, কচু, ঢেঁকি, বতুয়া শাক বাজারে বিক্রির জন্যে নিয়ে যায়। কক্সবাজারে হরি শাক, কচু শাক বাজারে বিক্রির জন্যে নিয়ে যায়। বাজারে বিক্রি জন্যে শাক তোলা এবং নিজে খাওয়ার জন্যে শাক তোলার মধ্যে পার্থক্য থাকে। নিজের খাওয়ার জন্যে শাক তুললে শুধু সেই অংশটি নেবে যে অংশটি সরাসরি রান্না হবে, কিন্তু বাজারে বিক্রির জন্যে নিতে হলে শাকের গাছের একটি বড় অংশ কাটতে হয় কারণ গোছা বাঁধতে হয়।

শাক তোলা নিয়ে গান আছে। কবি নজরুল ইসলামের বিখ্যাত গান 'নদীর নাম সই অঞ্জনা' আসলে নদীর গান নয়, এটা হচ্ছে শাপলা ও কলমি শাকের গান। আবার রংপুরের বিখ্যাত ভাওয়াইয়া গান, ওরে দোলা মাটির মোর বতুয়ারে শাক বতুয়া হল্‌ফল্‌ করে, শাক তোলা এবং রান্নার বর্ণনায় ভরপুর। গল্প উপন্যাসেও শাক তোলার কথা অহরহ থাকে।

অধ্যায় ৩: শাক রান্না ও খাওয়া

শাক রান্না

শাক কাকে বলে এই কথা বলতে গিয়ে গ্রামের মহিলারা প্রথমেই বলেছেন রান্নার কথা। সবুজ পাতা, ডাঁটা যাই হোক না কেন, রান্না না হলে তা শাক হবে না। তাই শাকের রান্না নিয়ে প্রচুর আলোচনা ও কথা হয়েছে। শাকের রান্নার সাধারণ কিছু নিয়ম কানুন থাকলেও রান্নার ধরণে এলাকাভেদে অনেক পার্থক্য আছে। টাঙ্গাইল, কক্সবাজার ও পাবনার গবেষণা এলাকায় আমরা তাই ভিন্নভাবে তথ্য নিয়েছি রান্নার জন্যে। শাকের মনোগ্রাফের সাথে রান্নার কথা বিস্তারিত আছে। সেখানে আমরা আমাদের তিনটি গবেষণা এলাকার তথ্য ছাড়াও অন্যান্য এলাকার তথ্য দেবার চেষ্টা করেছি এবং রান্নার নানান ধরণ নিয়ে লিখেছি। সেই তথ্যগুলো এখানে পুনরাবৃত্তি করছি না। এই অধ্যায়ে রান্নার বিভিন্ন ধরণের ব্যাখ্যা এবং এর সাথে কুড়িয়ে পাওয়া শাকের স্বাদ ও পুষ্টির কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।

ক. কুড়িয়ে পাওয়া শাক রান্নার রকমফের

অন্যান্য আবাদি ফসলের রান্নার সাথে কুড়িয়ে পাওয়া শাকের রান্নার মিল কম। প্রথমতঃ কুড়িয়ে পাওয়া শাকের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এটা সহজভাবে পাওয়া এবং সহজভাবে রান্নার একটি খাদ্য। বাড়ির আনাচে কানাচে (কেউ বলেন আলানে পালানে) কিংবা রাস্তার ধারে কিংবা ফসলের ক্ষেত থেকে কুড়িয়ে এনে শাক রান্না করা সহজ। গ্রামে কেউ এই শাকগুলো কিনে খায় না। কিনে খায় না বলেই একে কুড়িয়ে পাওয়া শাক বলে। শাক রান্নার সাথে, শাক কুড়ানোর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে জড়িত। ফলে বাজার থেকে শাক কিনে আনলে যে রান্না করে, তার সাথে সম্পৃক্ততা থাকে না। এটা মহিলাদের জন্যে সামাজিক এবং সংস্কারেরও ব্যাপার। কুড়িয়ে পাওয়া শাক রান্নার মধ্যে কেবল একটি রান্নার দক্ষতাই ফুটে ওঠে না, এর মধ্য দিয়ে পরিবেশগত দিক, জীবিকার প্রয়োজনের সাথে প্রাণবৈচিত্র্য রক্ষার দিক এবং সামাজিক দিকগুলো নানাভাবে ফুটে ওঠে।

শহরে আজকাল কয়েকটি শাক যেমন কলমি শাক, থানকুনি ইত্যাদি বাজারে বিক্রির জন্যে পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রামের কথা ভিন্ন। শাক মানে হচ্ছে তুলে আনা। নিজে গিয়ে কিংবা মেয়েটিকে পাঠিয়ে শাক তুলে এনে রান্না হবে। এর সাথে পয়সার কোন সম্পর্ক নেই। বাজারেরও কোন সম্পর্ক নেই। তুলে আনা বলতে গিয়ে আরও একটি কথা এসে যায় সেটা হচ্ছে, শাকটি একেবারে তরতাজা। কুড়িয়ে আনার সাথে সাথেই রান্না হচ্ছে। কুড়িয়ে

আনার সময়ের সাথে রান্নার সময়ও নির্ধারিত হয়ে যায়। অর্থাৎ শাকটি গাছ থেকে আলাদা হতে না হতেই রান্না হয়ে যাচ্ছে। শাকের বেলায় এতো তাজা পাওয়ার সৌভাগ্য বাজার থেকে কেনা শাকের বেলায় হবে না। সময়ের কথাটি শাকের রান্নার কথা বলতে গিয়ে নানাভাবে পেয়েছি। তাই এক এক শাকের রান্নার সময়ের এবং খাওয়ার সময়ের মধ্যেই পার্থক্যও লক্ষ্য করেছি। এসব কিছুই শাকের রান্না এবং খাওয়ার বিষয়ে বোঝার জন্যে অতি জরুরী। কোন তথ্যই সাধারণীকরণ করা যাচ্ছে না। কোন তথ্যই গুরুত্বের দিক থেকে কম হচ্ছে না। শাকের মতোই রান্না এবং খাওয়া বৈচিত্র্যপূর্ণ।

কুড়িয়ে পাওয়া শাক যদিও গরিব মানুষের খাদ্যের সংস্থান হিশেবে গুরুত্বপূর্ণ তবুও খাদ্যের তালিকায় শাক অবস্থাপন্ন পরিবারেও থাকতে পারে। প্রায় সব শ্রেণীর মহিলারা শাক খেতে খুবই পছন্দ করেন। তাই তাঁরা শাকের নানারকম রান্নার পদ্ধতিও আবিস্কার করেছেন। শাকের রান্না নিয়ে মহিলাদের মধ্যে আলোচনা হয় এবং একে অপরের কাছ থেকে শাক রান্না শেখেন। এই শেখার চর্চার শেষ নেই। এর ফলে নতুন নতুর রান্নার উদ্ভব হচ্ছে।

শাক কয়েকভাবে রান্না করা হয়। গরিব মানুষ ভাতের সাথে তরকারি হিশেবেই শাক খায়। কারণ, অনেক সময় অন্য কোন রকম তরকারি ভাতের সাথে থাকে না। গরিব মানুষ শাক কুড়িয়ে আনে। ছোট মেয়েরা এবং ছেলেরা মাকে শাক কুড়িয়ে আনতে সাহায্য করে। কৃষিগৃহস্থ পরিবারের মহিলারা এলাকার গরিব মহিলাদের কুড়িয়ে আনা শাক খান।

খ. গবেষণা এলাকায় রান্না

তিনটি এলাকা থেকেই রান্নার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই তথ্য সংগ্রহের সময় অনেক সময় হাসাহাসিও হয়েছে প্রচুর। তিনটি এলাকায় আলাদাভাবে এবং একসাথেও রান্নার তথ্য নেয়া হয়েছে। সেই আলোচনা থেকে পাওয়া তথ্য এখানে তুলে ধরা হচ্ছে:

১. *এলাকা: টাঙ্গাইল*

ক. ভর্তা

সময়ের স্বল্পতা ও সহজ রান্না হিশাবে ভর্তা, ছানা বা বাটা হিশাবে শাক রান্না হয়। ঘরে তরকারি নেই। কি রান্না করে ভাত খাবে তার ঠিক নেই। তখন শাক-পাতা কুড়িয়ে এনে (অল্প হলে) ভাতে সিদ্ধ দিয়ে ভর্তা করে খায়। টাঙ্গাইলে তাঁতী পরিবারগুলো অনেক সময় কাজে ব্যস্ততার কারণে সকালে ও দুপুরে শাক ভর্তা খায়। কৃষক পরিবারগুলোর যখন দাওয়া মারী (ফসল আবাদ/ফসল তোলা) লাগে তখনও শাক ভর্তা ভাত বেশী খায়।

তরকারীর ধরণ অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত রস থাকা বা না থাকা অবস্থায় খাদ্য তৈরী হলে তার নাম ভর্তা, ছানা বা বাটা বলে। তবে সব ক্ষেত্রেই একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো; সেটা হচ্ছে, এটা পুরো রান্না নয়, সিদ্ধ বা ভাপে দেয়ার পর হাতে বা পাটায় প্রস্তুত করতে হয়। এর সাথে ডেক্‌চির সম্পর্ক ঘটে না, এমন কি সিদ্ধ করার সময়ও ভাতের সাথে বা অন্য কিছুর সাথে করা যায়। ফলে আগুনের ব্যবহারও কম থাকে। জ্বালানী বাঁচাতে গিয়ে অন্য খাদ্যের সাথে সেদ্ধ করার রেওয়াজ হয়ে গেছে। এছাড়া বিভিন্ন ধরণের মসলার ব্যবহার কম করেও খাদ্য তৈরী করা যায়।

ভর্তা, ছানা, বাটা

ভাতের ভাপে সিদ্ধ দিয়ে তার সাথে কাঁচা মরিচও সিদ্ধ দেয়। ভাত রান্না হলে সিদ্ধ শাক ও মরিচ তুলে রেখে পিঁয়াজ কেটে সিদ্ধ মরিচের সাথে হাতে ডোলে শাক ভর্তা তৈরী করে। যেমন, কচু শাক, কলমি শাক ভর্তা। যার মধ্যে কোন রস থাকে না। কাঁচা মরিচ, রসুন, কালিজিরা টেলে তার সাথে কস্তুরী, খারকোন পাতা কুড়িয়ে এনে খোলায় টেলে এক সাথে পাটায় বেটে ভর্তা করে, এটাকে মরিচ বাটা বলে।

কুড়িয়ে পাওয়া শাকপাতা বসা ভাতের ভাপে সিদ্ধ দিয়ে হাতে ডোলে ভর্তা করে খায়। (আবাদী শাক) উস্তে পাতা, গোল আলুর পাতা, লাউ পাতা, চালকুমড়া, মিষ্টিকুমড়া, ডাটা পাতা, পুঁইশাক এবং (অনাবাদী শাক) চুকা কলার পাতা, কচুশাক, হেলেঞ্চা শাক, সেঞ্চি শাক, কলমি শাক, দণ্ড কলস, তেলাকুচা শাক এসব শাক তুলে এনে ভাতের ভাপে সিদ্ধ দিয়ে হাতে ডোলে ভর্তা করে খায়।

আবাদ করা শাকও ভাতে সিদ্ধ দিয়ে হাতে ডোলে ভর্তা করে। লালশাক, মিষ্টি কুমড়ার পাতা বসা ভাতের ভাপে সিদ্ধ দেয়। সাথে কাঁচা মরিচও সিদ্ধ দেয়। তারপর পিঁয়াজ কেটে হাতে ডোলে ভর্তা করে খায়। এ ভর্তায় অনেকে সরিষা তেল দিয়ে খায়।

বিশেষ বিশেষ শাকের ভর্তার উদাহরণ

তেলাকুচা ও দণ্ডকলস পাতা ভর্তা: দুই মুঠ শাক তুলে ধুয়ে মাটির খোলায় ভেজে কালিজিরা, দুইটা রসুন (মাঝারি), শুকনা মরিচ একত্রে ভেজে পাটায় বাটে। এই মরিচ বাটায় কোন পিঁয়াজ দেয় না।

খারকুন, কস্তুরী, পিপুরের পাতা ভর্তা: এক মুঠ পাতা তুলে কড়াইতে লবণ দিয়ে অল্প একটু পানি দিয়ে মাটির সরা দিয়ে ঢেকে দেয়। সিদ্ধ হয়ে পানি শুকিয়ে গেলে ঘন ঘন নাড়া দিয়ে ভেজে একটা বাটিতে রেখে ঐ কড়াইতে একটা রসুন ৮ থেকে ১০টি শুকনা মরিচ ভেজে কড়াইতে রাখে। প্রথমে মরিচগুলো পিষে তারপর সিদ্ধ পাতা ও রসুনগুলো দিয়ে একত্রে পিষে। একে মরিচ বাটা বলে।

কলমি শাক ভর্তা: কলমি শাক ডগা শাকের কচি অংশসহ তুলতে হবে, কচি ডগা হতে হবে। শাক ভাল করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়ে ভাত যখন আধা ফুটা হয়ে ভাতের মারটা ঘন হয়ে আসবে তখন শাকগুলো ডেক্‌চি দিয়ে ঢেকে দেয়। আস্তে আস্তে জ্বাল দিয়ে ভাতের মার যখন শুকিয়ে গিয়ে শাকগুলো সিদ্ধ হয়ে যাবে, তখন পাতাগুলো আলাদা বাটিতে রাখে। কাঁচা পিঁয়াজ ১টা, কাঁচা মরিচ পরিমাণমত কুচি কুচি করে কেটে লবণ দিয়ে আগে মরিচ, পিঁয়াজগুলো হাত দিয়ে চটকিয়ে নিয়ে এর মধ্যে সিদ্ধ শাকগুলো দিয়ে হাত দিয়ে কচলিয়ে ভর্তা করে।

কলমি শাক মাছ দিয়ে রান্না করলে বা পিটালী রান্না করলে হলুদ ও মসলা ব্যবহার করা হয়। গরিব হলে হলুদ মরিচ, লবণ ও পিঁয়াজ থাকলে একটু তেল দিয়ে রান্না করে। কলমি শাক কচি ডোগাসহ ছোট করে কেটে মাছ পরিষ্কার করে পাতিলে রেখে মরিচ বাটা, হলুদ বাটা, রান্ধুনী সজ, তেজপাতা ও জিরা বাটা আন্দাজ মত দিয়ে তেল, লবণ একটা পিঁয়াজ কুচি করে কেটে শাক, মাছগুলো মসলা দিয়ে মাখিয়ে অল্প পানি দিয়ে ঢেকে রান্না করে। ঝোল যখন ঘন হয়ে আসে তখন নামিয়ে ফেলে। এই শাকই আবার ভাজি করলে কোন হলুদ বা মসলা ব্যবহার করে না।

হেঞ্চি শাক ভর্তা: কচি ডগাসহ শাক তুলে দুই তিনটা ধোয়া দিয়ে পানি ঝড়িয়ে ভাতে সিদ্ধ দেয়। শাক সিদ্ধ হয়ে গেলে আলাদা মাটির খোরায় (বাটি) তুলে কাঁচা মরিচ, পিঁয়াজ কুচি কুচি করে কেটে লবণ দিয়ে পেঁয়াজ মরিচ চটকিয়ে সিদ্ধ শাকগুলো হাত দিয়ে কচলিয়ে ভর্তা করে।

হেঞ্চি শাক কুচি কুচি করে কেটে হাত দিয়ে চেপে রস বাহির করে। এক মুঠ ভিজানো আতব চাউল বাটা, হলুদ, মরিচ, জিরা, আদা বাটা ও তেজপাতা বাটা আলাদা করে রাখে। কড়াইতে তেল দিয়ে যখন তেল গরম হয়ে যায় কাটা পিঁয়াজ, একটা রসুন সেচা, তেজপাতা গরম তেলের মধ্যে দিয়ে ২-৩টা নাড়া দেয়। বাদামি রং হয়ে গেলে এর মধ্যে শাকগুলো দিয়ে একটু পানি দিয়ে ঢেকে দেয়। সিদ্ধ হয়ে গেলে চাউল বাটাগুলো শাকের মধ্যে নাড়তে নাড়তে যখন ঘন আটালো হয়ে তখন নামিয়ে ফেলে। ভর্তা করে পাটায় পিশে।

লাউ পাতার ভর্তা: ভাত রান্না করার সময় ভাতটা যখন ফিরি বান্দে বা ভাতের নীচে পানি চলে যায় তখন পাতা ভাতের উপরে ভাপে সিদ্ধ দিতে হয়। সাথে ৪/৫টা কাঁচা মরিচও সিদ্ধ দিতে হয়। পাতার উপরে হাল্কা লবণের ছিটা দিতে হয় যাতে করে পাতা তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়। ভাত রান্না হয়ে গেলে চুলা থেকে ভাতের পাতিল নামিয়ে নুছানি দিয়ে মুছার পরে ভাত থেকে পাতাগুলি আলাদা করা হয়। ১টা পিঁয়াজ কুচি কুচি করে কেটে

লবণ মরিচ ও পিঁয়াজ একসাথে ডলে পাতার সাথে সরিষা তেল মাখানোর পরে ভর্তা হয়ে যায়। গরম ভাতের সাথে ভর্তা খেতে খুব মজা লাগে।

সাজনা পাতায় ভর্তা: সাজনা পাতা আলাদা করে বেছে নেওয়ার পরে পাতিলে বা কড়াইতে ভেজে বা টেলে নিতে হয়। সাথে মরিচ, রসুন ও কালিজিরা টেলে লবণ, মরিচ একসাথে বেটে নেওয়ার পরে পাতাগুলোসহ একত্রে বেটে নিতে হয়। একে সাজনা পাতার ভর্তা বলে। লাউ শাক ও সাজনা শাক দুইভাবেই ভর্তা করা হয়।

অজাত কচু বা বন কচু ভর্তা: কচু শাক আস্তা অবস্থায় ধুয়ে নিয়ে ছোট করে কেটে ভাতের মার ঘন হয়ে আসলে ভাতের উপরে দিয়ে ঢেকে দেয়। আস্তে আস্তে দিয়ে ভাতের মার শুকিয়ে গিয়ে কচু যখন সিদ্ধ হয়ে যাবে তখন সিদ্ধ করা কচুগুলো আলাদা থালাতে নামিয়ে রেখে শুকনা মরিচ মাটির খোলায় ভেজে লবণ পিঁয়াজ দিয়ে চটকিয়ে সিদ্ধ কচু শাকগুলো এর মধ্যে দিয়ে কচলিয়ে ভর্তা করে। এর মধ্যে সরিষার তেল দেয়। কচুর পাতা এক মুঠ পরিমাণ তুলে ধুয়ে পানি ছড়িয়ে ভাতে সিদ্ধ করে। এর সাথে ৮ থেকে ১০টি কাঁচা মরিচ কুচি করে কেটে হাত দিয়ে কচলিয়ে ভর্তা করে।

কচুর ডাইগার গোড়া, পাতাসহ ডাইগা কেটে এনে আস্ত অবস্থায় ধুয়ে ছোট করে কেটে পাতিলে আগে আন্দাজ মত লবণ দিয়ে কচুগুলো দিয়ে সিদ্ধ করে। সিদ্ধ হয়ে গেলে হলুদ বাটা, জিরা, রান্ধুনী সজ, তেজপাতা বাটা দিয়ে নাড়তে নাড়তে যখন শাকগুলো গলে যাবে তখন কড়াইতে তেল দিয়ে রসুন ছেচা, শুকনা মরিচ ও কয়েকটা জিরা ছেড়ে দেয়। যখন বাদামী রং হয়ে যাবে তখন সিদ্ধ করা শাকগুলো এর মধ্যে ছেড়ে দিয়ে নাড়া দিয়ে মিশিয়ে নামিয়ে রাখে। গরিব হলে হলুদ মরিচ আর একটু তেল দিয়ে ভাজি করে। এটা ঘন্টো রান্না হয়।

দণ্ড কলস শাকের ভর্তা: দণ্ড কলস শাক দুইমুঠ তুলে এনে ধুয়ে বসা ভাত রান্না করলে ভাতের মার শুকিয়ে আসলে ভাতের ওপরে শাক ও কাঁচা মরিচ সিদ্ধ, মরিচ ও পিঁয়াজ হাতে ডলে মাখিয়ে ভর্তা করে।

ভাজি

যে কোন শাক কুচি কুচি করে কেটে কড়াইয়ে ভাজলে তাতে পানি থাকবে না, ঝরঝরা হয়ে যাবে। তখন ঐ রান্না করা শাককে ভাজি বলে। গ্রামের মানুষ বলে যে, কোন শাক কড়াইয়ে দিয়ে তেল, পেঁয়াজ, মরিচ দিয়ে শুকনা শুকনা করা হয়, সেটাই ভাজি। শাক ভাজায় হলুদ দেয়া হয় না।

টাঙ্গাইল

বেশীর ভাগ শাকই ভাজি করা হয়। ভাজি বলতে এই এলাকার মানুষ বুঝে যা, তেলে পেঁয়াজ দিয়ে ভাজা। যেমন, আলু কুচি কুচি করে কেটে পানি জড়িয়ে কড়াইতে তেল দিয়ে তেল যখন গরম হবে তখন পিঁয়াজ, কাঁচা মরিচ দিয়ে আলুগুলো দিয়ে আন্দাজ মত লবণ দিয়ে সরা দিয়ে ঢেকে রাখে। কিছুক্ষণ পর পর ভাজা কাঠি দিয়ে নাড়া দেয়। সিদ্ধ হয়ে গেলে বারবার নাড়তে হবে। ভাজা ভাজা হয়ে যাবে তখন নামিয়ে রাখবে।

কলমি শাক ভাজি: কলমি শাক কুড়িয়ে আনার পরে পরিষ্কার করে বেছে নিতে হয়। বাছার পরে কুচি কুচি করে কেটে ধুয়ে নিয়ে পানি ঝরাতে হয়। পানি ঝরে গেলে চুলার উপর কড়াই বসিয়ে কড়াইতে শাক দিতে হয়। সাথে লবণ, কয়েকটা কাঁচা মরিচ দেওয়া হয়। তারপর আস্তে আস্তে আগুনের জ্বাল দিয়ে যখন শাকটা সিদ্ধ হয়ে ঝরঝরা হয় তখন শাকগুলো একপাশে করে কড়াইতে সরিষার তেল দিতে হয়। তেলটা গরম হলে শুকনা মরিচ ভেজে নিয়ে লবণের মধ্যে রাখা হয় যেন মরিচটা মচমচে থাকে। তারপরে তেলের মধ্যে পিঁয়াজ, রসুন দিয়ে শাক তেলে বাগার দিতে হয়। বাগার দেওয়ার পরে শাক রান্না হয়ে যায়। তখন শাকটা নামিয়ে ফেলতে হয়। শাক নামিয়ে একটা বাটিতে রাখতে হয়। এভাবে যে কোন শাক ভাজি করা হয়। গরিব হলে কড়াইতে অল্প করে সরিষার তেল দিয়ে তার মধ্যে শুকনা মরিচ ভেজে তুলে ঐ তেলে শাক নেড়ে দিয়ে নামিয়ে ফেলে। ভাজা মরিচ সাথে নিয়ে শাক দিয়ে ভাত খাবে।

অজাত বা বন কচু ভাজি: কচু কুচি কুচি করে কেটে ধুয়ে পানি ঝরায়। তারপর কড়াইতে তেল গরম হয়ে গেলে পিঁয়াজ কাঁচা, মরিচ তেলের মধ্যে দিয়ে নাড়া দিয়ে যখন পিঁয়াজ একটু ভাজা হয়ে যাবে তখন কাটা কচুগুলো দিয়ে এর মধ্যে হলুদ বাটা, মরিচ ও ধনিয়া, জিরা বাটা ও লবণ আন্দাজ মত দিয়ে অল্প একটু পানি দিয়ে সরা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। সিদ্ধ হয়ে গেলে বারবার ভাজা কাঠি দিয়ে নাড়তে হবে। নাড়তে নাড়তে যখন ভাজা হয়ে র‍্যালচে রং হয়ে যাবে তখন নামিয়ে রাখে।

সব ধরণের শাকই ভাজা করে। কড়াইতে তেল, পিঁয়াজ, রসুন ও মরিচ দিয়ে শাক ভাজা করে।

চড়চড়ি

যে কোন ছোট মাছ কেটে ধুয়ে তার সাথে পিঁয়াজ, কাঁচা মরিচ, হলুদ, তেল, লবণ কলমি শাক, পুঁইশাক বা ডাঁটাশাকসহ মাখিয়ে তাতে পানি দিয়ে ঢেকে জ্বাল দেয়। শাকও মাছ সিদ্ধ হয়ে গেলে নিচে একটু রসা রসা থাকতে নামিয়ে ফেলে। এটাকে চড়চড়ি বলে।

শাকের নাম ও ভাজি, ভর্তা ও চরচড়ি

রান্নার ধরণ	শাকের নাম
ভর্তা	কচু শাক, হেলেঞ্চা শাক, সেঞ্চি শাক, কলমি শাক, দন্ড কলস, খারকুন পাতা, কস্তুরি পাতা, ডাটার পাতা, লাউ শাক,
চাসনি	কচু শাক, হেলেঞ্চা শাক, সেঞ্চি শাক, কলমি শাক, দন্ড কলস, ডাটার পাতা, লাউ শাক,
ভাজি	যে কোন শাক কুচি কুচি কেটে ভাজে
চরচড়ি	কলমি শাক, ছোট মাছ দিয়ে লাউ শাক, মিষ্টি কুমড়া পাতা, খুইরা খাটা, হেলেঞ্চা শাক

টাঙ্গাইল ও ঈশ্বরদীতে শাকের পিটালু রান্না

পাতিল গরম হলে তাতে তেল দিয়ে পিঁয়াজ কাটা ও রসুন ছেঁচা দিয়ে ভাজতে হবে। একটু লাল হয়ে আসলে হলুদ, মরিচ, মসলা বাটা দিয়ে একটু পানি দিয়ে কসিয়ে তার মধ্যে শাক দিতে হবে। শাক কসিয়ে তাতে অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে সরা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। শাকে বলক উঠলে, আটা বা চালের গুড়া গুলিয়ে শাকের মধ্যে দিতে হবে আর বাঁশের নাকুর দিয়ে নাড়তে হবে। এভাবে কিছুক্ষণ জ্বাল দেয়ার পর শাক ও চালের আটা সিদ্ধ হয়ে পিটালু রান্না হয়ে যায়। এই শাককে পিটালু শাক রান্না বলে। এলাকার মানুষ হলুদ কেন ব্যবহার করে সে সম্পর্কে বলেন, সব শাকে হলুদ দেয়া হয় না। যদি কোন শাক মাছ দিয়ে রান্না করে তাহলে হলুদ ব্যবহার করে। তারা জানান, হলুদ ব্যবহার করা হয় তরকারির রং সুন্দর হওয়ার জন্য এবং মাছের আসটে গন্ধ দূর হওয়ার জন্য।

গ. টাঙ্গাইল, ঈশ্বরদী এলাকায় রান্নার পদ্ধতি

সাজনা শাক ভাজি: সাজনা শাকটি তুলে এনে পরিস্কার বেছে নিয়ে সিলভারের বাটি বা মাটি ঢোস্‌কায় ধোয়া হয়। ধোয়া শাক চালনায় ঝরান দিয়ে রাখে কিছুক্ষণ। তারপর কড়াইয়ের মধ্যে শাকটি দিয়ে তার সাথে কাঁচা মরিচ ও লবণসহ সিদ্ধ করা হয়। সিদ্ধ করার সময় ঢাকনা দিয়ে ঢেকেও দেওয়া হয়। সিদ্ধ শেষ হলে নামিয়ে অন্য পাত্রে রাখা হয়। ঐ কড়াইটি আবার ধুয়ে নিয়ে পিঁয়াজ অথবা রসুন ছেঁচা, তেল দিয়ে বাদামি রংয়ের ভাজা হলে নামিয়ে রাখা শাকটি তেলের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে নাড়াতচাড়া করে নামিয়ে ফেলা হয়।

চরচড়ি রান্না: ছোট মাছগুলি সংগ্রহ করে ভাল করে কুটে নিতে হয়। শাকগুলিও কুটে বেছে নিতে হয়। কড়াইয়ে মাছগুলো দিয়ে তার মধ্যে মরিচ, পিঁয়াজ, লবণ হলুদ, তেল ও পানিসহ জ্বালানো হয়। মাছগুলো যখন

কসিয়ে আসে তখন শাকগুলো মাছের উপর ছেড়ে দেয়া হয়। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিয়ে আস্তে আস্তে জ্বাল দিতে হয়। কড়াইয়ের ঝোল যখন শুকিয়ে আসে তখন নামিয়ে ফেলতে হয়। আবাদীর মধ্যে লাউ শাক লরা খায়। তবে এর সাথে সীম মিশিয়েও খায়।

নরাশাক: লাউ শাক অথবা মিশ্র শাক রান্নার জন্যে নেটাপেটা, কাটা খুইরা, হেলেঞ্চা, হেঞ্চি, তেলাকুচা, দন্ডকলস, কলমি, মোরগ শাক, দুধালু, বতুয়া এরকমের নানা ধরণের শাক তুলে এনে হাত দিয়ে বেছে কুটি কুটি করে ফিরে চালনা বা সিলভারের বাটিতে রেখে দেয়। বালতি বা বাটিতে পানি নিয়ে তিন থেকে চার ধোয়া দিয়ে চালনায় ঝরান দেয়। পানি ঝরা শেষ হলে কড়াই চুলায় বসিয়ে দিয়ে শাকগুলি ছেড়ে দিয়ে লবণের ছিটা দিয়ে ঢেকে কিছুক্ষণ জ্বাল দেয়। শাক আধা সিদ্ধ হলে আমান আমান কাঁচা মরিচ দেয়। শাক সিদ্ধ হলে নামিয়ে দিয়ে পিঁয়াজ এবং রসুন পলে (ছেঁচে) কড়াইয়ের মধ্যে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে রসুন, পিঁয়াজ দিয়ে নাড়াচাড়া করে। পিঁয়াজ রসুনের রং বাদামি হলে সিদ্ধ শাক ছেড়ে দিয়ে নাড়াচাড়া করে নামিয়ে ফেলতে হয়।

ছোট মাছ আর লাউশাকের ডোগা দিয়ে চরচড়ি করে। মাছ কেটে পরিস্কার করে ধুয়ে নিয়ে এবং শাকগুলি বেছে নিয়ে কাটা হয়। মাছের পরিমাণ অনুযায়ী পাতিলের মধ্যে পিঁয়াজ, কাঁচা মরিচ, হলুদ, রসুন দিয়ে তার সাথে ছোট মাছ ও শাক দিয়ে হাত দিয়ে মেখে সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে চুলায় বসিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আস্তে আস্তে জ্বাল দেয়। পানি শুকিয়ে গেলে নামিয়ে ফেলে।

দন্ড কলস শাক ভর্তা: শাক তুলে ভালভাবে বেছে নিয়ে পরিস্কার পানিতে ধুতে হয়। তারপর রসুন, কাঁচা পিঁয়াজ কাটখোলায় ভাজতে হয়। কাটখোলায় ভাজা রসুন পিঁয়াজের সাথে লবণ দিয়ে শাক ঢেকে দিয়ে জ্বাল দিতে হয়। সিদ্ধ হলে নামিয়ে পাটায় বেটে সামান্য সরিষার তেল দিয়ে ভর্তা করে।

চালকুমড়ার পাতার বড়া: কানাই, দন্ডকলস, চালকুমড়ার পাতা তুলে বেছে নিয়ে পাতাগুলি ধুয়ে রাখা হয়। আতপ চাল ভিজিয়ে পাটায় বেটে তার সাথে কাঁচা মরিচ, রসুন, পিঁয়াজ ও সামান্য হলুদ, লবণ চাল বাটার সাথে মিশিয়ে দরদরা (গাঢ়) করে গুলে নিয়ে একটা পাতা ভাঁজ করে গোলার মধ্যে চুবিয়ে কড়াইয়ের তেলের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে উল্ট ভেজে বড়া করে।

গন্ধভাদালি পাতার বড়া: শাক পাটায় বেটে সাথে একটু আলোচালও বাটতে হয়। এর সাথে হলুদ, মরিচ, পিঁয়াজ, রসুন বেটে লবণ দিয়ে মিশিয়ে অল্প তেলে কড়াইয়ে ভাজতে হয়। ভাজা হলে এটাকে গন্ধভাদালের বড়া বলে।

ঘ. বদরখালী এলাকার রান্নার পদ্ধতি

বদরখালী এলাকায় মহিলারা শাকের রান্নার বর্ণনা একটু ভিন্নভাবে দিয়েছেন। এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়। যেমন শাক রান্নার সময় মরিচ দেয়া না দেয়া, চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না এবং সীমের বিচির ব্যবহার খুব উল্লেখযোগ্য। আমরা এখানে গ্রামের মহিলারা রান্নার বর্ণনা যেভাবে দিয়েছেন, সেভাব বজায় রেখেই লিখেছি। প্রয়োজনে স্থানীয় শব্দের অর্থ বাংলায় লিখে দেয়া হয়েছে। তবে বর্ণনা বদল করা হয় নি।

কয়েকটি উদাহরণ

কানাই শাক: এই শাকের সাথে অন্যান্য শাক মিশিয়ে রান্না করা হয়। শাক বাছার পর ধুয়ে পানি ঝরাতে দিতে হয়। এরপর কড়াইয়ে তেল দেয়, রসুন খোসা ছাড়িয়ে থেতলে নেয়। তেল গরম হলে রসুন দেয়, রসুন লালচে হয়ে এলে ঐ শাকটি কড়াইয়ে দেয় ও পরিমাণ মত লবণ দেয়। কিছু সময় পর শাকটি মজে আসলে চুলা থেকে নামিয়ে ফেলে। শাক রান্নার সময় কোন মরিচ দেয় না, ভাত খাওয়ার সময় শাকের সাথে কাঁচা মরিচ কামড়িয়ে খায়।

সাজনা শাক চান্নী (চাটনি): শুধু সাজনা শাক খোলায় গরম করে, ভেজে, এর সাথে মরিচ রসুন, পিঁয়াজ, শুকনা ইচা (চিংড়ি) মাছ আলাদা আলাদা ভেজে একত্রে পাটায় বেটে ভালতেল (সরিষার তেল) দিয়ে মেখে চাটনি করে।

থানকুনি: মিশ্র সবজি হিশাবে - কলার পল, আলু, বায়ুন (বেগুন) টমেটো ভাজা সীমের বিচি, শুকনা মরিচ বাটা, অল্প হলুদ বাটা পিঁয়াজ লবণ একত্রে মেখে পানি দিয়ে কষাতে হয়। যখন তরকারির পানিটা শুকিয়ে আসে তখন থানকুনির পাতাটা তরকারির উপর ছিটিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পর কড়াই এর তরকারিটা নামিয়ে অন্য পাত্রে রাখতে হবে। আবার কড়াইতে তেল দেওয়ার পর তেলের মধ্যে ২/৩টা শুকনা মরিচ ও রসুন ছেচা দিয়ে নাড়তে হয়। যখন রসুনটা বাদামী ও মরিচটা কালো হবে তখন ঢেলে রাখা তরকারিটা কড়াইতে দিয়ে ২-৩টা নাড়া দিয়ে নামিয়ে ফেলতে হবে।

লাউ শাকের লরা: শাক তুলে হাত দিয়ে ২ আঙ্গুলের দাগের সমান (২ পরিমাণ) তুলে। এরপর ধুয়ে শুধু লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে।

হেঞ্চি: ইলিচি শাক তোলার পর হাত দিয়ে ছোট ছোট করে কেটে পানিতে ধুয়ে বাঁশের ডালাতে রাখে। কড়াইয়ে তেল দেয়, রসুন খোসা ছাড়িয়ে থেতলে নিয়ে গরম তেলে দেয়। রসুন লাল হয়ে এলে পানি নিংড়ানো শাকটি কড়াইতে দেয় ও পরিমাণ মত লবণ দেয়। শাকটি ওলট পালট করে কিছু সময় পর শাকটি মজে আসলে চুলা থেকে নামিয়ে বাটিতে বাড়ে। শাক রাঁধার সময় কোন মরিচ দেয় না, কারণ খাওয়ার সময় তারা কাঁচা মরিচ বা শুকনা (পোড়ানো) মরিচ কামড়িয়ে খায়। এ পদ্ধতিকে লরা বলে।

রাই শাকের চান্নি: (সরিষা শাক) এ শাকের পাতা ধুয়ে দা দিয়ে গুড়া গুড়া (কুচি কুচি) করে কেটে, মরিচ, কাঁচা পিঁয়াজ ও ভাল তেল (সরিষার তেল) দিয়ে মাখায়।

ন্যাটাপেটা শাক ভাজি: এ শাক অন্যান্য শাকের সাথে মিলিয়ে রান্না করে। যেমন, শাকটাকে তুলে আনার পর ধোয়া ও তারপর গুড়া গুড়া করে কাটে।

ঝোল: শাক ধুয়ে গুড়া গুড়া করে কেটে রাখে। সীমের বিচি ভেজে খোসা ছাড়িয়ে ৫-১০ মিনিট পানিতে ভিজিয়ে রাখে ও বিচি কিছুক্ষণ ভেজার পর তার সাথে কেচা (কাঁচা) চিংড়ি মাছ একত্রে বাটিতে রাখে। কড়াইতে তেল দেয়। তেল গরম হলে হলুদ বাটা, মরিচ বাটা, পিঁয়াজ, রসুন দিয়ে মসলা ভুনা করে। এরপর চিংড়ি মাছ ও সীমের বিচির মিশ্রনটি কড়াইয়ের মধ্যে দেয় ও কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করার পর লবণ ও পরিমাণ মত পানি দিয়ে কড়াইয়ের মুখ ঢেকে দেয়। সীমের বিচি সিদ্ধ হলে পানি ঝড়ানো শাকটি কড়াইয়ে দেয়। শাক সিদ্ধ হলে তাতে চালের গুড়া একমুট পরিমাণ দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়ার পর থকথক হলে নামিয়ে ফেলে।

গিরমি তিতা: শাক তুলে ধুয়ে ছোট ছোট করে কাটে। কড়াইয়ে তেল গরম হলে মরিচ, রসুন, পিঁয়াজ, হলুদ, লবণ দিয়ে ৫/৭ মিনিট মসলা ভাজার পর ইচা মাছ ও সীমের বিচি ও গিরমি তিতা (গিমা শাক) শাক কড়াইয়ে দিয়ে ভালভাবে নাড়তে হয়। পরিমাণ মত পানি দিয়ে ২০-৩০ মিনিট জ্বাল দিতে হয়। শাক হয়ে আসলে নামিয়ে ফেলতে হয়।

বতুয়া শাক: শাক কেটে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রাখতে হয়। কড়াইতে তেল রসুন ও কাঁচা মরিচ/শুকনা মরিচ দেয়। রসুন ও মরিচ লালচে হয়ে এলে কড়াইয়ে শাকটি দেয় ও পরিমাণ মত লবণ দেয় ও নাড়া চাড়া করে। শাক মজে এলে ও পানি শুকিয়ে গেলে কড়াই নামিয়ে ফেলে ও বাটিতে বেড়ে পরিবেশন করে।

ঙ. শাক রান্নায় হলুদ, পিঁয়াজ ও তেলের ব্যবহার

শাক ভাজি করলে তাতে হলুদ ও মসলা দেয় না। কিন্তু শাক দিয়ে ছোট মাছ রান্না করলে তখন তাতে হলুদ ব্যবহার করে তরকারিতে রং দেখানোর জন্য। মাছের একটা গন্ধ আছে সে গন্ধকে পরিবর্তন বা কমানোর জন্য হলুদ ব্যবহার করে। হলুদ না দিলে মাছ হোক আর মাংস হোক দেখতে ভাল লাগে না। সাদা কেটকেটা দেখায় তা

খেতে রুচি আসবে না। তাইতো হলুদ দিয়ে রান্না করে খায়। তবে হলুদের আরও গুণ আছে। হলুদ ভাজা দিয়ে খেলে পেটের ব্যাথা, পেটের অসুখ ভাল হয়। আবার হলুদের বড়ি বানিয়ে পানি দিয়ে খেলেও পেটের ব্যথা ভাল হয়। আবার পাতলা পায়খানা বা আমাশয় হলে তখন হলুদ দিয়ে আওলা (আতপ চাল) চাল বেটে খোলায় চিতি (চিতই) পিঠা বানিয়ে খেলে পাতলা পায়খানা বা আমাশয় ভাল হয়ে যায়।

গরিব মানুষ ভর্তা খেলে অনেক সময় শুধু লবণ দিয়ে শাক ভর্তা করে খায়। পিঁয়াজ অনেক ঘরে সময় থাকে না। তখন পিঁয়াজ ছাড়াই খায়। আবার অন্যদের থেকে কর্জ বা চেয়েও খায়। পিঁয়াজ কখনও অর্ধেক খায় আবার একটাও খায়। তেল খুব কম খায়, ঘরে থাকলে কখনও কখনও তেল খায়।

বদরখালী এলাকায় শাক রান্নায় হলুদ, পিঁয়াজ ও তেলের ব্যবহার

বিভিন্ন ভাবে চান্নি তৈরী করা যায়, যেমন সিদ্ধ করে, কুটে। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলোঃ

১. শাক ইজানো চান্নি (ভর্তা)

গিমা শাক, সাজনা শাক (আবাদি), গিরমি তিতা শাক খলায় ভাংগি (কড়াইতে তেল ছাড়া ভাজা) চান্নি করে। শাক পরিস্কার করে ধুয়ে কড়াইতে তেল ছাড়া ভাজা হয়। শাক নামিয়ে ছোট ইচা মাছ (চিংড়ি) ভাজা হয়। ভাজা মাছ পাটায় আধা পিষা করে। পিঁয়াজ, মরিচ ২/১টি কেটে শাকের উপর রাখা হয়। চুলায় কড়াই দিয়ে করাই গরম হলে তেল দেওয়া হয়। তেল পাকলে (গরম হলে) রসুন ছেঁচা গরম তেলের মধ্য দিয়ে নারাচাড়া দিয়ে মাছ ও শাক এক সাথে কড়াইতে দিয়ে লবণ চেখে নামিয়ে ফেলা হয়।

শাক খোলায় গরম করে অথবা ভেজে এর সাথে মরিচ, রসুন, পিঁয়াজ, শুকনা ইচা (চিংড়ি) মাছ আলাদা ভেজে একত্রে পাটায় বেটে ভাল তেল (সরিষার) দিয়ে মেখে চান্নি করে। আবার অনেক সময় পাটায় না বেটে হাত দিয়ে হোচোডি (কচলিয়ে) চান্নি তৈরী করে।

যদি ইচা মাছ না থাকে তাহলে শুধু শাকটাকে খোলায় গরম করে কাঁচা পিঁয়াজ, শুকনা মরিচ ভাজা/কাঁচা মরিচ ছোট ছোট করে কেটে হাত দিয়ে প্রথমে পিঁয়াজ, মরিচ, লবণ হোচোডি (কচলিয়ে) একটু নরম করে, পরে ভাজা শাক মিশিয়ে ভাল করে মাখায়। যার ঘরে তেল আছে সে তেল দেয়, না থাকলে না দেয়। তবে গ্রামের গরিব পরিবারগুলো বেশীর ভাগই শাকটাকে খোলায় ভেজে শুধু লবণ ও মরিচ দিয়ে হাত দিয়ে হোচোডি (কচলিয়ে) চান্নি তৈরী করে খায়।

শাক কাঁচা চান্নিঃ থানকুনি শাক, রাই শাক (আবাদি) সাধারণত কাঁচা চান্নি করে খাওয়া হয়। শাক বেছে, হাত, দা কুলা পরিস্কার করে ধুয়ে গুরা গুরা (ছোট) করে কেটে, কাঁচা মরিচ গুরা গুরা করে কেটে, পিঁয়াজ কেটে মাখাবে। তেল থাকলে দিবে না থাকলে নাই।

তিতা নারিস (মেস্তা পাট) শাকের চান্নিঃ শাকটাকে ছোট ছোট করে কেটে সিদ্ধ করে তারপর কড়াইতে অল্প পিঁয়াজ কাটা, মরিচ কাটা তেলের মধ্যে দিয়ে নাড়া চাড়া দিয়ে পিঁয়াজ, মরিচ গরম হলে সিদ্ধ শাকগুলো কড়াইতে ঢেলে দিয়ে নাড়া চাড়া করে নামিয়ে ফেলে।

২. কুইট্যা/ঝুইল্ল্যা শাক রান্না

কয়েক ডইল্যা অর্থাৎ নানান রকমের শাক এক সাথে তুলে আনে। প্রথমে বাছা হয়। এরপর শাক ডোলায় করে নিয়ে পুকুরে বা টিউবওয়েলের পানিতে ভাল করে ধুয়ে আনে। এরপর হাত, শাক কাটার দা, ডোলা ভাল করে পানিতে ধুয়ে আনা হয়। দা দিয়ে শাক গুড়ি গুড়ি (ছোট ছোট) করে কাটা হয়। বেগুন, আলু ছোট ছোট করে কেটে শাকের উপর রাখা হয়। ফেলন বিচি, সীমের বিচি, চনার ডাল অল্প করে শাকের সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়। মরিচ কাটা সামান্য হলুদ বাটা, লবণ শাকের উপরে রাখা হয়। এরপর চুলায় আগুন জালিয়ে ডেকটি বা কড়াই চুলার উপরে দেওয়া হয়। পাত্র গরম হলে তেল দেওয়া হয়। তেল পাকিলে (গরম হলে) পিঁয়াজ থাকলে দিবে, না

থাকলে নাই। তবে রসুন ছেঁচে গরম তেলের মধ্য ছেড়ে দেওয়া হয়। রসুন লাল হয়ে আসলে শাক ডেকচির মধ্যে তেলে ছেড়ে দিবে। ডোয়া (বাঁশের কাঠি) দিয়ে লারি চারি ঢাকনা দিয়ে গুড়ি (ঢেকে) দেওয়া হয়। শাক হয়ে আসলে অল্প আতপ চাউলের গুড়া পানিতে গুলে শাকের উপর দিয়ে আবার নারি চারি গুড়ি দেওয়া হয়। চাউলের গুড়ি দেবার পর গড়গড়াই (ফুটে) উঠলে শাক নামিয়ে ফেলতে হবে। বর্ষার সময় এই শাক বেশী খাওয়া হয়। কারণ তখন কাঁচা ইচা মাছ, সীমের বীচি, ফেলন বীচি পাওয়া যায়।

যার ঘরে তেল, পিঁয়াজ নাই সেই সব পরিবার শাক তেলের মধ্যে না দিয়ে শাকের সাথে থাকলে আলু, বেগুন কাটা বা সীমের বিচি, ফেলন বিচি, ছোলার ডাল, সামান্য হলুদ বাটা, মরিচ বাটা (কাঁচা/শুকনা) লবণ একত্রে কড়াইতে দিয়ে চুলায় আগুনে জ্বাল দিতে থাকে। যখন সব কিছু সিদ্ধ হয়ে আসে ডোয়া (কাঠি) দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে একটার সাথে একটা মিশে যায়। তখন যার ঘরে রসুন আছে সে সামান্য রসুন ছেঁচা দিয়ে নাড়াচাড়া করে নামিয়ে ফেলে। যার ঘরে রসুন নাই সে রসুন দিবে না। তবে এই শাক রান্নায় খরচ বেশী যেমন - আলু, বেগুন, বিভিন্ন ধরণের বিচি, ইচা মাছ, আতপ চাউলের গুড়া ইত্যাদি দিতে হয়। তাই গরিব পরিবারগুলো এই শাক মাসে হয়তো ১/২ বার খায়।

৩. লরা শাক রান্না

অনেক সময় গরিব পরিবারগুলোর ঘরে তেল, রসুন থাকে না। তখন শাক শুধু লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে। আবার অনেকের ঘরে তেল নাই তবে রসুন আছে। তখন শাক সিদ্ধ হয়ে আসলে চুলা থেকে নামানোর আগে রসুন ছেঁচা দিয়ে নেড়ে চেড়ে নামিয়ে ফেলে। (যে শাক দা, বটি দিয়ে কাটে না হাত দিয়ে বড় বড় করে ছিড়া হয় সেই শাককে লরা শাক বলে।)

তুয়ায়ে পেটায়ে হলে নানান ডইল্যা (রকমের) শাক আর নিজেদের চাষের হলে কোন সময় এক ডইল্যা শাক দিয়ে রান্না করা হয়। যেমন - লাউ শাকের লরা, মিষ্টি কুমড়ার লরা, মূলা শাকের লরা ইত্যাদি। শাক তুলি আনি বাছি আঙ্গুলের ২ পাক সমান ভাংগি ধুয়ে আনা হয়। এরপর চুলায় ডেক্‌চি দিয়ে, ডেক্‌চি গরম হলে তেল দেওয়া হয়। তেল পাকি আসলে রসুন ছেঁচা তেলের মধ্য দিয়ে নারিচারি দেওয়া হয়। রসুন লাল হয়ে আসলে শাক লবণসহ তেলের মধ্য ঢেলে দেওয়া হয়। শাক লারিচারি বোরণা (ঢাকনি) দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। শাক হয়ে আসলে লবণ চেখে নামিয়ে ফেলে। এই শাক রান্নার সময় মরিচ দেওয়া হয় না। মরিচ শুকনা হলে আলাদা তেলে ভাজে। কাঁচা মরিচ হলে ভাজে না। ভাত দিয়ে শাক খাওয়ার সময় মরিচ কামড়িয়ে খাওয়া হয়।

৪. জুইত্যা শাক রান্না

সাধারণত ঘরে তেল না থাকলে জুইত্যা শাক রান্না করা হয়। যেমন শাক কুটি বাছি, ফেলন বিচি, সীমের বিচি, চনার ডাইল (ছোলার ডাল), আলু, বেগুন, কাচা মরিচ, সামান্য হলুদ বাটা শাকের সাথে মাখিয়ে একবারে পানি দিয়ে চুলায় দিয়ে জ্বাল দেওয়া হয়। আধা ইজিলে (সিদ্ধ হলে) লারিচারি দেওয়া হয়। এরপর শাক হয়ে আসলে আতপচাউলের গুড়ি পানিতে মিশিয়ে শাকের উপর দেওয়া হয়। আতপ চাউলের গুড়ি ঘরে না থাকলে দেয় না। তারপর শাক লারিচারি একেবারে হয়ে আসলে সুগন্ধির জন্য রসুন ছেঁচা দিয়ে আবার লারিচারি লবণ চেখে নামিয়ে ফেলা হয়।

৫. কচু শাক ঘাটা

শাক ধুয়ে এনে ছোট করে কেটে চুলার আগুনে ডেকচি চড়ায়ে শাক লবণ দিয়ে জ্বাল দিতে থাকে। শাক সিদ্ধ হয়ে গেলে ডোয়া (কাঠি) দিয়ে শাক ঘেটে নেয়। এরপর অল্প কাঁচা ছোট ইচা মাছ, শুকনা মরিচ ভেজে হাত দিয়ে গুড়া করা, কাঁচা মরিচ হলে পাটায় আধা পিশা, সামান্য হলুদ, অল্প জিরা বাটা, ধনিয়া ভেজে পাটায় গুড়া করা, তেজপাতা, যে কোন টক (আম, তেঁতুল, জলপাই) সব একত্রে দিয়ে ১০-১৫ মিনিট নাড়তে হবে। মসলা শাকের সাথে মিশে গেলে শাক ডেক্‌চি থেকে অন্য একটা পাত্রে ঢেলে রাখে। এরপর ডেক্‌চি ধুয়ে আবার চুলায় দেয়।

ডেক্‌চি গরম হলে তেল ঢেলে দেয়। তেল গরম হলে রসুন ছেঁচা দিয়ে নাড়তে থাকে। রসুন বাদামী রংয়ের হয়ে আসলে শাক ডেক্‌চিতে ঢেলে দিয়ে আবার ৪-৫ মিনিট আগুনের তাপে রেখে নামিয়ে ফেলে। এ ধরণের রান্না সাধারণত একটু স্বচ্ছল ও ধনী পরিবারগুলো করে। তবে গ্রামে গরিব পরিবারগুলোর রান্নার ধরণ অন্য রকম। যেমন - শাক ধুয়ে এনে ছোট করে কেটে লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে। সিদ্ধ হয়ে গেলে শাক লারিচারি ঘেটে ফেলে। এরপর শুকনা মরিচ ভেজে গুড়া করা, বা কাঁচা মরিচ আধা পিশা, যে কোন টক (আম, তেঁতুর, জলপাই) একত্রে শাকের মধ্যে দিয়ে ৫ - ৭ মিনিট নেড়ে চেড়ে রসুন না থাকলে নামিয়ে ফেলে। আর যার ঘরে রসুন আছে সে সামান্য রসুন ছেঁচা দিয়ে আবার ৩ - ৪ মিনিট নেড়েচেড়ে নামিয়ে ফেলে।

চ. শাক রান্নায় ব্যবহৃত মসলার ফিরিস্তি

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে, শাক রান্নায় হলুদ ব্যবহার হয় না। অন্যান্য মসলা ব্যবহারে ধনী গরিবের মধ্যে পার্থক্য থাকে।

ধনী পরিবারের রান্নায় শাক সবজিতে মরিচ, লবণ, পিঁয়াজ, রসুন ও তেল ব্যবহার করা হয়।

গরিবের রান্নায় মসলার ব্যবহার খুবই কম হয়। কারণ মসলা কেনার সামর্থ তাঁদের নেই। ফলে রান্না সেইভাবেই হয়। ভর্তা করলে হাতে চটকিয়ে শুধুমাত্র লবণ দিয়ে খায়। কখনও পিঁয়াজ দেয়া হয় কখনো পিঁয়াজ ছাড়াই ভর্তা করে। তেল খুব কম ব্যবহার হয়।

গরিবদের রান্না চড়চড়িঃ হলুদ বাটা, মরিচ বাটা, (চড়চড়িতে কাঁচা মরিচ খায়) পিঁয়াজ ছোট হলে ১টি, বড় হলে অর্ধেক কেটে দেয়। সামান্য খাস (সরিষা) তেল দিয়ে, আবার তেল না থাকলে ঘরে ভেন্না বা সরিষা থাকলে বেটে দেয়। এটা তেলের কাজ করে।

গ্রামের ধনীদের রান্নাঃ হলুদ বাটা, মরিচ বাটা বা কাটা, পিঁয়াজ বাটা বেশী পরিমাণ, জিরা বাটা, মিঠা হজ, ধনিয়া, রান্ধুনী একত্রে বাটা, তেল (সরিষা) পরিমাণমত দিয়ে রান্না করে।

মিঠাহজ (মৌড়ি), ধনিয়া, রান্ধুনী মাটির খোলায় ভেজে একত্রে করে কাঁচের বোতলে রেখে দেয়। সেখান থেকে রান্নার জন্য এনে বেটে নেয়।

গরিবদের রান্না শাক পিটালুঃ হলুদ বাটা, মরিচ (শুকনা/কাঁচা) কাটা বা বাটা, পিঁয়াজ ছোট হলে ১টি, বড় হলে অর্ধেক, রসুন ২/৩ কোষ, সরিষার তেল সামান্য দিয়ে রান্না করে।

গ্রামের ধনীদের রান্নাঃ হলুদ বাটা, মরিচ (শুকনা/কাঁচা) কাটা বা বাটা, পিঁয়াজের পরিমাণ বেশী, জিরা বাটা, মিঠা হজ/ধনিয়া, রান্ধুনী একত্রে বাটা, তেল পরিমাণ মত দিয়ে রান্না করে।

শাক ঘন্ট

টাঙ্গাইল ও ঈশ্বরদী শাক ঘন্ট রান্না

১. কচু শাক ঘন্ট

কচু শাক তুলে এনে ভালভাবে ধুয়ে চালায় রেখে কেটে ডুম (ছোট ছোট) করে পাতিলে রাখে। পাতিল চুলায় দিয়ে জ্বাল দিতে হয়। তার সাথে লবণ ছিটিয়ে দেয়। কচু শাক সিদ্ধ হলে নাকড় বা ফালটা দিয়ে নাড়তে নাড়তে শাক আঠা আঠা হয়ে আসলে শাক নামিয়ে পাতিলে একটা রসুন ছেঁচা, শুকনা মরিচ ছিড়ে দিয়ে সাথে তেল দিয়ে ভাজা হয়। ভাজা হলে আঠা আঠা হয়ে যাওয়া শাক পাতিলে দিয়ে ভালভাবে নেড়ে নামিয়ে ফেলে। এটাকে ঘন্ট বলে। আবার কচু শাক ইলিশ মাছের মাথা ও চিংড়ি মাছ দিয়েও খাওয়া হয়।

কচু শাক কেটে এনে ধুয়ে চালায় রাখে। চালার থেকে শাক কেটে পাতিলে রেখে লবণ ছিটা দিয়ে পাতিলে জ্বাল দিয়ে এক ভাপ হলে শাকটা চালায় ঢেলে রেখে পাতিলে তেল, রসুন ছেঁচা, পিঁয়াজ কাটা দিয়ে একটু ভাজা

হলে তাতে চিংড়ি মাছ বা ইলিশ মাছের মাথাটা ভেঙ্গে পাতিলে ভেজে তার মধ্যে মসলা, জিরা, আদা, ধনিয়া, রান্ধুনি, মিষ্টি সজ এসব থাকলে তা বেটে দিয়ে মাছ কসিয়ে তাতে একটু পানি দিয়ে আবার কসিয়ে তার মধ্যে চালার সিদ্ধ শাক দিয়ে নাড়তে থাকে। শাক গলে আসলে পাতিল নামিয়ে ফেলে। এটাকে মাছের সাথে কচু শাক ঘন্ট বলে।

২. বতুয়া শাক ঘন্ট

বতুয়া শাক ভাল ভাবে তিনটা ধোয়া দিয়ে পাতিলে দিয়ে চুলায় জ্বাল দেয়। তার মধ্যে আন্দাজ মত লবণ ছিটা, সাথে কাঁচা মরিচও দিবে। শাক সিদ্ধ হয়ে আসলে নাড়তে নাড়তে শাক আঠা আঠা হয়ে যাবে। তখন শাক রেখে কড়াই বা পাতিলে রসুন ছেঁচা ও পিঁয়াজ কাটা, তার সাথে তেল দিয়ে ভাজা হয়। ভাজার সময় শুকনা মরিচ চারটা ভেজে রেখে ভাজা তেল পিঁয়াজের সাথে আঠা আঠা ঢেলে রাখা শাক পাতিলে দিয়ে নাড়া চাড়া করে নামিয়ে ফেলে। এটাকে বতুয়া শাকের ঘন্ট রান্না বলে। শাক নাকড় দিয়ে নাড়ার সময় একটু চালের আটা পানিতে গুলিয়ে তা শাকের সাথে দিয়ে নাড়তে থাকে। চালের গুড়া না থাকলে ভাতের মারও দেওয়া হয়।

৩. বার ভানজানো (কয়েক রকমের শাক) শাক ঘন্ট

বার ভান্‌জানো শাক একসাথে তুলে এনে ভাল ভাবে ধুয়ে চুলায় জ্বাল দিয়ে শাক সিদ্ধ করা হয়। সিদ্ধ করার সময় লবণ ও কাঁচা মরিচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে শাক আঠা আঠা হয়ে আসলে তার মধ্যে চালের আটা অল্প পানিতে গুলিয়ে দেয়। চালের আটা না থাকলে ভাতের মারও দেওয়া হয়। এতে শাকটা আরও আঠা আঠা হবে। পাতিলে তেল দিয়ে ৭/৮টা শুকনা মরিচ ভেজে রেখে ঐ পাতিলে রসুন ছেঁচা ও পিঁয়াজ কাটা দিয়ে ভেজে তার মধ্যে ঘাটা শাক দিয়ে ভালভাবে নেড়ে নামিয়ে ফেলে। এটাকেও ঘন্ট রান্না বলে।

ঈশ্বরদীতে তিন ধরণের শাক রান্না

১. শাক ভর্তা: ঈশ্বরদী এলাকা যে সমস্ত শাকের ভর্তা খায় সেই শাকগুলি তুলে এনে ভাল করে বাছাই করে ধুয়ে একটা বল বা পাতিলে রাখে। রসুন, পিঁয়াজ, কাঁচা মরিচ, খোলায় টালে, তেল ছাড়া। টালা হলে নামিয়ে রাখে। ঐ খোলায় শাকগুলি দিয়ে তার মধ্যে হালকা লবণের ছিটা দিয়ে ঢেকে দিয়ে জ্বাল দেয়। ৩/৫ মিনিটের মধ্যে ঢাকনা খুলে দিয়ে বাঁশের নাকড় বা ফানর্চা দিয়ে নড়াচাড়া করে। সিদ্ধ হলে নামিয়ে পাটায় বেটে ভর্তা করে সামান্য সরিষার তেল দিয়ে মাখিয়ে দলা করে বাটিতে তুলে রাখেন।

২. লরা: লরা শাক রান্নার ঠিক আগে তুলে এনে উঠান, বারান্দা ও রান্না ঘরে বসে বাছে। লরা শাক কখনও বটি দিয়ে কাটে না। হাত দিয়ে ছিরে আঙ্গুলের মতো লম্বা করে। তারপর শাকগুলি বল বা পাতিলে করে ৩/৪টি ধুয়া দিয়ে চালনা ঝরান দিয়ে ভাত, তরকারি রান্নার শেষে শাক রান্না করে। গ্রামের রেওয়াজ এবং মুরুব্বীরা বলেন ভাত রান্নার আগে কখনও শাক পাতা রান্না করবে না। কারণ শাক পাতা হলো লক্ষ্মী। শাকের কড়াই চুলায় দিয়ে শাকের উপর হালকা লবণের ছিটা দিয়ে ঢেকে দিয়ে হালকা ভাবে চুলা জ্বলতে থাকে। এই সময়ে রান্না ভাত, তরকারী ঘরে নেয়। আর এ সময়ের মধ্যে শাক সিদ্ধ হয়ে যায়। তখন বাঁশের চিকন ফালটা দিয়ে খুটিয়ে খুটিয়ে নাড়াচাড়া করে শাকের পানি কটকটা করে শুকিয়ে নামিয়ে ফেলে। আগেই পিঁয়াজ, রসুন, কাঁচা মরিচ কেটে রাখা হয়। এরপর কড়াই চুলায় বসিয়ে দিয়ে জ্বাল দেওয়া হয়। কড়াই গরম হলে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দেয়। ঐ তেলের মধ্যে ৫/৭টা শুকনা মরিচ দিয়ে লাল করে ভেজে নামায়। আর এ তেলের মধ্যে কাটা পিঁয়াজ, রসুন, মরিচ দিয়ে নাড়াচাড়া করে। রং বাদামী হলে নামানো শাকগুলি ছেড়ে দিয়ে নাড়াচাড়া করে। তেলে শাক ছাড়ার সাথে সাথে ছুন করে শব্দ করে। যে পর্যন্ত ছুনছুন শব্দ আছে বুঝা যায় তখন তার মানে শাকে পানি আছে। ছুনছুন শব্দ বন্ধ হওয়ার পর শাক নামিয়ে ফেলে।

৩. যে শাক পিঠানু রান্না করা হবে সেই শাকগুলি তুলে এনে ভাল করে বাছাই করে ধুয়ে নিয়ে চালনায় ঝরান দিয়ে রাখা হয় কিছু সময়। পানি ঝরা হলে বটি দিয়ে কুচিকুচি করে কাটা হয়। তারপর যে পাতিলে পিটানু রান্না

করা হবে সেই পাতিলটি চুলায় বসিয়ে জ্বাল দিয়ে পাতিলটি গরম করা হয়। গরম পাতিলে তেল, পিঁয়াজ, রসুন, কাঁচা মরিচ, লবণ সামান্য হলুদ বাটা দিয়ে নাড়াচাড়া করন। যদি কোন মাছ দেওয়া হয় তবে মসলা কসান হলে মাছ ছেড়ে দিয়ে ভাল করতে হয় কসিয়ে নিয়ে তার মধ্যে শাকগুলি ছেড়ে দিয়ে নাড়াচাড়া করে ঢেকে দিতে হবে। শাক সিদ্ধ হলে অল্প চালের গুড়া পাতলা করে গুলে সিদ্ধ শাকের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে তারাতারি নাড়াচাড়া করতে হবে তা না হলে পিটানু শাক পাতিলের নীচে পুড়ে যাবে। এর মধ্যে লবণ দেখে পিঠানু শাক নামাতে হবে।

৪. পলা শাক রান্নাঃ পিঠানু শাকের রান্নার নিয়মেই রান্না হয়। তবে পলা শাকে মাছ এবং চালের গুড়া দেওয়া হয় না।

শাক রান্নায় ধনী-গরীব পার্থক্য

আমরা গবেষণায় এটা পরিস্কার বুঝেছি শাক রান্নার মূল ধরণটা গরীবের রান্নার মধ্যেই আছে কারণ তারাই আসলে শাক সত্যিকারের খাদ্য হিশাবে খায়। ভাতের পর শাকই ভরসা। ফলে শাককে কতভাবে অল্প খরচে খাওয়ার উপযোগী করা যায় যাতে ভাতগুলো খেতে পারে তারই চেষ্টা থাকে। এটা ঠিক অনেক সময় তাঁরা রান্নার কারণে পুষ্টি নষ্ট হচ্ছে কি না সে ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক নন, ফলে শাক সিদ্ধ হবার পর পানিটা ফেলে দেয়া ইত্যাদি আমরা দেখি। তা সত্ত্বেও ধনীরা শাকের মধ্যে নানা রকম মসলা ব্যবহার করে পুষ্টির ক্ষতি করছে কি না সেটাও বিবেচনার বিষয়। আর পুষ্টির দিক থেকে সেভাবে তুলনা না করলেও ধনী-গরিব ভেদে রান্নার ধরণের পার্থক্য নিয়ে তথ্য নেয়া হয়েছে।

বদরখালী

১. শাক ইজানো চান্নি (শাক সিদ্ধ ভর্তা)

গরীবদের রান্নাঃ (ক) কাঁচা পিঁয়াজ একটা বা একটার অর্ধেক শুকনা মরিচ বা কাঁচা মরিচ বেশ কয়েকটি, সামান্য সরিষার তেল, লবণ এবং (খ) বেশী গরীব যারাঃ লবণ শুকনা মরিচ বা কাঁচা মরিচ বেশ কয়েকটি।

ধনীদের রান্নাঃ পিঁয়াজ একটা বা দুইটা, শুকনা মরিচ বা কাঁচা মরিচ বেশ কয়েকটি পরিমাণ মত সরিষার তেল, লবণ।

২. কুইট্যা শাক বা জুইল্যা শাক

গরীবদের রান্নাঃ (ক) সামান্য হলুদ বাটা, শুকনা বা কাঁচা মরিচ বাটা, পিঁয়াজ একটার অর্ধেক, সামান্য বাদাম তেল, রসুন ২/৩ কোয়া।

বেশী গরীব যারাঃ সামান্য হলুদ বাটা, শুকনা বা কাঁচা মরিচ বাটা।

ধনীদের রান্নাঃ হলুদ বাটা, শুকনা বা কাঁচা মরিচ বাটা, পরিমাণ মত বাদাম তেল বা সরিষার তেল, লবণ পিঁয়াজ ২/৩টা রসুন মাঝারি সাইজের ১টা।

সিদ্ধ করে রান্না শাকের মধ্যে মসলার ব্যবহার খুবই কম। তাই ধনী-গরিবের রান্নার মধ্যে তেলের ব্যবহার ছাড়া পিঁয়াজ, রসুন ও মরিচের ব্যবহারে খুব পার্থক্য নেই। তবে ধনীরা শুধু শাক দিয়ে ভাত খায় না, অন্যান্য অনেক তরকারি থাকে, তার মধ্যে শাক একটি। কিন্তু গরিবদের মধ্যে এমনও হতে পারে শুধু শাক দিয়েই ভাত খাওয়া হচ্ছে। অন্য তরকারি না থাকলে শাকের মধ্যে মরিচের ব্যবহার বেশী হয়। তাতে ভাত বেশী খাওয়া যায়।

৩. লরা শাক রান্না

গরিবদের রান্নাঃ (ক) লবণ, পিঁয়াজ একটার অর্ধেক, রসুন ১/২ কোয়া। বাদাম তেল খুবই অল্প পরিমাণ। (খ) লবণ (যার ঘরে পিঁয়াজ, রসুন, তেল নাই সে শুধু লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে)।

৪. জুইত্যা শাক

গরীবদের রান্না: (ক) শুকনা মরিচ বা কাঁচা মরিচ, একটার অর্ধেক পিঁয়াজ, ১/২ কোয়া রসুন, লবণ, সামান্য হলুদ বাটা। (খ) বেশী গরীব যারা: শুকনা মরিচ বা কাঁচা মরিচ, সামান্য হলুদ বাটা, লবণ।

ধনীদের রান্না: শুকনা মরিচ বা কাঁচা মরিচ, ১/২টা পিঁয়াজ, রসুন ছোট একটা, লবণ।

৫. কচু শাকের ঘন্ট

গরীবদের রান্না: (ক) শুকনা মরিচ ভেজে গুড়া করা, কাঁচা মরিচ আধা পিষা, ধনিয়া ভেজে গুড়া করা, রসুন ২/৩ কোয়া, লবণ।

(খ) বেশী গরীব যারা: শুকনা মরিচ ভেজে গুড়া করা কাঁচা মরিচ আধা পিষা, লবণ, রসুন ঘরে থাকলে ১/২ কোয়া। রসুন না থাকলে দিবে না।

ধনীদের রান্না: শুকনা মরিচ ভেজে গুড়া করা, কাঁচা মরিচ হলে আধা পিষা, সামান্য হলুদ, অল্প জিরা বাটা, ধনিয়া ভেজে গুড়া করা, তেজপাতা, বাদাম তেল বা সরিষার তেল পরিমাণ মত। রসুন পরিমাণ মত।

বদরখালী, ঈশ্বরদী, টাঙ্গাইল। তিনটি এলাকায় শাক রান্নায় একই ধরণের মসলা ব্যবহার করা হলেও বদরখালী এলাকায় কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। যেমন বদরখালীতে শাক রান্নার সময় কখনও মরিচ ব্যবহার করা হয় না, পরে মরিচ কামড় দিয়ে খায়। টাঙ্গাইল ও ঈশ্বরদীতে শাক রান্নার সময় কাঁচা মরিচ কেটে দেয়া হয়। শুকনা মরিচ খেলে আলাদা ভেজে রাখা হয়, পরে ভাত খাওয়ার সময় মরিচ কামড় দিয়ে খায়। তিনটি এলাকায়ই শাক রান্নায় লবণ, পিঁয়াজ ও রসুন ব্যবহার করা হয়। শুধু বদরখালীতে মরিচ ব্যবহারের পার্থক্য রয়েছে।

সব এলাকায়ই ধনী গরীবের মধ্যে মসলার ব্যবহারের পার্থক্য রয়েছে। ধনীরা পিঁয়াজ, তেল, রসুন বেশী ব্যবহার করে, গরিবরা কম ব্যবহার করে।

বদরখালী এলাকায় একটি নতুন তথ্য পাওয়া গেল। যখন ঘরে কোন তেল থাকে না তখন বদরখালী এলাকায় একটি তরকারী রান্না হয় জুইত্যা শাক হিসেবে। জুইত্যা বলতে এখানে হাতে মাখিয়ে পানি দিয়ে রান্না বোঝায়। এতে তেল কম লাগে বা না দিলেও চলে। জুইত্যা শাকের মধ্যে সীমের বিচি, চনার ডাইল, আলু, বেগুন, কাঁচা মরিচ ও হলুদ বাটা শাকের সাথে মাখিয়ে একবারে পানি দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে জ্বাল দিয়ে এই শাক রান্না করা হয়। ঈশ্বরদী এলাকায় কলার মোচার বড়া করলে তাতে আদা ব্যবহার করা হয়।

রান্নার মধ্যে বেশী মশলা ব্যবহার করে টাঙ্গাইল এলাকায়। যেমন রাধুনী সজ, মিষ্টি সজ, ধনিয়া, তেজপাতা এটা কলমি শাকে ব্যবহার করে, তবে যখন শাক ভাজি করবে তখন মসলা ব্যবহার করা হয় না।

ছ. রান্না বর্ণনায় শব্দের ব্যবহার

শাক রান্না বর্ণনায় এলাকার নিজস্ব ভাষার ভঙ্গিতে অনেক শব্দ আসে যা বাংলায় শুদ্ধভাবে বর্ণনা না করলে ভালভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় না। তাই এখানে আমরা রান্নার বর্ণনার কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। কিন্তু একই সাথে বিভিন্ন সময়ে গ্রামের মহিলাদের সাথে কথা বলতে গিয়ে রান্নার যে শব্দগুলো আমরা টুকে নিয়েছি তার একটি তালিকা দিচ্ছি।

উদাহরণ: টাঙ্গাইল এলাকার বর্ণনা: বতুয়া ঘন্ট রান্না - বতুয়া শাক তুলে বেছে ধুয়ে পাতিলে দিয়ে তার মধ্যে লবণ কাঁচা মরিচ কেটে দিয়ে পাতিল আইশালে চুলায় দিয়ে বাঁশের ফালটা (নাকুর) দিয়ে শাক নাড়তে থাকে। শাক ধোয়ার সময় শাকের মধ্যে যে পানি থাকে সেই পানিতে শাক সিদ্ধ হয়ে গাঢ়গলা হয়ে আসলে তখন শাক পাতিলে এক পাশে রেখে পিঁয়াজ কেটে রসুন ছেইচা পাতিলে দিয়ে তেল দিয়ে বাগার দিয়ে নেড়ে চেড়ে শাক গলে ঘন্ট হয়ে যায় তখন শাক নামিয়ে ফেলে। ঘন্ট রান্না শেষ হয়ে যায়।

কচু ঘন্ট: কচু শাক তুলে কেটে ধুয়ে পাতিলে দেয়। তার সাথে শাক সিদ্ধ হওয়ার জন্য অল্প করে পানি দেয়। পাতিল আইশালে চুলায় দিয়ে জ্বাল দেয়ার পর শাক সিদ্ধ হয়ে আসলে বাঁশের ফালটা দিয়ে নাড়তে থাকে এর

মধ্যে কাঁচা মরিচ কেটে দেয়। শাক সিদ্ধ হয়ে গেলে, শাক তুলে রেখে পাতিলে পিঁয়াজ কেটে, রসুন ছেইচা দিয়ে তেল দিয়ে পিঁয়াজ রসুন ভাজা হলে কচুর শাক দিয়ে নাড়তে থাকে। এভাবে কিছুক্ষণ নেড়ে শাকের সাথে পিঁয়াজ রসুন মিশে গেলে ঘন্ট রান্না হয়ে যায়। তখন পাতিল নামিয়ে ফেলে।

তিনটি গবেষণা এলাকায় বিভিন্ন শাকের রান্নার বর্ণনা থেকে পাওয়া শব্দের একটি তালিকা আমরা এখানে তুলে ধরছি:

টাঙ্গাইল থেকে পাওয়া শব্দ

গেজ গেজাইয়া কাটা, সম্ভাব, খইচা ধোয়া, ছেইচা, শাক তুলা, কুটা, বাছা, ধোয়া, নাড়া, হিদ্ধ করা, জ্বাল দেয়া, বাগার দেয়া, ঢাকা, ঘন ঘন নাড়া, আধা হিদ্ধ, আস্তে আস্তে জ্বাল দেয়া, চটকিয়ে, কচলিয়ে, কুচি কুচি, নাড়তে নাড়তে, ঘন আঠালো, ফিরি বান্দে, ভাপে, হালকা, ডলে, গলে, গলগলা, মিশিয়ে, পানি ঝরিয়ে, আলাদা, ভাল করে, আঠা আঠা, অল্প, মাখিয়ে, কসিয়ে, ঝোল, আন্দাজ মতো, নামিয়ে, ভিজা ভিজা, রসা রসা, সাদা ফেটফেটা, উল্টিয়ে, হাতের আনজুল, আইসটা গন্ধ, চেপ চেপা, দু চৌইল। রস রসা, চড়চড়া, শুকনা শুকনা, অল্প ঝোলে, হালকা ভেজে, আন্তাজ মতো ঝোল, বলক উঠলে, ঘন হয়ে ওঠা, গলে গেলে, বাদামী রং, ঝরঝরা, মচমচে, লালচে রং, রং সুন্দর, ঢেলঢেলা।

ঈশ্বরদী থেকে পাওয়া শব্দ

রান্না করতে গিয়ে বিভিন্ন স্তর বোঝার জন্যে বর্ণনা: ১. কুড়িয়ে আনা, ২. কুটা বাছা, ৩. ধোয়া, ৪. মসলা একত্র করা, ৫. চুলায় দেওয়া, ৬. ঢেকে রাখা, ৭. চেখে দেখা, ৯. দাগানী (বাঘার দেয়া), ১০. নামানো।

রান্নার অবস্থা বোঝার জন্য ব্যবহৃত শব্দ: ছ্যান, ছুন ছুন, লালটা লালটা, আঠা আঠা, ঝরঝরা, পানি শুকালে, নেথা, ল্যাটকা (নরম), ছেন্‌নাৎ করা, ছেৎ করে দেয়া। ছরছর, খইচা খাইচা, কচকচ, খচখচ, পানি ঝরা, শাক পলা, শাক খুইটা খাইটা, শাক আছাড় দেয়া, কুইটা কাইটা, বাইছা, চিকন চিকন, বাদামী রং, মজে আসলে থকথকে, সিদ্ধ হলে, লালচে হয়ে এলে, শুকিয়ে আসলে।

এছাড়াও ঈশ্বরদী এলাকার রান্নার কথায় যেসব শব্দ পেয়েছি: বেছে, ঢেকে দেওয়া, ছেচা, নাড়াচাড়া, ভাজি, ঝরান, ধোয়া, চড়চড়ি, কুটে, কসিয়ে, আস্তে আস্তে, জোল, নরাশাক, কুটি কুটি, ছিড়ে, চিটা, কিছুক্ষণ, পলে, পরিমাণ মত, রং, পরিস্কার, সাইজ, মেখে, মচমচা, উল্টিয়ে উল্টিয়ে বেটে, আমান আমান, পলে।

বদরখালী থেকে পাওয়া শব্দ

তেল পাকিলে, আধা ইজিলে, খুসবো, ওডের, বাস ওডের, সুগন্ধি লাগের, রসুন লাল মিক্কা হলে, মজি আইলে, গডগডাইয়া উঠিলে, পুড়ি যাইলে, জুইল্যা জুইল্যা থাকিলে, ফোয়াই গেলে। গুড়া গুড়া করে কুটা, কুটি বাছি, খলায় ভাংগি, লারিচারি, চিওন চিওন করে কুড়া, শাককিন, গুরি দেয়া, শাক ফোয়াদ দেয়া, নুন চাওয়া, ফানি জরি গিয়ে, ফানি চিবি ফেলা, তালেত দেয়া, হোচডি, মাখি ফেলা। বাছা, ঝরাতে, থেতলে, কামড়িয়ে, ডইল্যা, গুড়িদের আলাদা আলাদা, মেখে, মিশ্র, নামাইয়া, নাড়তে। তেল পাকি ছিড়ে, ওলটপালট, লরা, চানি, গুড়াগুড়া, মাখায়, আঠাইজিলি ন্যাটাপেটা, মিলিয়ে, তুলে আনা, কিচুক্ষণ, পরিমাণমত, ইকমুঠ পরিমাণ, ছোট ছোট, আঙ্গুলের দাগের সমান বাটি, সুগন্ধি মজিলে।

জ. রান্নার জন্যে ব্যবহৃত সরঞ্জাম

টাঙ্গাইল

১. বটি, ২. কাঠি, ৩. কড়াই, ৪. ডেকটি, ৫. জাবা খড়ি, ৬. শিলপাটা, ৭. খোলা, ৮. মাটির খোরা, ৯. পাতিল, ১০. কাঁচি, ১১. দা, ১২. খুন্তি, ১৩. নাকুর, ১৪. ডাবুর, ১৫. চুলা, ১৬. আইশাল, ১৭. ডাল ঘুটনি, ১৮.

কুলা, ১৯. বাঁশের ফালটা/খাপাসি, ২০. বাঁশের চালা, ২১. মাটির ডোকশা/খাদা/মালশা, ২২. মিলবরের (সিলভারের) ডিস, ২৩. চালুন, ২৪. ধামা।

ঈশ্বরদী

১. কড়াই, ২. লোহার খন্তি, ৩. হাতা, ৪. ডালি, ৫. ঝুড়ি, ৬. থালা, ৭. গামলা, ৮. বটি, ৯. ঢাকনা, ১০. বাটি, ১১. পাটা, ১২. নোড়া - শিল পাটা, ১৩. খড়ি জাবা, ১৪. লোহার ছল্লি, ১৫. ছুলনি, ১৬. পাইটি দিয়ে ধরা, ১৭. পাতিরে ফেসি দেয়া, ১৮. ওরং লাকুর, ১৯. ঢোকশা, ২০. সাড়া (ঢাকনা), ২১. সরপোস, ২২. ডেসকি, ২৩. মাটির ঢোকসা, ২৪. চালনা, ২৫. কড়াই, ২৬. ঢাকনা, ২৭. সিলভারের বড় বালতি, ২৮. কাটখোলা, ২৯. চুলা।

বদরখালী

১. চোলের বাইর, ২. বাঁশের ডোলা, ৩. কুলা, ৪. চারোন, ৫. ফেন্নুয়া ৬. দা, ৭. ডোওয়া, ৮. ডেস্‌কি, ৯. কড়াইয়া, ১০. বরুণা/ডাহনি, ১১. কোটারা, ১২. চামিচ, ১৩. পাটা উতা, ১৪. দারগোয়া (জ্বালানী), ১৫. কড়াই, ১৬. পাটা, ১৮. চুলা, ১৯. ঢাকনা, ২০. বসের ডালা।

টাঙ্গাইলে ২৬টি, ঈশ্বরদীতে ২৮ ও বদরখালিতে ২০টি নানা ধরণের সরঞ্জামের নাম এসেছে শুধু শাক রান্নায়। অবশ্য এর মধ্যে শাক তোলার সরঞ্জাম থেকে শুরু করে রান্না এবং শেষ পর্যন্ত বাটিতে পরিবেশন পর্যন্ত ব্যবহার সব ধরণের সরঞ্জামের কথাই আছে। খেয়াল করলে দেখা যাবে সরঞ্জামের মধ্যে শাক তোলার সরঞ্জাম, প্রায় ক্ষেত্রেই বাঁশের ডোলা, কুলা ব্যবহার হয়। অনেক সময় কাছাকাছি জায়গা থেকে শাক তুলতে গেলে সরাসরি সিলভারের বা এ্যালমিনিয়ামের গামলাও নিয়ে যায়। আজকাল প্লাস্টিকের গামলা ব্যবহার করতেও দেখা যায়। শাক তোলার পরের সরঞ্জাম কাটার জন্যে দা বা বটি লাগে। তবে সব শাকে লাগে না। অনেক শাক হাতেই কুটে নেয়া হয়। তৃতীয় স্তরটি গুরুত্বপূর্ণ। শাক রান্নার মধ্যে সবচেয়ে খেয়াল করার বিষয়টি হচ্ছে ধোয়া। শাক পরিস্কার করে ধোয়া শাক রান্নার জন্যে খুবই জরুরী। শাক তিনবার ধোবে না পাঁচবার ধোবে, যিনি রান্না করেন তিনি নিজেই ভাল করে বোঝেন। এই সময় গামলার ব্যবহার হয়। দুটো গামলা বা একটি গামলা এবং অন্যটি রান্নার কড়াইতে এক পানি থেকে আরেক পানিতে নেয়া হয়। তারপর রান্নার পালা। এই সময় কয়েকটি বিভিন্ন ধরণের সরঞ্জাম ব্যবহার হয়। প্রথমে কড়াই বা ডেকচি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সিলভারের। তারপর নাড়বার জন্যে চামচ বা কাঠি। মহিলারা বাঁশের কাঠি দিয়ে শাক নাড়তে পছন্দ করেন। শাক সিদ্ধ হয় এলে ঢাকনা দিতে হয়। এই ঢাকনা মাটির হতে পারে কিংবা সিলভারের হতে পারে। শাকে রসুনের ব্যবহার আছে বলেই আমরা পাটার ব্যবহারও দেখছি। রসুন ছেচা দিলে বাগার দিতে গেলে সুগন্ধ বের হয়। সবশেষে, রান্না হয়ে গেলে বাটিতে ঢেলে রাখা হয়।

যদিও শাক রান্না খুব সহজ এবং সবচেয়ে কম খরচের বিষয় তবুও এতো ধরণের সরঞ্জাম ব্যবহার আমরা আশা করি না কিন্তু তথ্য নিতে গিয়ে দেখা গেলো শাকের রান্নায় সরঞ্জাম যথেষ্ট রয়েছে। মহিলারা শাক রান্নায় স্থানীয় সরঞ্জাম ব্যবহার করতে চান। যেমন বাঁশের ঝুকি, বাঁশের কাটি, মাটির ঢাকনা, মাটির ডেকচি ইত্যাদি।

ঠ. শাক রান্না এবং মিশানো

শাক এককভাবে কিংবা মিশিয়ে রান্না করা হয়। এগুলো প্রথমত শাক বেশী বা কম পাওয়ার কারণে করা হয়। কিন্তু অনেক সময়ই কয়েক ধরণের শাক মিশিয়ে রান্না করলে খেতে ভাল লাগে বলেও করা হয়। কখনও কখনও একটি শাককে প্রধান শাক ধরে নিয়ে অন্য শাক মেশানো হয়। নিম্নে এর কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হোল:

তিনটি গবেষণা এলাকায় একটি প্রধান শাকের সাথে অন্য শাক মিশানোর অনেক উদাহরণ আছে। একটি শাকের সাথে অন্য পাঁচ ছয়টি শাকও ব্যবহার হচ্ছে। বদরখালিতে একটি শাকের সাথে ২/৩টির বেশী শাক মিশানোর উদাহরণ কম পাওয়া গেছে।

একত্রে রান্না করা শাক ও তিতামিঠা শাকের বিষয়

কেউ একত্রে নানা ধরণের শাক মিশাতে চাইলেও পারবেন না। কোন্ শাকের সাথে কোন্ শাক মিশানো যায় সেটা নির্ভর করে সেই শাকের স্বাদের ধরণের ওপর। যেমন তিতা শাক, মিঠা শাক বা পানসা শাক। নোনতা শাকও আছে। শুধু তিতা, মিঠা মিশানোর জ্ঞান থাকলেও হবে না, শাকের খাদ্য ও ওষুধিগুণের কথা ভেবেও এই মিশ্রণ ঘটে। মহিলারা এ বিষয়ে খুবই সজাগ। তিতা মিঠার ভিত্তিতে শাক মিশানোর কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হোলঃ

টাঙ্গাইল

উদাহরণ ১ঃ ন্যাটাপেটা (মিঠা), বুলবুলা শাক (নোনতা), আলুর পাতা (নোনতা), হেঞ্চি শাক (তিতকুটি), কানাই শাক (পিছলা)। অর্থাৎ একই সাথে মিঠা, তিতকুটি, নোনতা এবং পিছলা শাক রান্না করা হয়েছে।

উদাহরণ ২ঃ ডাটা শাক (মিষ্টি স্বাদ), ন্যাটাপেটা শাক (মিঠা), হেঞ্চি শাক (তিতকুটি), হেলেঞ্চা শাক (তিতাও না মিঠাও না), তেলা কচুর পাতা (পানসা)।

ঈশ্বরদী

উদাহরণ ১ঃ কাঁটা খুড়ি, নোনটা খুড়ি, ঠেনঠেনি (মিষ্টি মিষ্টি, নোনটা, পানসা)

উদাহরণ ২ঃ খান মান (তিতাওনা মিটাওনা) মিষ কচুর পাতা (তুর তুর) উল কচু

উদাহরণ ৩ঃ বাইতা শাক (কষ্টি কষ্টি) শীত লাউয়ের পাতা (পানসা)

উদাহরণ ৪ঃ কলমি শাক (তিতাও না মিটাও না তবে সামান্য বিজলা) (ঢেঁকি শাক মিষ্টি)।

উদাহরণ ৫ঃ হেলেঞ্চা (তিতকুটি) মালঞ্চ (মিষ্টি মিষ্টি) কাঁটাখুড়ি (মিষ্টি মিষ্টি) নুনটা খড়ি (নোনটা) কলমি শাক (তিতাও না মিটাও না তবে সামান্য বিজলা) সাজনা শাক (তিতা তিতা সামান্য) আমখুড়া (তিতা), শান্তি শাক (তিত কুটি) ঘিত কাঞ্চন (টক টক)।

উদাহরণ ৬ঃ শাপলা (কষ্টিকষ্টি) ছোট মাছ।

উদাহরণ ৭ঃ মিষ্টিকুমড়া শাক (খসখসে) চাল কুমড়া শাক (খসখসে) মিষ্টি আলুর পাতা (মিটা ও পিছলা পিছলা) পুঁই শাক (পিচলা ও বিজলা)।

উদাহরণ ৮ঃ খেসারী শাক (টক টক ও ঘাস ঘাস গন্ধ), শীত লাউয়ের পাতা, মটর কালাই শাক (মিঠা মিঠা)।

টাঙ্গাইল

প্রধান শাক	সাথে মিশানো শাক
ন্যাটাপেটা	মোরগ শাক, ইছা শাক, তেলাকুচা, খুইরা কাটা, হেঞ্চি শাক,
বতুয়া	মোরগ শাক, দুধলী শাক, নেটাপেটা শাক
হেঞ্চি	মিষ্টি আলু শাক, গোল আলু শাক, কানাই শাক, তেলাকুচা, হেলেঞ্চা, ডাটার পাতা।
দণ্ড কলস	গিমা, উস্তার পাতা
হেলেঞ্চা	হেঞ্চি, নেটাপেটা, তেলাকুচা, মোরগ শাক, মিষ্টি আলুর পাতা, গোল আলুর পাতা, ডাটার পাতা।
মোরগ শাক	হেলেঞ্চা, নেটাপেটা, ডাটা শাক, হেঞ্চি, মোরগ ফুলের পাতা
মিষ্টিকুমড়ার শাক	দুরমা পাতা, চিনতন পাতা, চালকুমড়া পাতা, পুঁইশাক
লাউ শাক	বিচিওয়ালা সীম, পেঁয়াজ পাতা, মিষ্টিকুমড়ার পাতা
পুঁইশাক	পালং শাক, ডাটা শাক, লাউ পাতা

কলমি শাক	হেলেঞ্চা, সিঞ্চি, ঢেঁকি শাক, দুধলীর পাতা
ঢেঁকি শাক	কলমি শাক, দুধলী পাতা
তেলাকুচা	পুঁইশাক, ডাটার পাতা, পালং শাক, পিপুলের পাতা, লাউ পাতা, মিষ্টি আলুর পাতা

ঈশ্বরদী

প্রধান শাক	সাথে মিশানো শাক
কলমি শাক	শান্তি শাক, তেলাকুচা, হেলেঞ্চর, নটে শাক, হেঞ্চি শাক
হেলেঞ্চা	সেঞ্চি, নেটাপেটা, চিককুটি, লাউ শাক, বতুয়া, ডাটা শাক
লাউ শাক	পেঁয়াজ পাতা, রসুন পাতা, ধনিয়া পাতা
নটে শাক	হেঞ্চি, ডাটা, গোল আলুর পাতা, মিষ্টি আলুর পাতা
সেঞ্চি	হেলেঞ্চা, চিরকুটি, ক্যাথাপাটা, বতুয়া
বতুয়া	নেটাপেটা, ধনিয়া পাতা, লাউ পাতা
কচু শাক	পিপুল পাতা, সাজনা পাতা

বরখালী

প্রধান শাক	সাথে মিশানো শাক
ক্যাথাপাটা	বতুয়া, সিঞ্চি, মিষ্টি আলু পাতা
বতুয়া	ক্যাথাপাটা, সেঞ্চি, নটেশাক, গোল আলু পাতা
কলমি	হেলেঞ্চা, হেঞ্চি
গিমা শাক	থানকুনি, ক্যাথাপাটা
নুনিয়া শাক	নটে শাক, কলমি, খুরেকাটা
গিন নারিস	বরবটি পাতা, ঢেড়শ পাতা, লাউ শাক
সজানা পাতা	বরবটি পাতা, ঢেড়শ পাতা, লাউ শাক
হেঞ্চি (নিরিচি)	সেঞ্চি, হেলেঞ্চা, কলমি

উদাহরণ ৯: আমরুল (টকটক) খ্যাতা শাক (টকটক), ঘিত কাঞ্চন (টকটক)।

উদাহরণ ১০: অজাত কচুর মুখি (বিজলা বিজলা) টাকি মাছ দিয়ে।

শাকের স্বাদ মিষ্টি, তিতা, টক বা নুনতা এবং পানসা বা সাধারণ স্বাদের সাথে মিলিয়ে শাক মিশানো হয়। যে কোন শাক মিশিয়ে রান্না করা হয় না। শাক রান্না করতে গিয়ে স্বাদের বিষয়টি মাথায় রেখে কয়েকটি শাক মিশিয়ে রান্না করা হয়, কিংবা শাকের সাথে অন্য সবজি এবং মাছ রান্না করা হয়। এখানে আমরা শাকের মধ্যে যে মিশ্রণ করা হয় তা দেখেছি। দেখা যায় কমপক্ষে পাঁচ ছয় ধরণের শাক একত্রে রান্না হয়। এই মিশ্রণের মধ্যে স্বাদের বিষয়টি থাকে এবং এক শাক অন্য শাকের স্বাদ নষ্ট না করে কি করে আরও মজার করতে পারে তার দিকে লক্ষ রাখা হয়। বদরখালিতে মহিলারা এই মিশ্রণের কারণও উল্লেখ করে দিয়েছেন। আমরা সেই কারণগুলো ছকের মধ্যে তুলে ধরছি।

শাক খাওয়া

শাক গ্রামের মহিলারা খেতে খুব পছন্দ করে। তাঁরা বলেন, শাক ছাড়া কি ভাত খাওয়া যায়? বিশেষ করে ৩৫-৫০ বছরের মহিলারা এ ব্যাপারে বেশী সোচ্চার। শহরের মহিলারা তাজা শাক পান না ফলে শাকের স্বাদ তাঁরা জানেন না। তাই শহর থেকে গ্রামে কেউ বেড়াতে এলে শাক খাওয়ার ইচ্ছা জাগে। প্রতিদিনের খাবার তালিকায় শাক থাকলেও বাড়িতে মেহমান আসলে শাক সাধারণত রাখা হয় না। একজন গ্রামের মহিলাকে এই

প্রশ্ন করলে উত্তর দিলেন, ‘তারা নিজেরা খেতে চাইলে তখন রান্না করি। জামাইর পাতে আমরা কোন দিন শাক দিবো না।’ অর্থাৎ শাক খাওয়া বিষয়টি সাধারণ পর্যায়ে থাকে, বিশেষ অবস্থায় শাকের ব্যবহার থাকে না।

গ্রামের মানুষের খাদ্যের তালিকায় প্রতিদিন শাক থাকে। কৃষকরা বলে শাক খেলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে, চোখের জ্যোতি বাড়ে। কচু শাক খেলে শরীরে রক্ত হয়। ছেলে মেয়েদের খেতে দেয়। শাক খেলে মাথার ব্রেন ভাল হয়। লেখাপড়ায় ভাল হবে এ চিন্তাও করে। ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বলে শাকে ভিটামিন আছে। শাক খাওয়ালে স্বাস্থ্য ভাল হবে। আবার প্রতিদিন শাক রান্না হয় না। অন্য খাবার থাকলে ২-৩ দিন পরপরও রান্না করা হয়। বর্ষা কালের চেয়ে শীত কালে শাক বেশী খাওয়া হয়। এর কারণ জানতে চাইলে একজন বলেন, “বর্ষার সময় নিজে যেটা লাগাই বা নিজের জায়গায় যতটুকু আছে ততটুকু খাই। আর শীতকালে সব জায়গায় পাওয়া যায় তাই কুড়িয়ে খাওয়া হয় বেশী।”

আর একজন বলেন, ‘শাক রান্না করি আমরা বিভিন্ন কারণে। অনেক সময় ভিটামিন মনে করে খাই। যেমন এখন একটু শাক খেলে শরীরে শক্তি বা বল পাবে। বা শরীরে রক্ত হবে। আবার এই তরকারি না থাকলে রান্নার আইটেম বাড়ানোর জন্য শাক রান্না করি।’

শাক খাওয়ার কারণ যেমন আছে তেমনি খুবই সুনির্দিষ্টভাবে শাক খাওয়ার সময়ও আছে। শাক হলেই যখন তখন খাওয়া যায় না। সকাল বিকালে রাতে শাক খাওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। গবেষণার প্রয়োজনে আমরা এই সময়কে সকাল, বিকাল ও রাতের খাবার হিশেবে আলাদাভাবে জানার চেষ্টা করেছি। তিনটি এলাকা থেকে এ বিষয়ে তথ্য পাওয়া গেছে।

ঠ. বদরখালীঃ রান্না ও স্বাদের মিশ্রণ

খেতা ফাটা (মিঠা), মিষ্টি আলু (মিঠা)	একই সাথে রান্না করে। কারণ মজা বেশী হয়।
বরবটি (খসখসা), ইলিচি (মিঠা) ঢেড়স পাতা (পিছলা সামান্য মিঠা)	বরবটি পাতা খসখসা এবং ঢেড়স পাতা পিছলা দেখে ইলিচি শাকের সাথে মিশায়ে রান্না করে মজা হওয়ার জন্য।
কাটামারিস (মিঠা), আডুরা মারিস (মিঠা), নুইন্ন্যা শাক (নুনতা)	নুইন্ন্যা শাক নুনতা দেখে কাটামারিস ও আডুরা মারিসের সাথে মিশায়ে রান্না করে।
গিরমী তিতা (তিতা), খেতাফাটা (মিঠা) লাউ শাক (সামান্য মিঠা)	গিরমী তিতা বেশী তিতা দেখে এই মিঠা শাকের সাথে মিশায়ে রান্না করে মজা হওয়ার জন্য।
হরি শাক (খসখসা শক্ত)	এই শাক আলাদা রান্না করে কারণ শাকটা গলে না। ছাড়া ছাড়া থাকে এ জন্য অন্য কোন শাকের সাথে মিশায়ে রান্না করে না।
কলমী শাক (মিঠা)	কলমি শাক অন্য কোন শাকের সাথে মজা লাগে না দেখে আলাদা রান্না করে। কারণ শাকটা একটু বিজলা ধরণের।
গিননারিস (পাইনস্যা), মরিচাড়াতা (লইস্যা মিঠা), লাউপাতা (সামান্য মিঠা)	একই সাথে রান্না করে কারণ গিননারিস শাকটা একেবারে ছোট দেখে লাউ শাকের সাথে মিশায়ে রান্না করে
সজনা পাতা (মিঠা) লাউ পাতা (সামান্য মিঠা)	সজনা পাতা ও লাউ শাক একই সাথে রান্না করে কারণ সজনা পাতা একেবারে ছোট দেখে।

কুড়িয়ে শাক খাওয়ার সময়

সকাল, দুপুর ও রাতের খাবারের তালিকায় কুড়িয়ে পাওয়া শাক একই বা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে তাঁরা যা খান তার একটু বিস্তারিত তথ্য নেয়া হয়েছে।

টাঙ্গাইল:

টাঙ্গাইলে অভিজ্ঞ তিন গ্রামের তিনজন কৃষকের সাথে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে তথ্য নেয়া হয়েছে। এরা তিনজনই নয়াকৃষির কৃষক।

আলোচনায় অংশগ্রহণকারী কৃষকদের পরিচিতিঃ

১. রাবেয়া বেগম, বয়স ৪৫ বছর, গ্রামঃ নাল্লাপাড়া

২. রোকেয়া বেগম, বয়স ৩৭ বছর, গ্রামঃ মৌশাকাঁঠালিয়া

৩. কমলা বেগম, বয়স ৩৯ বছর, গ্রামঃ নান্দুরিয়া

আলোচনার শুরুতে গ্রামের মানুষ সকাল, দুপুর এবং রাতে কোন শাক খাবে আর কোন শাক খাবে না তার একটি তালিকা করা হয়। কারণ বিশেষ শাক বিশেষ সময় খাওয়া ও না-খাওয়ার ব্যাপার আছে।

সকাল

কলমি শাক, হেলেঞ্চা শাক, অজাত কচুর (বন কচু) শাক, ন্যাটাপ্যাটা শাক, সাজনা পাতা, গুমা শাক, খারকুন, কস্তুরীর পাতা, মটর শাক, লাউ শাক, পিপুল শাক, মিষ্টি কুমড়া, তেলাকুচা, চালকুমড়া, উচ্ছে, মোরগ ফুলের পাতা, কাটা কচু ইত্যাদি। সকালে এই সব শাক খায়। এই তালিকায় ১৭টি শাকের নাম আসে।

দুপুর

অজাত কচুর শাক, বিষকচু, মোরগ শাক, তেলাকুচার শাক, গুমারপাতা, কস্তুরীপাতা, গিমা শাক, ক্ষুইদামুণ্ডের পাতা (থানকুনি), ন্যাটাপ্যাটা শাক, ভাইতা শাক (বতুয়া), হেঞ্চি শাক, কানাই শাক, সাজনা পাতা, গোল আলুর পাতা, মিঠা আলুর পাতা, হেলেঞ্চা শাক, সেঞ্চি শাক, সুমসুমি শাক, গন্ধ বাদালের পাতা, পাট শাক, ঢেঁকি শাক, উস্তার পাতা, কলমি শাক, চালকুমড়া, মটর শাক, খেসারী, মরিচ পাতা, লাউ শাক, মিষ্টি কুমড়া, ধোন্দল, শিয়াল মুতি, হুটকা, পিপুল, খারকুন, মোরগ ফুলের পাতা, কাটা কচুর শাক, রসুন শাক, খেতা ফাটা, নুনিয়া, কাকরোল পাতা, সরিষা, দুধলী ইত্যাদি। দুপুরে এই সব শাক খায়। এই তারিকায় ৪২টি শাকের নাম আসে।

রাত

হেলেঞ্চা শাক, বুলখুরিয়ার শাক, খারকুন, পুদিনা পাতা, ক্ষুইরা কাটার শাক, মিঠা আলুর পাতা, হেঞ্চি শাক, খেসারী, ভাইতা শাক, গন্ধ ভাদালের পাতা, কস্তুরী পাতা, কলমি, লাউ শাক, শিয়ালমুতি, সাজনা পাতা, পিপুল, তেলাকুচা, ন্যাটাপ্যাটা, গোল আলুর পাতা, কাকরোল ইত্যাদি। রাতে এই সব শাক খায়। এই তালিকায় ১৯টি শাকের নাম আসে। তবে সকাল, দুপুর এবং রাতের জন্যে নির্ধারিত শাকের মধ্যে একই শাকের নাম এসেছে ৪টি, এই শাকগুলো হচ্ছে সাজনা, কস্তুরী, তেলাকুচা ও পিপুল। এমন কোন শাকের নাম পাওয়া যায় নি যে শাক কেবলমাত্র সকালেই খাওয়া হয়।

দুপুরে যে শাকগুলোর নাম এসেছে অথচ সকাল বা রাতের তালিকায় আসে নি, সেগুলো হচ্ছে সরিষা, ধুন্দুল, বিষ কচু, কানাই শাক, পাট শাক, গিমা শাক, ক্ষুইদা মুন্তনের পাতা, মরিচ পাতা, খ্যাতাপাটা, রসুন শাক, ঢেঁকি শাক, সেঞ্চি, হুটকা।

যে শাকগুলো রাতের তালিকায় নাম এসেছে অথচ সকাল বা দুপুরের তালিকায় আসে নি, সেগুলো হচ্ছে, বুলখুইরা, পুদিনা।

তবে একদিনের তিন বেলাতেই শাক রান্না সাধারণত হয় না। এক বা দুই বেলা শাক হলে অন্য বেলায় অন্য খাবার থাকে। সেটাও কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য হতে পারে তবে শাক নাও হতে পারে।

ঈশ্বরদী:

পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার মুলাডুলি ইউনিয়নের হাজারী পাড়া মীরে পাড়া ও লক্ষী খোলার কয়েকজন মহিলা কৃষকদের সাথে আলোচনা করা হয়। কুড়িয়ে পাওয়া শাক ও খাদ্য যেগুলি সকাল, দুপুর ও রাতে খায় তাহার সেই তালিক নীচে দেওয়া হোলঃ

সকাল

কলমি শাক, শান্তি শাক, ঘৃতকাঞ্চন, ঢেঁকি শাক, খারকুন, সাজনা শাক, কস্তুরী পাতা, থানকুনি, নিমের শাক, ডগুকলস, বিষ কচু ইত্যাদি। সকালে এই সব শাক খায়। এই তালিকায় মোট ১১টি শাকের নাম পাওয়া গেছে।

সকালে শাক খাওয়ার কারণ: কলমি শাক, শান্তি শাক, খারকুন, সাজনা শাক ইত্যাদি সকালে খায় এই কারণে যে অল্প সময়ে অনেক তোলা যায়। কস্তুরী পাতা, ক্ষুদামানিক আগের দিন বিকাল বেলা তুলে রাখে পরের দিন সকালে খাওয়ার জন্য।

দুপুর

ডগুকলস, কচুর শাক, গিমা, উস্তে, ঢেঁকি শাক, বাইতা শাক, নুনটা খড়ি, শান্তি শাক, খ্যাতা শাক, ফুটকা শাক, পিপুল, বিষ কচু, তোষা পাট, মেস্তা পাট, মিষ্টি আলুর পাতা, মিষ্টি কুমড়ার পাতা, আমরুল শাক, কলমি, সাজনা, থানকুনি, নিমের পাতা ইত্যাদি। দুপুরে এই শাকগুলো খায়। এই তালিকায় মোট ২১টি শাকের নাম পাওয়া গেছে।

দুপুরের খাওয়ার কারণ: গ্রামের মহিলারা সকালে খাওয়া দাওয়ার পরে নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন তখন ছোট ছেলে মেয়েদের বলেন, 'যা কিছু শাক পাতা কুড়িয়ে কাড়িয়ে নিয়ে আয় দুপুরে আন্দুমনি (রান্না করবো)।' দেখা যায় যে মহিলা রাস্তায় ও উঠানে ধান অথবা পল (খর) শুকাতে দিয়ে মাঝে মাঝে নারা দিচ্ছে আবার চার থেকে পাঁচজন মহিলা বসে শাক বাছেন ও গল্প করছেন। দুপুরে খাওয়ার আয়োজন কাজের ফাঁকেই করতে হয়।

রাত

বাইতা শাক, কলমি, সাজনা শাক, থানকুনি, নিমের পাতা, হেলেঞ্চা শাক, কাটা খুড়ি, খেসারী, ঠ্যানঠ্যানি, রসুন শাক, মটর কালাই, গিমা, সীম পাতা ইত্যাদি। রাতে এই শাকগুলো খায়। এই তালিকায় মোট ১৩টি শাকের নাম এসেছে।

তবে সকাল, দুপুর ও রাতের জন্য একই শাকের নাম এসেছে ৪টি; সেগুলো হচ্ছে কলমি, থানকুনি, সাজনা ও নিমপাতা।

যে শাকগুলোর নাম সকালে এসেছে অথচ দুপুর বা রাতের তালিকায় আসে নি সেগুলো হচ্ছে ৩টি। যেমন ঘৃত কাঞ্চন, কস্তুরী পাতা, ডগুকলস।

কিছু শাকের নাম দুপুরের তালিকায় এসেছে অথচ সকাল বা রাতের তালিকায় আসে নি। অনাবাদি ও আবাদি ভাগ করে সেগুলো নীচে দেয়া হচ্ছে:

অনাবাদি ৭টি (গিমা শাক, নুনটা খড়ি, আম খুইরা, খ্যাতা শাক, ফুটকা শাক, পিপুল শাক, আমরুল)।

আবাদি ৫টি (উচ্ছে শাক, তোষা পাট, মেস্তা পাট, মিষ্টি আলুর পাতা, মিষ্টি কুমড়ার পাতা)।

যে শাকগুলো রাতের তালিকায় নাম এসেছে অথচ সকাল বা দুপুরের তালিকা আসে নি। অনাবাদি ও আবাদি ভাগ করে সেগুলো নীচে দেয়া হচ্ছে:

অনাবাদি ৪টি (হেলেঞ্চা, কাটা খুরিয়া, ঠ্যানঠ্যানি, রসুন শাক)।

আবাদি ৩টি (খেসারী শাক, মটর কলাই শাক, সীম পাতা)

বদরখালী:

ককস্‌বাজার জেলা, চকরিয়া থানার বদরখালী ইউনিয়নের দাতিনাখালী পাড়া, ছনুয়াপাড়া, ডেমুশিয়া পাড়া, মাঝের পাড়া, সাতডালিয়া পাড়া, দক্ষিণ পুকুরিয়া পাড়া মোট ৬টি পাড়া থেকে ১৫ জন মহিলা কৃষক, ৩জন দাই ও কবিরাজ, ১ জন পুরুষ কৃষক ও কবিরাজ নিয়ে একটা সভা করা হয়। সভায় বলা হয়, এই যে আমাদের আশেপাশে তোয়াইন্যা ফেডাইন্যা (কুড়িয়ে পাওয়া) যে সব খাদ্য পাওয়া যায় বিশেষ করে যেগুলো এ্যানে

(আপনজালা) পাওয়া যায় এবং চাষ করার পর যেগুলো তোয়ায়ে (কুড়িয়ে) খায় তার মধ্যে গ্রামের মানুষেরা সাধারণত সকাল, দুপুর, রাতের মধ্যে কোন্ শাক কখন্ খায়। আলোচনা ছিল খুবই প্রাণবন্ত। দীর্ঘ সময় আলোচনার প্রেক্ষিতে যে তথ্যগুলো পাওয়া গেছে সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

সকাল

অনাবাদি শাক - থানকুনি, কলমি, হরিশাক, আরগোয়া কচু শাক (বন কচু)। এই তালিকায় মোট ৪টি শাকের নাম পাওয়া গেছে।

আবাদি - রাই শাক (সরিষা), মিষ্টিকুমড়া, তিতা নারিস (মেস্তা পাট), মিঠা নারিস (তোষা পাট), লাউ শাক। সকালে এই শাকগুলো খাওয়া হয়। এই তালিকায় মোট ৫টি শাক পাওয়া গেছে।

লাউ শাক সকালে কম খাওয়া যায়। কারণ লাউ শাক সাধারণত ঘরের চালের উপর ও মাচা বা জাংলার উপর থাকে। সকালে সময় কম থাকায় এই শাক কম সংগ্রহ করা হয়।

দুপুর

অনাবাদি - কাটা মারিস, আডোরা মারিস, ঢেঁকি শাক, আইশাক, গিরমি তিতা, থানকুনি, খেতা পাটা, মুনসি শাক, কানাইয়া আগা, আরগোয়া কচু (বন কচু), কলমি, দণ্ড কলস, নিলিচি, খ্যাটখ্যাটে, মরিচা পাতা, ইলিচি (হেলেঞ্চা), নুনিয়া শাক, হরি শাক, বতুয়া থ্যানথ্যানি, গিন নারিস।

দুপুরে অনাবাদি শাকের মধ্যে এগুলো খাওয়া হয়। এই তালিকায় মোট ২১টি শাক পাওয়া গেছে।

আবাদি - লাউ শাক, মিষ্টি আলু শাক, গোল আলু, মিষ্টিকুমড়া, মিঠা নারিস (মেস্তা পাট), তিতা নারিস (তোষা পাট), ঝিংয়ে পাতা, চালকুমড়া, সাজনা, রাই শাক (সরিষা), কচু শাক।

দুপুরে আবাদি এই শাকগুলো খাওয়া হয়। এই তালিকায় মোট ১১টি শাক পাওয়া গেছে।

কুড়িয়ে পাওয়া শাক দুপুরে বেশী খায়। কারণ ৩ বেলার মধ্যে এই এলাকায় দুপুরের খাবারটাকে বেশী গুরুত্ব দেয়। এ জন্য তরিতরকারী শাক পাতা বেশী রান্না করে। এছাড়া দুপুরে পেট ভরে ভাত খায়। তাই সকালের রান্না ও অন্যান্য কাজ সেরে দুপুরের রান্না ও গোসলের আগে শাক টোয়ায়ে (কুড়িয়ে) আনা হয়। গোসল করে বিশেষ করে বড়রা শাক কুড়াতে আলানে পালানে, ক্ষেত খোলায় যেতে চান না। তাই তোয়ান্যা ফেডাইন্যা শাকটা দুপুরে খাওয়া হয় বেশী।

গিরমি তিতা, নিলিচি, সজিনা শাকের স্বাদ তিতা। এই শাক দুপুরে খায়। অতিরিক্ত রোদ বা গরমে তিতা খেলে শরীরের গরম ভাবটা কেটে য়ায় বলে গিরমি তিতা দুপুরে খায়।

রাত

অনাবাদি - গিরমি তিতা, হরি শাক, আরগোয়া কচু (বন কচু) শাক, কলমি, খেতাপাটা, নুনিয়া, কাটা মারিস, আডোরামারিস, আইশাক, নিলিচি, ইলিচি (হেলেঞ্চা)। রাতে অনাবাদি শাকের মধ্যে এগুলো খাওয়া হয়। এই তালিকায় মোট ১০টি শাকের নাম পাওয়া গেছে।

আবাদি - সাজনা শাক, কচু শাক, মিষ্টিকুমড়া শাক, লাউ শাক।

রাতে আবাদি শাকের মধ্যে এগুলো খাওয়া হয়। এই তালিকায় মোট ৪টি শাকের নাম পাওয়া গেছে।

রাতে শাক কম খায়। কারণ রাতে ভাত কম খাওয়া হয়। এছাড়া রাতে বেশী শাক পাতা খেতে পেট খারাপ হবার সম্ভাবনা থাকে। এ জন্য রাতে বড়রা অল্প খেলে খেতে পারে কিন্তু ছোট বাচ্চাদের রাতে শাক পাতা একদম খাওয়ায় না বললেই চলে।

সকাল, দুপুর এবং রাতের জন্য নির্ধারিত শাকের মধ্যে একই শাকের নাম এসেছে এমন শাকগুলো হচ্ছেঃ

অনাবাদি ৩টি (কলমি, হরিশাক, আরগোয়া কচু শাক)।

আবাদি ২টি (লাউ শাক, মিষ্টিকুমড়া শাক)।

যে শাকগুলো সকালে নাম এসেছে অথচ দুপুর বা রাতের তালিকায় আসে নি, এমন শাকের নাম পাওয়া যায় নি।

দুপুরে যে শাকগুলোর নাম এসেছে অথচ সকাল বা রাতের তালিকায় আসে নি, সেগুলো হচ্ছে অনাবাদি ৯টি যেমন কানাইয়ার আগা, ঢেঁকি শাক, মুনসি শাক, দণ্ড কলস, খ্যাটখ্যাটে, মরিচ্চা পাতা, বতুয়া, থ্যানথেনে, গিন নারিস এবং আবাদি ৪টি যেমন মিষ্টি আলু শাক, গোল আলু শাক, ঝিংয়ে পাতা, চাল কুমড়া পাতা।

তিন এলাকার তথ্য থেকে এটা পরিস্কার যে সকাল, দুপুর এবং রাত, তিন বেলাতেই শাক খাওযা হয়, তবে শাক খাওয়ার সবচেয়ে ভাল সময় হচ্ছে দুপুর। দুপুরে শাকের তালিকায় আবাদি এবং অনাবাদি শাক মিলিয়ে শাকের বৈচিত্র্য অনেক বেশী। এই সময় কুড়ানোর সুবিধাও বেশী। তাৎক্ষণিকভাবে কুড়িয়ে এনে রান্না করা যায়। রান্নার সুবিধা অসুবিধা ছাড়াও সকাল এবং রাতে শাক খাওয়া এবং তা হজম করার প্রশ্নও জড়িত।

পরিবারে শাক খাওয়ার উদাহরণ

তিন বেলা খাবারে শাকের ব্যবহার সম্পর্কে উদাহরণ হিশেবে টাঙ্গাইলের তিনটি পরিবারের সাক্ষাতকার এখানে দেয়া হলো।

১. সুন্দরী বেগম, গ্রামঃ কান্দাপাড়া

সুন্দরী বেগমের বয়স ৬০ বছর। লেখাপড়া জানেন না। স্বামী মৃত। তার ৫ ছেলে, ৪ মেয়ে। ছেলেদের বিয়ে করানোর পর আলাদা হয়ে গিয়েছে। মেয়েরা বিয়ের পর স্বামীর বাড়িতে আছে। তিনি একাই থাকেন। তিনি পুরো জীবনটাই কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য খেয়ে বেঁচে আছেন। জ্বালানী থেকে শুরু করে শাক পাতা পর্যন্ত সব কিছুই তাঁর কুড়িয়ে আনা।

কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের মধ্যে থাকে সকালে ভাতের সাথে লাউ পাতা, কুমড়া পাতা, আলুর কচি পাতা, হেলেঞ্চা, ন্যাটাপ্যাটা শাক, বথুয়া শাক, বন কচুর কচি পাতা ও ডোগাসহ কচুর লতি। এসব সিদ্ধ করে লবণ, মরিচ, পেঁয়াজ দিয়ে হাতে ডলে ভর্তা করে খান। আবার এসব শাক ভাজিও খান। তবে সকাল বেলায় ভর্তাই খাওয়া হয় বেশী।

বর্ষার সময় বেশীরভাগ শাপলা ভাজি করে খান। সকালে ভাত না থাকলে শালুক তুলে সিদ্ধ করে খান। রবি মৌসুমে ক্ষেত থেকে ডাল-গম তুলে নেয়ার পর ছরানো ছিটানো ডাল, গম পড়ে থাকে। তা তুলে এনে রাখেন এবং সকালে ভেজে খান। দুপুরে প্রায়ই চকে গিয়ে মাছ ধরে আনেন। আবার শামুক ও হালু (শালুক) তুলে আনেন। হাঁসের খাবারের জন্য শামুক আনেন, আর নিজের জন্য মাছ ধরে আনেন। সে মাছই দুপুরে রান্না করেন। আবার কচু শাক তুলে এনে পাতা ডোগাসহ রান্না করেন। বতুয়া শাক কুড়িয়ে এনে মাছ দিয়ে বতুয়া শাকের পিঠালু রান্না করেন। কলমি শাক দিয়েও ছোট মাছ রান্না করেন।

রান্নার জ্বালানীর জন্য আখের গোড়া, আখের পাতা, চক (জমি) থেকে ধান কাটার পর ধানের গোড়া কুড়িয়ে এনে রান্না করেন।

রাত্রে যেসব খাবার তিনি খান তার মধ্যে রয়েছে ছোট মাছ, কচুর ডাইগা, কচুর লতি ইত্যাদি। কচুরমুখী সকালে তুলে এনে রোদে রেখে দিয়ে দুপুরে সিদ্ধ করে রাখেন। বিকালে বসে বাছেন। তারপর রাত্রে মুখীর ডাল রান্না করেন। শাক বিকালে তুলে আনেন। ঘরে কিছু না থাকলে তখন শাক ভাজি খান। বিকালে শাক তুলে ঐ শাক আবার সকালেও কখনো কখনো খান। আবার মাঝে মাঝে দুপুরের রান্না রাত্রে খান। আবার রাত্রের রান্না সকালেও খেয়ে থাকেন।

তিন বেলা খাবারের তালিকা

সকাল: লাউ পাতা, কুমড়া পাতা, বথুয়া শাক, ন্যাটাপ্যাটা শাক, হেলেঞ্চা শাক, কলমি শাক, কচুর লতি, কচু পাতা ইত্যাদি শাকের ভর্তা ও ভাজি। হালু (শালুক), ডাল, গম ভাজি ইত্যাদি।

দুপুর: ছোট মাছ, টাকি, পুঁটি, ইছা, মলা, কচুর ডাইগা, বথুয়া শাক, কলমি শাক, লাউয়ের ফুল ইত্যাদি।

আখের পাতা, গোড়া, ধানের গোড়া জ্বালানীর জন্য।

রাত: কচুর লতি, ডাইগা ও মুখী ইত্যাদি। মাছের মধ্যে ছোট মাছ, টাকি, ইচা ইত্যাদি।

সকাল এবং দুপুরে খাবারের বৈচিত্র্য অনেক বেশী, রাতের খাবার সাধারণভাবেই খান। শাক কম, মাছের পরিমাণ বেশী।

১. জুলেমন বেগম, গ্রাম: কান্দাপাড়া

জুলেমনের বয়স ৩৫ বছর। নাম স্বাক্ষর জানেন। স্বামী আব্দুল আলী। তার দুই ছেলে এক মেয়ে। ছেলে মেয়েরা স্কুলে যায়। তার সংসারে তার বাচ্চারা প্রতি দিনই কুড়িয়ে পাওয়া খাবার আনে।

সকাল: সকালে ভাত রান্না করলে ভাতের মধ্যে লাউ পাতা, সিপ চরনের পাতা, কুমড়া পাতা দিয়ে সাধারণত ভর্তা করে খান। মরিচ বাটা, শুকনা ইচার ভর্তা, কস্তুরী পাতার ভর্তা, তেলা কুচার ভর্তাও খেয়ে থাকেন।

দুপুর: বর্ষায় প্রত্যেক দিনই বাচ্চারা মাছ ধরে আনে। মাছ ধরার সাথে সাথে গরুর খাবার পানা ও ঘাস তুলে আনে। হাঁসের খাবারের জন্য শামুক আনে। আবার শাপলা, শালুকও তুলে আনে। শাপলা ছোট মাছ দিয়ে রান্না করে খান। টাকি মাছ ও কলমি শাক দিয়ে পিঠাল রান্না করেন। প্রত্যেক দিন যে কোন ধরনের শাক দুপুরের খাবারের সাথে থাকে। কচুর ডাইগা রান্না, পাতা, লতি রান্না, কচুরমুখী যখন পাওয়া যায়, তাও খান। ঢেঁকি শাক তুলে, ছোট মাছ ধরে রান্না করেন। কলমি, হেলেঞ্চা, ন্যাটাপ্যাটা রকম ২/৩ ধরনের শাক তুলে এনে একসাথে ভাজি করেন।

রাতে: ধরা মাছ, শাক ও কচু দিয়ে রান্না করেন। মাছের চড়চড়িও করেন। দুপুরের রান্না তরকারিও মাঝে মাঝে রাতে খান। টাকি মাছের ভর্তা ও ইচার গুড়াও সময় সময় খেয়ে থাকেন। বর্ষার সময় অনেক মাছ যখন পাওয়া যায় তখন মাছের শুটকি করে রাখেন। বছরের অন্যান্য সময় ঐ শুটকি খেয়ে থাকেন।

২. সালেহা বেগম, গ্রাম: চিতুলিয়া পাড়া, ভুয়াপুর

বয়স ৩৫ বছার। লেখাপড়া জানেন না। স্বামী শওকত আলী। তার ছেলে মেয়ে দুই জন, দুইজনের বিয়ে দিয়েছেন।

সালেহা বেগম যেসব কুড়িয়ে পওয়া খাদ্য সাধারণত তিন বেলা খেয়ে থাকেন তার মধ্যে রয়েছে:

সকাল: রাত্রের বাসী ভাত, তরকারির মধ্যে শাক ভর্তা, শাক, ছোট মাছের তরকারি। সকালে এসব খাওয়ার পর দুপুরের জন্য রান্না করেন।

দুপুর: ছোট মাছ ধরে এনে সাথে হেঞ্চি শাক, পালং শাক, লাউ পাতা শাক কচু ইত্যাদি।

রাত: রান্না করার জন্য কুড়িয়ে আনেন বতুয়া শাক, আমরুল শাক, কানাই শাক, মূলা শাক, গিমা শাক, ঘেচু শাক, কচু শাক ইত্যাদি। মাঝে মাঝে দুপুরের তরকারি রাতেও খেয়ে থাকেন।

৪. চাম্পা বেগম, গ্রাম: গজিয়াবাড়ি

চাম্পা বেগমের বয়স ৩৮ বছর। লেখাপড়া জানেন না, স্বামী কামলা দেয়। মাটি কাটে। পরিবারের সদস্য ৫ জন। এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলের বয়স ১১ বছর মেয়ের বয়স ৯ বছর। চাম্পা বলেন, আমাদের কোন জমি নাই। বসত বাড়ি ১০ শতাংশ। আমরা সব সময়ই কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য খাই। শাপলা, শালুক, কলমি শাক, মাছ,

ভাইতা শাক, হেঞ্চি শাক, ঢেপা শাক, তেলাকুচা। যে দিনে যেটা পাওয়া যায় বাচ্চারা তুলে আনে। রান্না করার জন্য খড়ি জাবা (জ্বালানী) ও কুড়িয়ে আনা হয়।

সকাল: সকালে অনেক সময় বাসী খাবার খাওয়া হয়। শীতকালে সন্ধ্যায় ভাইতা শাক দিয়ে পিঠালু রান্না করে সকালে খাওয়া হয়। ভাত রান্না করলে কচু শাক ভর্তা, তেলা কুচার পাতা বাটা খাওয়া হয়।

দুপুর: দুপুরে মাছ ধরে এনে রান্না করে খাওয়া হয়। পুঁটি, ইছা, চাটা, বাইম, ভুতকইয়া, টাকি এইগুলি তরকারি ও কলমি শাকের ডোগা দিয়ে রান্না করা হয়। কচুরমুখী সিদ্ধ করে ডাল খাওয়া হয়। অনেক সময় ভাইতা ও অন্যান শাক খাওয়া হয়।

রাত: রাতের বেলায় শীতকালে বেশী শাক খাওয়া হয়। বিকাল বেলায় বাচ্চারা শাক তুলে সন্ধ্যায় রান্না করা হয়। ভাইতা শাক, হেঞ্চি শাক, ন্যাটাপ্যাটা শাক অন্য সময় তেলাকুচা শাক, খারকুন, কানাই শাক, ঢেপা শাক, বন কচু শাক খাওয়া হয়।

শাকের স্বাদ

শাক খেতে মজা, তাই মহিলারা শাক খান। তাঁরা শাকের নির্দিষ্ট স্বাদ চেনেন এবং এই স্বাদের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়েই গ্রামের মহিলারা শাক কুড়ান এবং রান্না করেন। শাকের স্বাদের সাথে তার গুণাগুণও বিচার করা হয়। শাকের স্বাদ বলতে গেলে শুধু এক ধরণের স্বাদের কথা বলা হয় না বরং অনেক ধরণের স্বাদের কথা আসে। তার মধ্যে তিতা, মিঠা, চুকা কোনটাই বাদ যায় না। স্বাদের বৈচিত্র্যে শাককে আরও বেশী আকষণীয় করে তোলে। আমরা তিনটি গবেষণা এলাকা থেকে প্রাপ্ত শাকের তালিকা ধরে এর স্বাদ নিয়ে জানতে চেয়েছি। এই সময় তিন এলাকার মহিলাদের একত্রে বসে তালিকাটি করেছি। এবং দেখেছি একই শাকের স্বাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় কি না।

অনাবাদি এবং আবাদি ও সাথী শাকের ৫৩টি শাকের মধ্যে ১০টি শাকের স্বাদের পার্থক্য পাওয়া গেছে এবং এই পার্থক্য এমনই যে, কোথাও তিতা বলছে তো কোথাও মিঠা বলছে। পানসা, বিজলা (পিছল) ইত্যাদি ধরণের পার্থক্য দেখা গেছে। তবে এলাকার পরিবেশের কারণে স্বাদের পার্থক্য হওয়া বিচিত্র নয়। স্বাদের প্রশ্নে বেশ কয়েক ধরণের পাওয়া গেছে। এর মধ্যে আছে মিঠা, তিতা, কষ, টক, বিজলা, পানসা, গলা ধরা, নোনতা ইত্যাদি।

শাকের তিতা স্বাদ খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় এবং তিতা স্বাদের সাথে এর পুষ্টি গুণ জড়িত আছে বলে ধারণা করা হয়। ফলে সচেতনভাবেই তিতা শাক খাওয়ার চেষ্টা করে। এমনকি ছোট শিশুরা তিতার জন্যে খেতে না চাইলে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়। কৃষকরা বলেন, ছোট বাচ্চারা সহজে তিতা শাক - সবজি খাইতে চায় না। যখন তাকে তিতা কোন শাক খাওয়ানো হয় তখন তাকে কোলে নিয়ে হেঁটে হেঁটে নানান গল্প বলে খাওয়ানো হয়। যেমন: তোমাকে হাতি কিনে দিব, ঘোড়া কিনে দিব এইভাবে এক-দুই নলা খাওয়ানোর পরে আবার চাঁদের গল্প বলে খাওয়ানো হয়।

তিতা শাক খাওয়ালে বাচ্চার মুখে রুচি আসে ও পেটে ক্রিমি মরে যায়। শরীর ভাল হয়। কলমি, কচু শাক খাওয়ালে রক্ত পরিষ্কার হয় এবং শরীরে রক্ত বাড়ে। ছোট বাচ্চাকে কুড়িয়ে পাওয়া শাক সবজি খাওয়ানোর ব্যাপারে সচেতন হয়ে রান্না করতে হবে। বেশী তেল দেওয়া যাবে না। তাহলে পেটে হজমের গণ্ডগোল হতে পারে।

কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য ও শাক

শাকের ওপর এই গবেষণা কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য গবেষণারই একটি অংশ। কৃষকরা খাদ্য আবাদ করেন, এই খাদ্যের মধ্যে ফসলের আবাদ, মাছের চাষ, ফল ফলাদি চাষ সব কিছুই আছে। খুবই সুপরিকল্পিতভাবে এই সব

ফসলের আবাদ করা হয়। এটাই কৃষকের জীবন। কৃষক নিজের খাদ্য ফলায় আর যারা খাদ্য ফলায় না, তাদের খাদ্যের যোগান দেয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, গ্রামের মানুষ এবং বিশেষ করে কৃষকদের সব খাদ্যই আবাদী উৎস থেকে আসে। গ্রামের মানুষের খাদ্যের হিসাব নিলে দেখা যায় যে সেখানে অনাবাদী উৎস থেকে খাদ্যের কথা প্রায় সব ক্ষেত্রেই থাকছে। কৃষকদের দৈনন্দিন খাবারের হিসাব নিতে গিয়েই কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের এই কথা আমরা জানতে পেরেছি। এবং অবাক হবার মতো করেই আমরা জেনেছি যে মোটা খাদ্যের মধ্যে একটি বড় অংশই আসে অনাবাদী উৎস থেকে।

প্রশ্ন আসে যে কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য মোট খাদ্যের কত অংশ ? কারণ কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের কথা বলে আমরা কি শুধুমাত্র সৌখিন কিছু খাদ্যের কথা বলছি না কি এই খাদ্য আসলেই মানুষের মূল খাদ্যের অংশ। এই প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর ওপর কোন আলোচনা বা কোন গবেষণা হয় নি, ফলে খাদ্য বলতে এখনও কেবল আবাদি খাদ্যের কথাই বোঝে। কুড়িয়ে পাওয়া কোন ভূমিকা কেউ স্বীকার করে না। অবশ্য স্বীকার না করলেও বাস্তবতা কখনও মুছে যাবে না। এমন নয় যে আবাদী খাদ্যের অভাব হলেই খাদ্য কুড়িয়ে আনতে হয়। আসলে আমাদের দেশের কৃষি ব্যবস্থাই বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং কৃষির কারণেই অনেক খাদ্য আপনা থেকেই জন্মায়। এদের আমরা সাথী ফসল বলি। যেমন বথুয়া শাক, দণ্ড কলস ইত্যাদি। এই শাকগুলো হয়তো আধুনিক কৃষি বা এককাট্টা ফসলের মাঠে হবে না কারণ এইগুলো ভাল করে বেড়ে ওঠার আগেই আগাছা বলে উপড়ে ফেলা হয়। অথচ নয়াকৃষি বা প্রাকৃতিকভাবে কৃষি করলে সেখানে এই শাকগুলোর কদর বেড়ে যায়। এসবই খাদ্য। এমনকি রাস্তার ধারে, পুকুর পাড়ে, জলাশয়ে যে খাদ্য পাওয়া যায় তা সম্পর্কে মানুষ জানে এবং তা কুড়িয়ে এনে খায়। এটা স্বাভাবিক এবং দৈনন্দিন জীবনেরই অংশ। কোন মহামারী বা দুর্ভিক্ষের অবস্থা নয়। বন্যা বা খরার সময় যখন আবাদি ফসল নষ্ট হয়ে যায় তখন এই খাদ্য বিশেষ ভূমিকা রাখে এটা সত্য। সেই তথ্যও আমরা সংগ্রহ করেছি। তবে কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা কৃষির বৈচিত্র্য এবং এলাকার গাছ-গাছালি, মাছ এবং অন্যান্য প্রাণীর বৈচিত্র্য রক্ষার সাথে সম্পর্কিত। যত বেশী বৈচিত্র্য হবে ততো বেশী খাদ্য পাওয়া যাবে। আধুনিক কৃষির এলাকায় এ বিষয়টি একেবারে অনুপস্থিত। সেখানে মাঠের পর মাঠ আবাদী ফসল আছে কিন্তু আবাদীর পাশাপাশি কিংবা সাথী হিসাবেও কোন ফসল নেই। এখানে মানুষে আবাদী ফসল যখন খায় তখনও সার কীটনাশকযুক্ত খাদ্য খায় আর আবাদী খাদ্য না থাকলে উপোষ থাকে। বাজার থেকে কেনার পয়সা না থাকলে না খেয়েই মরতে হয়। এই বিষয়টি আমাদের চোখে প্রথম ধরা পড়ে নায়াকৃষির কৃষকদের কাজের পরিধি বাড়ার সাথে সাথেই। দুপুরে বা সকালে ভাতের সাথে কুড়িয়ে পাওয়া শাক কিংবা অন্য খাদ্য খেয়ে এসে হাসি হাসি মুখ নিয়ে গ্রামের মহিলারা তাঁর জমির ফসল পাওয়ার খবর দেন নি, দিয়েছেন কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের কথা। তখনই জেনেছি তাঁদের হাসির মর্ম কি।

শাকের নাম অনুযায়ী এলাকাভেদে স্বাদ সম্পর্কে তথ্য

অনাবাদী

নং	শাকের নাম	টাঙ্গাইল	বদরখালী	ঈশ্বরদী	মন্তব্য
১	হেলেঞ্চা	একটু তিতকুটি মাইটা	অল্প তিতা	তিতকুটি	একই রকম
২	ঢেঁকি	কষ্টি বিজলা গন্ধ	কষ ও বিজলা	বিজলা বিজলা	একই রকম
৩	সেঞ্চি	তিতকুটি	ততি পানসে	তিতকুটি	একই রকম
৪	নটে (ন্যাটাপ্যাটা)	মিঠা মিঠা	মিঠা	পানসে মিঠা	একই রকম
৫	গিমা	তিতা	তিতা	তিতা	একই রকম
৬	তেলাকুচা	তিতকুটি	নাই	একটু তিতাকুটি	একই রকম
৭	থানকুনি	কষ্টিকষ্টি তিতা বিজলা বিজলা	অল্প তিতা	কষ্টি, তিতা	ভিন্ন
৮	কানাইশাক	বিজলা বিজলা	বিজলা, কষ	বিজলা বিজলা	একই রকম
৯	বন কচু	মিঠা মিঠা	মিঠা ও তুরতুর	মিঠা মিঠা	একই রকম
১০	গন্ধবাদালী	তিতকুটি গন্ধ	নাই	গন্ধ	একই রকম

১১	কলমী	মিঠা ও বিজলা	মিঠা, বিজলা	মিঠা ও বিজলা	একই রকম
১২	ডগুকলস	তিতকুটি	তিতা জাঝালো	তিতা	ভিন্ন
১৩	ক্যাথাপেটা	মিঠা মিঠা	পানসে মিঠা	টকটক	ভিন্ন
১৪	নুনিয়া শাক	বালি বালি নুনতা	নুনতা টকটক	নুনতা	একই রকম
১৫	শুষনী শাক	টক টক	নাই	নাই	একই রকম
১৬	খুরে কাটা (কাটা নটে)	মিঠা মিঠা	মিঠা মিঠা	মিঠা মিঠা	একই রকম
১৭	হেঞ্চি (নিরিচি)	তিতকুটি	তিতা	সামান্য তিতা	ভিন্ন
১৮	মরিচ পাতা	পানসা	মিঠা, বিজলা	নাই	ভিন্ন
১৯	বতুয়া	মিঠা ও বিজলা	মিঠা ও দুধের ঘ্রান	কষ্টি কষ্টি	
২০	মোরগ শাক (ঘৃতকাঞ্চন)	রানসা	নাই	টক টক	ভিন্ন
২১	খারকন	তুরতুরে	নাই	তিতা ও না মিঠাও ন	একই রকম
২২	পিপুল	তিতা	নাই	তিতাকুটি	একই রকম
২৩	আমরুল	টকটক	নাই	টক টক	একই রকম
২৪	নুন খুইরা (বুলখুইরী)	মিঠা ও না তিতা ও না	নাই	নাই	
২৫	বিষ কচু	তুরতুর করে	নাই	পানসা তুরতুর করে	একই রকম
২৬	দুধলী	রানসা মিঠা	নাই	নাই	
২৭	রসুন শাক	জ্যানজা জ্যানজা	নাই	জাঝ জাঝ লাগে	একই রকম
২৮	বাজরা কাটা	মিঠা	নাই	নাই	
২৯	লাল পাতা	পানসা পানসা	নাই	নাই	
৩০	কাটা কচু	পানসা মিঠা	নাই	নাই	
৩১	বন পাট	তিতা তিতা লাগে	নাই	নাই	
৩২	মনসি শাক	নাই	অল্প তিতা	নাই	
৩৩	হরিশাক	নাই	পানসে কষ	নাই	
৩৪	থ্যানথেনি	নাই	মিঠা	নাই	
৩৫	গিননারিসা	নাই	পানসে মিঠা	নাই	
৩৬	খ্যাটখেটি	নাই	টকটক মিঠা		
৩৭	চিরকুটি (চিনিগুড়ি)	মিষ্টি মিষ্টি	আছে খায় না	মিঠা মিঠা	একই রকম
৩৮	হুটকা/পুটকা	নাই	নাই	পানসে	
৩৯	কস্তুরি	টকটক তুরতুর করে	নাই	টকটক	একই রকম

আবাদী

নং	শাকের নাম	টাঙ্গাইল	বদরখালী	ঈশ্বরদী	মন্তব্য
১	মিষ্টি আলু	কষ্টি কষ্টি মিঠা	পানসা মিঠা	মিঠাও পিছলা	ভিন্ন
২	গোল আলু	মিঠাও না তিতাও না নুনতা	আছে (খায় না)	তিতাও না মিঠাও না	একই রকম
৩	সীম পাতা	নুনতা নুনতা	আছে (খায় না)	নুনতা নুনতা	একই রকম
৪	লাউ	মিঠা মিঠা	মিঠা মিঠা (দুধের ঘ্রাণ লাগে)	মিঠা মিঠা	একই রকম
৫	মিষ্টি কুমড়প	পানসা মিঠা	পানসা মিঠা	পানসা মিঠা	একই রকম
৬	তোষা পাট	টক তিতা	তিতা	তিতা	একই রকম
৭	ছাল কুমড়া	তিতা তিতা	পানসা তিতা	পানসা তিতা	একই রকম
৮	ডিয়াজ পাতা	টক ঝাঁঝ ঝাঁঝ	ঝাঁঝ ঝাঁঝ টক	ঝাঁঝ	একই রকম
৯	সাজনা পাতা	তিতকুটি	তিতা মিঠা	অল্প তিতা	ভিন্ন
১০	বরবটি পাতা	পানসা	তিতাও না মিঠাও না	তিতাও নাও মিঠাও না	একই রকম

১১	ঢেঁড়স পাতা	বিজলা মিঠা	অল্প মিঠা বিজলা	নাই	একই রকম
১২	কাকরোল পাতা	মিঠা মিঠা	আছে খায় না	নাই	
১৩	সরিষা	তিতকুটি ঝাঁঝ	অল্প তিতা ঝাঁঝ	তিতা ঝাঁঝ	একই রকম
১৪	মোরগ ফুরের পাতা	পানসা মিঠা	পানসে মিঠা	পানসা মিঠা	
১৫	মেস্তা পাট	তিতাকুটি নুনতা	মিঠা মিঠা	মিঠা মিঠা	ভিন্ন
১৬	ধুন্দল	গাইস গাইসা	আছে খায় না	গাইসা গাইসা	একই রকম
১৭	ঝিংগা	পানসা পাইসা আইসা	আছে খায় না	গাইসা গাইসা	
১৮	রসুনে পাতা	ঝাঁঝালো	ঝাঁঝালো	ঝাঁঝালো	একই রকম
১৯	খেসারী	টকটক	নাই	টকটক গাস গন্ধ	একই রকম
২০	ছোলা শাক	টকটক	নাই	টকটক	
২১	উচ্ছে শাক	তিতা	আছে খায় না	তিতা	একই রকম
২২	পটল পাতা				
২৩	মটর শাক	তিতকুটি মিঠা	নাই	মিঠা মিঠা	ভিন্ন
২৪	পুদিনা	গন্ধ	নাই	গন্ধ	একই রকম

সাধারণভাবে একটি কৃষক পরিবারের খোঁজখবর নিলেই কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের অবস্থা আমরা জানতে পারবো। সেই রকম কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি -

উদাহরণ ১: সুফিয়া বেগম, একটি কৃষক পরিবারের দৈনিক খাদ্য (টাঙ্গাইল)

সুফিয়া বেগম, বয়স ৩৬ বছর, গ্রাম: গোয়ারিয়া

সুফিয়া বেগম, স্বামী সন্তান নিয়ে কৃষি কাজ করেন। জমিতে যা ফসল হয় তাতে বছর চলে যায়। বাজার থেকে তেমন কিছু কিনে খেতে হয় না। তার দুই ছেলে এক মেয়ে নিয়ে পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। প্রতিদিন এক বেলা রান্না করে দুই বেলা খান।

সাক্ষাতকার নেয়ার দিনে ঘরে নিজের জমির চাল ছিল এবং বাড়িতে দুধ কচু ছিল। বাড়ির পাশে খাল আছে। সেখান থেকে তার স্বামী মাছ মেরে আনেন।

সুফিয়া সকালে দেড় কেজি চালের ভাত রান্না করে দুধ কচুর ডাইগা পাতাসহ কেটে আনেন। দুধ কচুর পাতা দিয়ে মরিচ বাটা করে। সেদিন কচুর ডাইগা দিয়ে মেরে আনা টেংরা পুঁটি, মলা, চাটা, টাকি রান্না করে সকালে খেয়েছিলেন ভাতের সাথে শুকনা মুড়ি মাখিয়ে। রাতে আবার এক কেজি চালের ভাত রান্না করেন। মেয়ে পাঁচ মিশালি শাক তুলে এনে দিলে তিনি ভাজি রান্না করেন। এর সাথে রসা তরকারি রান্না করেন। এই তরকারি ছিল নিজের বাড়িতে বোনা। ডাটা, আলু ও গাছের তিনটা দুরমা একসাথে মিশিয়ে রান্না করেন। রাতে এই খাবার খান। রাত্রে শরীর ঠাণ্ডা থাকার জন্য রসা ও ঝোল ঝোল তরকারি খায়।

মন্তব্য: সুফিয়া বেগমের একদিনের খাবারের মধ্যে চাল এবং ঘরের দুই তিনটি তরকারি ছাড়া বাকী সবই ছিল কুড়িয়ে পাওয়া। এর মধ্যে কুড়িয়ে পাওয়া মাছও ছিল। পাঁচ মিশেলি শাক এই দিনের খাদ্যের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে আছে।

উদাহরণ ২: কুলসুম বেওয়া, একটি গরিব পরিবারের দৈনিক খাদ্য (টাঙ্গাইল)

কুলসুম বেওয়া, বয়স ৫৫ বছর, গ্রাম: কান্দাপাড়া

কুলসুম বেওয়ার দুই ছেলে এক মেয়ে। তার মাঠে জমাজমি নাই। বাড়িভিটার উপর ঘর তুলে থাকছেন। কুলসুম বেওয়া বলেন, 'আমার ঘরে সকালের খাবার ছিল না। সকালে কি খাব? চিন্তা করলাম কি খাবার তৈরি করব। বাড়ির পাশে পালানে কচু শাক তা আনার জন্য কাচি নিয়ে বের হয়ে গিয়ে এক পানজা (বোঝা) কচু শাক নিয়ে আসি। সে কচু কেটে ধুয়ে লবণ, মরিচ দিয়ে রান্না করি। সকাল বেলা এ শাক খেয়েছি। ছেলেও এ শাক

খেয়ে অন্যের রিক্সা ভাড়া নিয়ে রিক্সা চালাতে যায়। এক বেলা রিক্সা বেয়ে তার ছেলে ২ কেজি চাল কিনে আনে। তার থেকে ৭৫০ গ্রাম চাল রান্না করেন। তার সাথে কলমি ও হেলেঞ্চা শাক তুলে ভাজি করেন। শাক ভাজা প্রায় ৭০০ গ্রামের মত হলো। তার সাথে গাছের পেঁপে তা ঝোল করে নিরামিশ রান্না করি তা প্রায় ১০০০ গ্রাম। এ দিয়ে দুপুর ও রাত্রে খেয়েছি। ভাত কম থাকলেও তরকারি বেশী করে খেয়ে নিলাম। সারা দিনের খাদ্যের মধ্যে কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য ছিল:

হেলেঞ্চা ও কলমি - ৭০০ গ্রাম

কচু শাক - ১৫০০ গ্রাম

বাড়ির তরকারি ছিল - ১০০০ গ্রাম

কাজ করে আনা টাকার কেনা খাদ্য ছিল: চাল ৭৫০ গ্রাম

পুরো খাদ্যের মধ্যে ওজনে ধরলেও কুড়িয়ে পাওয়া শাকের পরিমাণ মোট খাদ্যের অর্ধেকেরও বেশী। কেনা ও আবাদী তরকারি ১৭৫০ গ্রাম আর কুড়িয়ে পাওয়া শাক ২২০০ গ্রাম। অর্থাৎ মোট খাদ্যের মধ্যে কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের পরিমাণ আবাদী ও কেনা খাদ্যের পরিমাণের চেয়ে বেশী।

উদাহরণ ৩: রং বাহার, একটি গরিব কৃষক পরিবারের দৈনিক খাদ্য (টাঙ্গাইল)

নাম: রং বাহার, গ্রাম: গোয়ারিয়া

পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ জন।

রং বাহার বলেন, আমার পরিবারে চার জন লোক আছে। তাদের একদিনের জন্য স্বাভাবিকভাবে দুই কেজি চালের ভাত লাগে। সেখানে আমার এক কেজি চাল আছে। এ চাল দিয়ে আমার সারা দিন খেয়ে থাকতে হবে এ চিন্তা করি। সকালে উঠে চাল পানি খেয়ে চকে (জমিতে) শাক তুলবার গেলাম। চকে গিয়ে কলমি শাক তুললাম দেড় কেজির মত। তারপর বাড়ির গাছের একটা কলার ফুল পারলাম, এর সাথে অন্য বাড়ির পালান থেকেও একটা কলার ফুল পেরে আনলাম। কলার ফুল শাক কেটে নিলাম। ঐ এক কেজি চাল থেকে আড়াই পোয়া চালের ভাত রান্না করে কলমি শাক ও কলার ফুল ভাজি এবং খুটে আনা আলু থেকে আধা কেজি আলু সিদ্ধ করি। ভাজি করা কলমি শাক সোয়া কেজি এবং দুইটা কলার ফুলে আধা কেজি মত হয়। এ আড়াই কেজি চালের ভাত দু' বেলা খেতে হবে এই চিন্তা করে, পেটের ক্ষুদা নিবারণ করার জন্য সিদ্ধ করা আলু আগে খেয়ে নিলাম। তারপর ভাতের তৃপ্তি মেটানোর জন্য অল্প করে ভাত, তার সাথে কলমি শাক ও কলার ফুল নিয়ে খেয়েছি। দুপুরে অল্প ভাত ছিল। সে ভাত অল্প অল্প করে নিয়ে বেশী করে শাক ও কলার ফুল নিয়ে খেয়েছি এভাবে দু'বেলা গেল।

বিকালে বা রাত্রের জন্য দেড় পোঁয়া চাল আছে। তার সাথে আলু কেটে দিয়ে ভাত রান্না করলাম। গাছ থেকে লাউ শাক পেরেছি তার সাথে আলু দিয়ে নিরামিশ রান্না করেছি, দেড় কেজির মত। এ ভাতের সাথে নিরামিশ বেশী করে নিয়ে খেয়েছি। এভাবে সারা দিন কাটালাম।

উদাহরণ ৪: কৃষক জোসনা বেগম, একটি কৃষক পরিবারের খাদ্য তালিকা

নাম: জোসনা বেগম, গ্রাম: মৌসাকাটালিয়া

পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ জন

খাদ্যের নাম	সকালের খাবার	দুপুর ও রাত্রের খাবার
কচু শাক	রান্না করা প্রায় দেড় কেজি (১৫০০ গ্রাম)	
চাল		৭৫০ গ্রাম
হেলেঞ্চা ও কলমি		৭০০ গ্রাম
পেঁপে তরকারি		১০০০ গ্রাম

জোসনা বেগম বলেন, স্বাভাবিক ভাবে আমার দু বাচ্চা ও আমরা স্বামী-স্ত্রীর একদিনে দুই কেজি চালের ভাত লাগে। কিন্তু আমার হাতে এক কেজি চাল আছে। আর এক পোয়া খানেক গমের আটা আছে। এ দিয়ে আমার সারা দিন বাচ্চাদের নিয়ে খেতে হবে। এ চিন্তা করে সকালে উঠে পাশেই সবজি খেতের পালানে গিয়ে বিভিন্ন ধরণের শাক তুলি। ইছা শাক, মোরগ শাক, ন্যাটাপেটা, কলমি, হেলেঞ্চা সব মিলিয়ে দুই কেজি পরিমাণ শাক তুলছি। সব শাক ধুয়ে নিলাম। এক কেজি চালের থেকে আধা কেজি চালের ভাত রান্না করে ঐ শাক থেকে শাক ভাজি করলাম। তাতে এক কেজি থেকে সোয়া কেজির মত শাক ভাজি করা হলো। ঐ তোলা শাকের থেকে কিছু শাক রেখে দিয়ে ঘরে থাকা আটা থেকে দুই মুঠ আটা পানিতে গোলায়ে হলুদ মরিচ লবণ দিয়ে জ্বাল করে তার মধ্যে ঐ দিয়ে নাড়তে থাকি। শাক সিদ্ধ হয়ে আঠা হলে একটু তেল পিঁয়াজ দিয়ে সোম্বার দিয়ে নামিয়েছি। এ পিঠালু দেড় কেজির মত হয়েছে। ভাত খাওয়ার আগে বাচ্চাদেরসহ এ শাকের সাথে আটা দিয়ে রান্না করা পিটালু খেয়েছি। এতে ভাতের ক্ষুধা নিবারণ হয়েছে কিন্তু ভাতে তৃপ্তি হয় না। তাই অল্প অল্প করে ভাত নিয়ে ভাজি করা শাক দিয়ে খেয়েছি। দুপুরেও ঐ রান্না করা ভাত শাক ও পিঠালু খেলাম।

রাত্রে আবার ঐ আধা কেজি চালের ভাত রান্না করলাম। তার সাথে খুটে আনা আলু ও খুইরা কাটার ডাটা তুলে এক সাথে কেটেছি। তার নিরামিশ রান্না করেছি এর সাথে কিছু লাউ পাতাও দিয়েছি। এ নিরামিশ দেড় কেজির মত হয়েছে। এ খাবার রাত্রে খেয়েছিলাম। এ ভাবে বাচ্চাদের নিয়ে সারা দিন কাটালাম।

গ্রামীণ পরিবারের খাদ্যের কত অংশ কুড়িয়ে পাওয়া ?

আমরা দৈনন্দিন খাদ্যের মধ্যে কত পরিমাণ অংশ কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য থেকে আসে তা বোঝার জন্যে গ্রামের মানুষের কাছ থেকে অনেক ভাবেই জানতে চেয়েছি। গরিব, মধ্যবিত্ত এমনকি ধনী পরিবার সবার কাছ থেকেই কোন না কোনভাবে তথ্য নিয়ে জানতে চেয়েছি। তাঁদের প্রতিদিনের খাদ্যের তালিকার মধ্যে কোনটা কুড়িয়ে আনা এবং কোনটা আবাদী উৎস থেকে আনা এবং কেনা, সব তথ্যই আমরা নিয়েছি। যদিও এসব তথ্য তিনটি গবেষণা এলাকা থেকে একভাবে আসে নি। আমরা এসব তথ্য বেশীর ভাগ পেয়েছি টাঙ্গাইল থেকে। তবে আমরা আরও কয়েকভাবে বুঝতে চেষ্টা করেছি মোট খাদ্যের কত অংশ কুড়িয়ে পাওয়া উৎস থেকে আসে।

বদরখালিতে কয়েকজন নয়াকৃষির কৃষকের কাছে জানতে চেয়েছিলাম মোট খাদ্যের মধ্যে কুড়িয়ে পাওয়া কতখানি ? এ প্রশ্নের উত্তর এমনভাবে ছিল যে, এটা খুবই জানা কথা, জিজ্ঞ্যেস করার কি আছে। তবুও গবেষক হিসেবে আমরা জিজ্ঞ্যেস করলাম। এই পদ্ধতিটিও কুড়িয়ে পাওয়া। যদি খাদ্যকে চারটি ভাগে ভাগ করি তাহলে এর মধ্যে কোনটি কুড়িয়ে পাওয়া উৎস থেকে আসে আর কোনটি আবাদী কিংবা কেনা তা দেখার জন্যে ভাত, মাছ, তরিতরকারি এবং শাক, এই চারটি ভাগে দেখলাম। দেখা গেল, ভাত আবাদী বা কেনা, মাছ কুড়িয়ে পাওয়া, তরিতরকারি কেনা বা আবাদি এবং শাক কুড়িয়ে পাওয়া। গরিব পরিবার হলে ভাত ছাড়া বাকী সব কিছুই কুড়িয়ে পাওয়া হবার সম্ভাবনা থাকে, মধ্যবিত্ত এবং ধনীদের বেলায় চারটির মধ্যে একটি অর্থাৎ শাকটি কুড়িয়ে পাওয়া হবার সম্ভাবনা থাকে। সেই দিক থেকে গরিবদের বেলায় শতকরা ৫০ ভাগ খাদ্য অনায়াসে বলা যায় কুড়িয়ে পাওয়া।

ঈশ্বরদীতে বসেও একইভাবে কৃষকদের সাথে কথা বললাম। তাদেরও একই কথা। তাঁদের কথা হচ্ছে যেখানে প্রাণবৈচিত্র্য রয়েছে সেখানে শুধু আবাদী ফসলের অভাব পুরণের জন্যে নয়, কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য খেতে মজা বলেও অনেকেই শাক এবং ছোট মাছটি কুড়িয়ে এনে খায়। ধনীরা নিজে না কুড়ালেও অন্য কিছুর বিনিময়ে কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য নেয়। অর্থাৎ আবাদ করা ফসল নয়, অনাবাদী ফসলই মানুষের খাদ্য যোগাতে বড় ধরণের ভূমিকা রাখে।

সবকিছু মিলিয়ে দেখা যায় আবাদী এবং অনাবাদি উৎস থেকে পাওয়া খাদ্যের ব্যবহার দেখতে গেলে কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যই শতকরা ৫০ ভাগ কিংবা কম করে হলেও প্রায় ৪০% । তবে ধনী পরিবারে এর সংখ্যা কম।

সারা বছর কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের ওপর নির্ভরশীলতা

কুড়িয়ে পাওয়া শাক শুধু গরিব মানুষের খাদ্য নয়, সবার খাদ্য। এর প্রাপ্তি, আবাদী ফসলের সাথে এর সম্পর্ক এবং খাদ্য গুণাগুণ সম্পর্কে জ্ঞান যেখানে যেভাবে জানা আছে সেইভাবে কুড়িয়ে পাওয়া শাক ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু যারা গরিব, যাদের কোন আবাদী জমি নেই তারা কিসের ওপর বেঁচে থাকেন ? আশ্চর্য হয়ে আমরা দেখি যে কুড়িয়ে পাওয়া উৎস থেকেই তাদের খাদ্যের প্রয়োজন মেটান। বাংলাদেশে প্রচুর বৈচিত্র্য আছে। প্রচুর গাছপালা, লতাগুল্ম আছে। পানিতেও প্রচুর উদ্ভিদ আছে যা খাদ্য হিশেবে কাজে লাগে। আমরা তথ্য নিয়ে দেখেছি গরিব পরিবারের অধিকাংশ মানুষ কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য থেকে নিজেদের খাবার প্রয়োজন মেটান। আবার এগুলো বিনিময় করে কিংবা বিক্রি করে অন্য প্রয়োজন মেটান। এই গবেষণাটি বিশেষভাবে কুড়িয়ে পাওয়া শাক কেন্দ্রীক অর্থাৎ শুধুমাত্র পাতা এবং ডগা ব্যবহারকেই আমরা দেখছি। কিন্তু গাছ-গাছালির অন্যান্য অংশ যেমন ফল, শেকড় ইত্যাদিও খাদ্য হিশেবে ব্যবহার হয়। এই গবেষণার আওতায় সেগুলো দেখা সম্ভব হয় নি। তবে আমরা এখানে দু'একটি পরিবারের বছরব্যাপী কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের ওপর নির্ভরশীলতার উদাহরণ তুলে ধরছি। এর মধ্যে শাকের গুরুত্ব অনেকখানি আছে।

কয়েকটি গরিব পরিবারের কথা

রহিমা বেগম

টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার থানার আটিয়া ইউনিয়নের মৌসাকাঠালিয়া গ্রামে রহিমা বেগমের বাড়ি। পরিবারের সদস্য সংখ্যা তিন জন। তার কোন জমা-জমি নাই। বসতবাড়ি ১৪ শতাংশ তারমধ্যে দোচালা একটি ঘর আছে। এর পাশাপাশি বাড়িতে শাক সবজির গাছ বুনেন। হাঁস-মুরগিও পালন করে থাকে। তার এ বসত বাড়িও কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের ওপর নির্ভর করে।

বৈশাখ মাস

বাড়িতে তরিতরকারি গাছ লাগিয়েছেন। তার তরকারি শস্য, চিনতন্ বিক্রি করে। হাঁসের ডিম, মুরগির ডিম বিক্রি করে এক সপ্তাহের জন্য চার কেজি চাল আনে। এসব বিক্রি করে এক সাথে চাল কিনে আনে। আবার এক মুট লতি বিক্রি করে এক কেজি লবণ কিনে আনে। এ লবণ এক মাস নাগাদ খাবে। বাড়িতে চারটি ধান মরিচ আছে তার মরিচ নিজেরা খাবে আবার বিক্রি করে তেল, পিঁয়াজ কিনে আনে। আবার ১৫ দিন পর রসুন কিনে আনে। হাঁস পালে তার জন্য চক থেকে ছোট বড় শামুক কুড়িয়ে আনে তা হাঁসকে খাওয়াবে। তারপর হাঁসে ডিম পারে, সে ডিম বিক্রি করে থাকে। মুরগির জন্য কলার মোচা কুড়িয়ে এনে পাড়ায় এক ধনী বাড়িতে দিয়ে, সেই বাড়ি থেকে খুদ এনে মুরগিকে খাওয়াবে। আবার বাড়িতে বেগুন গাছ আছে। তা এক বাড়িতে দিলে তারা হয়ত এক বেলার খাওয়ার চাল দেয় তা দিয়ে দিন কাটায়। হেঞ্চি শাক, ন্যাটাপেটা, কচু শাক, লতি শাক, মৌলুবী কচুর ডাইগা–পাতা এসব খেয়ে থাকে। পাট শাক, সাজনা পাতা এসব ভাজি, ভর্তা খেয়ে থাকে। অনেক সময় নাতী আছে পাগারে ছোট মাছ মেরে আনে তাও হয়ত মাসে দু'একদিন ধরে আনে তা খেয়ে থাকে। অন্যের ক্ষেতের থেকে আলু তুলে নিয়েছে। তারপর সে ক্ষেতের মধ্য থেকে বিলাতী আলু কুড়িয়ে এনে তা খেয়ে থাকে। গম, পায়রাও এভাবে অন্যের ক্ষেত থেকে কুড়িয়ে এনেছিল চৈত্র মাসে তার থেকে আটা করে রুটি করে খেয়ে থাকে। মাস কলাই, কালি কলইও এভাবে কুড়িয়ে এনে রেখেছেন তাও খেয়ে থাকে। জঙ্গল থেকে বিভিন্ন গাছ পালার পাতা ও বাঁশ পাতা কুড়িয়ে এনে ব্যবহার করে। আবার কলার ফ্যাতরা কুড়িয়ে আনে। জঙ্গল কাটে যেমন, বিভিন্ন ছোট ছোট গাছ, আগড়া, বিষ কাটালী, ঢোল কলমী কেটে এনে শুকিয়ে চুলায় জ্বাল দেয়।

জ্যৈষ্ঠ মাস

বাড়িতে তরকারি গাছ আছে তারা তা থেকে তরকারি বিক্রি করে চাল কিনে। কলমি শাক বিক্রি করে লবণ, তেল কিনে আনে। আবার লতি বিক্রি করে ডাল কিনে আনে, মরিচ বিক্রি করে পেঁয়াজ, রসুন কিনে আনে। এসব দিয়ে মাস খাবে। নিজেরা কলমী শাক, হেলেঞ্চা, ন্যাটাপেটা, দণ্ডকলস, তেলাকচু, খারকন, কচু শাক তুলে খায়। পাটশলা কুড়িয়ে এনে কেরোসিন কিনে পোড়ায়। ইরি ধান কুড়িয়ে আনে, ছেই খুইটা এনে নিজেদের খাবারের চাল তৈরি করে। জমি থেকে ঝাড়ু দিয়ে কুড়িয়ে আনে। শাপলা তুলে বিক্রি করে চাল আনে আবার নিজেরা খেয়েও থাকে। কচুর লতি তুলে বিক্রি করে বা কাউকে দিয়ে চাল আনবে। সে চাল খাবে। হাঁস মুরগির জন্য খাদ্য কুড়িয়ে আনে হাঁসের জন্য শামুক কুড়িয়ে আনে। মুরগি চকের ধান ও পোকা মাকর খুটে খাবে। এ সময় ডিম বিক্রি করে টাকা জমা করে। এ টাকা দিয়ে পরার কাপড় নিবে।

এ সময় ইরি ধান কাটে তা কুড়িয়ে এনে খায় ও জমা করে তাই ডিম বিক্রি করে কাপড় নিতে পারে। ঘরে একজন এ মাসে কাপড় নিবে। খড়ির জন্য জমি থেকে নাড়া কুড়িয়ে আনে। ধানের হুগলা বা চিটা কুড়িয়ে এনে জ্বাল দিবে। কুশালের (আঁখ) পাতা কুড়িয়ে আনে এসব জ্বালানী হিশেবে পড়াবে। আম, কাঁঠাল, জাম, ডইয়া, খেজুর, ড্যাফল, লেচু এসব ফলও কুড়িয়ে এনে খায়। কাঁঠালের বীচি কুড়িয়ে এনে খায়। আগের খুইটা রাখা কলই ও ভেজে খায়।

আষাঢ় মাস

আমন ধানের ক্ষেতের থেকে ঝরা ধান কুড়িয়ে এনে সিদ্ধ শুকনা করে ভাত খায়। এ মাসে খেয়ে আবার অন্য মাসেও খেতে পারে। শাপলা, কলমী শাক তুলে নিজেরা খাবে ও বিক্রি করে তেল, লবণ কিনবে। আবার তোলা শাক বিক্রি করে পেঁয়াজ কিনে আনবে। বাড়ির তরিতরকারি বিক্রি করে হাতে কিছু টাকাও রাখতে পারে। নিজেদের খাবারেও সমস্যা হয় না।

এ মাসে প্রচুর শাক, সবজি হতে থাকে নিজেরা খায়, ইষ্টি বা আত্মীয় বাড়ি দিবে এবং বিক্রিও করতে পারে। এ মাসে বরসি ফেলে মাছ ধরে, ধর্মজ্বাল ফেলেও মাছ ধরে খায়। মাছ কখনও কিনে খাবে না মাছ মেরে এক ধনী বাড়ি দিয়ে চাল এনেও খায়। কাউনের ইঞ্চা, তিলের মোতা, কুশলের পাতা, তিলের ডাটি, কলার ফ্যাতরা জঙ্গল কেটে শুকিয়ে জ্বালানি হিশেবে ব্যবহার করে থাকে। এ মাসে ভাসা কলমি, হেলেঞ্চা, হেঞ্চি, ন্যাটাপেটা, গাঁঙ্গ কলা, ডুরডুইলা এনে খায়। কচু শাক ও কুড়িয়ে এনে খায়। কুড়িয়ে আনা পায়রা, গম, ডাল আষাঢ় মাসে এগুলো ঘরে বসে খায়। মিঠা আলুর ক্ষেত থেকে আলু তোলার পরও ক্ষেতে আষাঢ় মাসে আমন ধানের হালী ফালানোর পর যদি ক্ষেতে আলু থাকে তখন আলু কুশি বা গাছ উঠলে ঐ কুশি দেখে আলু খুইটা আনে।

শ্রাবণ মাস

শাপলা শালুক তুলে খাবে। এ মাসে দু'এক বেলা শালুক খেয়ে থাকে কুড়িয়ে আনা থাকে এটাও খেয়ে থাকে। তরিতরকারি বিক্রি করেও তেল লবণ, পিঁয়াজ কিনে আনে। কচুরলতি বিক্রি করে ঢেঁকিশাক ভাসা কলমী কুড়িয়ে আনে, শাপলা শালুক মরিচ এসব বিক্রি করে। হাঁসের খাদ্যের জন্য শামুক তুলে এনে খাওয়ায় তাতে হাঁসে ডিম পাড়ে। এ ডিম, তরকারি বিক্রি করে হাতে রাখে কখনও কোন বিপদ আসে। সে জন্য হাতে টাকা রেখে দেয়। পাট ক্ষেত থেকে বাদু পাট ছিড়ে ফেলে দেয় তা কুড়িয়ে এনে শুকিয়ে জ্বাল দেয়। ঢেঁরস গাছ বুড়া হয়ে যায় তা কেটে শুকিয়ে জ্বাল দেয়। জঙ্গল কেটে গাছের শুকনা ডাল ভেঙ্গে এনে জ্বাল দেয়। কলার ফ্যাতরা কেটে আনে বাঁশের মাথার কোটা বেঁধে গাছের ডাল ভেঙ্গে এনে জ্বাল দেয়। এ মাসে মাছ মেরে এনে নিজেরা খেয়ে বিক্রি করে। এ সময় প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। এ মাসে মাছের পরিমাণে বেশী খাবে। টাটকা মাছ মেরে খাবে। মাছ, তরকারি, শাক-পাতা ও হাঁস মুরগির ডিম বিক্রি করে হাতে কিছু টাকা পয়সা করবে পরিবারে অন্য একজন

সদস্যর পড়নের কাপড় নিবে। এ মাসে আউশ ধান কাটে সে ক্ষেত থেকে ধান খুইটা আনে। এ ধান থেকে দুই মাস ভাত খাবে।

ভাদ্র মাস

এ মাসে আউশ ধান খুইটা আনে। আবার অন্যের বাড়ি কাজ করে, ধান কাটা শেষ হলে ধান তোলার কাজ করে। তখন সে বাড়ি থেকে ধান দিবে। আবার নিজ বাড়িতে রান্নার জন্য খদ কুটা আনবে। আখ কেটে এ মাসে ভাঙ্গিয়ে গুড় তৈরি করে। ধনী বাড়ির মানুষের আখ ভাঙ্গানোর কাজে সহায়তা করলে আখের ছোবা জ্বাল দেওয়ার জন্য আনে। আবার আখ ভাঙ্গানোর কাজে সহায়তা করলে টাকাও দেয়। এ মাসে তাল কুড়িয়ে এনেও নিজেরা খেয়ে থাকে। আখের মাথা বা চারা হাটে বেচে দিলেও টাকা দেয় এসব করে টাকা হাতে জমায়। এ মাসে শাপলা, শালুক, মাছ এসব ধরে বা তুলে বিক্রি করবে। আবার বাজারেই বিক্রি করে চাল দরকার হলে আনবে। কেরোসিন, সরিষার তেল, লবণ, পেঁয়াজ, হলুদ, রসুন কিনে আনে।

ঢেঁকিশাক, কলমি শাক বিক্রি করে বাজার এনে খেয়ে থাকে। আবার বাড়ির তরিতরকারি বিক্রি করে নারিকেল তেল ও সাবান কিনে থাকে। বাড়িতে বেগুন গাছ আছে তারা বেগুন বিক্রি করে মুরগির বাচ্চারে খাওয়াবে। হাঁসের খাবারে জন্য শামুক কুড়িয়ে আনে।

আশ্বিন মাস

শাপলা, শালুক, ডেপ, গেচু, মাছ এসব কুড়িয়ে খাবে। ডেপ শুকিয়ে চাল করে ভাত খাবে। নাড়ু তৈরি করে খাবে। দু'এক বেলা শালুক সিদ্ধ করে খাবে। মাছ শুঁটকি করে রাখবে পরে কাঁচা মাছ পাওয়া যায় না তখন শুঁটকি মাছ খাবে। কলমি শাক বিক্রি করে চাল বা ডাল কিনে খাবে। বাড়ির তরকারি গাছের তরকারি বিক্রি করে চাল কিনে আনবে, মরিচ গাছ থেকে মরিচ বিক্রি করে লবণ তেল আনবে। কচুর লতি বিক্রি করে সাবান, সোডা আনবে। আবার পান, সুপারি খাদ্য তাও শাক পাতা বিক্রি করে খায়। হেলেঞ্চা, কলমি ও ঢেঁকি শাক দু'তিন দিন তুলে বিক্রি করে চাল কিনে আনে। ঘরে কাঁঠালের বিচি কুড়িয়ে রেখেছিল তার ভর্তা করে খায় আবার টাইলাও শুকনা খাবে। জ্বালানী হিশেবে পাটখড়ি কুড়িয়ে আনে, আখের পাতা আনবে, আখের ছোবাও কুড়িয়ে আনবে। আঁখ ভাঙ্গানোর সাথে কাজ করে ছোবা আনে তা দিয়ে জ্বাল দেয়। আঁখ ভাঙ্গানোর অন্যের সাথে কাজ করে দিলে টাকা দেয় তা দিয়েও বাজার-সদায় করে খায়। এ সময় ওষুধী গাছের গুণ জানা থাকলে তা আবার মনে করেন। তবে ওষুধী গুণ বেশীদিন থাকে বা বেশী কার্যকর হয়।

কার্তিক মাস

এ মাসে ছোট ছোট মাছ বেশী পাওয়া যায় তা ধরে খাবে ও বিক্রি করে চাল কিনে আনে। শাপলা, শালুক, ঢেপ তুলে আনে, বিক্রি করবে ও খাবে। এ দিয়ে তিল, লবণ, হলুদও কিনে আনবে। ঝরা ধান, আমন ধান ক্ষেত থেকে তুলে আনবে। তা থেকে ভাত করে থাবে। ঢেপের ভাত খাবে। শালুক সিদ্ধ করে খাবে। কামলা দিবে। তার থেকে টাকা দিয়ে চাল কিনবে, বাজার করবে। হাঁস, মুগির জন্য শামুক খুটে আনে তা খাওয়ায়। এ সময় হাঁস মুরগিতে ডিম দেয়। হাঁসে বেশী ডিম দেয় তা বিক্রি করে চালও বাজার করে খাবে। জ্বালানীর জন্য পাটখড়ি, অন্যের বাড়ির পাট বেছে দিলে তারা খড়ি দেয়। সে খড়ি দিয়ে জ্বাল দেয় আখের মোতা মরা আখ, আখের ছোবা এসব ব্যবহার করে থাকে।

অগ্রহায়ণ মাস

এ মাসে নতুন ধান কাটে। সে ধানের মোথা জমি থেকে কুড়িয়ে আনে। চেইটার মোথা ও গোট তুলে আনে এতে চেইটার চাল হয়। তা দিয়ে খুই ভেজে খায়। ইঁদুরের গর্তে থেকেও ধান তুলে আনে, মাটির থেকেও ঝাড়ু দিয়ে ধান আনে, তা সিদ্ধ করে শুকনা করে রেখে দেয়। এ ধানের চাল পরেও খায়। এ ভাবে কুড়িয়ে তিন চার মণ ধান পায়। এ চালও চার পাঁচ মাস ধরে খেতে পারে। এ মাসে নতুন নতুন শাক পাওয়া যায়। বতুয়া শাক তুলে

বিক্রি করে বাজার সদায় করবে। এ মাসে চাল কিনবে শুধু ডাল, তেল, লবণ হলুদ কিনবে। সাথে সাবান সোডাও কিনে আনবে। এ মাসে নিজেরাও বিভিন্ন ধরণের শাক খাবে। ন্যাটাপেটা, বতুয়া, দণ্ড কলস এরকম অনেক শাক খেয়ে থাকে। জলপাই খুটে এনে টক খাবে? কামরাঙ্গা ভাজি খাবে। বরইও খুটে এনে খেয়ে থাকে। এ মাসে ধানের নারা কুড়িয়ে এনে রেখে দিবে, সে নারা চার মাস নাগাদ জ্বাল দিবে। আবার এ নারা বিক্রি করে টাকা রেখে দেয়। চৈত্র মাসে কাপড় চোপড় সস্তা থাকে তখন সবাই পরণের কাপড়, জামা, ছায়া, বাচ্চাদের কাপড় নিবে। তাই তারা বছরের সব সময় কাপড় চোপড় নিবে না।

পৌষ মাস

কুড়িয়ে আনা ধানের ভাত খাবে। তার পাশাপাশি আগের শুটকি মাছ করা ছিল তা খেয়ে থাকে। মূলা, গোল আলু কুড়িয়ে এনে তা দিয়ে খাবে। বাড়িতে তরকারির গাছ, গাছের তরকারি খাবে। আবার তরকারি বিক্রি করে বাজার করে পুদিনা, মূলা শাক কুড়িয়ে এনে খাবে। ধনী কৃষকদের আলু তুলে দিলে তারা আলু দেয়, এভাবে আলু তুলে বিক্রি করে তেল, লবণ, হলুদ, পেঁয়াজ, কিনে আনে। সরিষা শাক তুলে খাবে ও বিক্রি করবে। খেসারি শাকও তুলে এনে খাবে ও বিক্রি করবে। আবার বাড়ির তরকারী বিক্রি করে কেরোসিন, নারিকেল তেল ও সোডা, সাবান কিনে আনে। এ মাসে ধানের নারা কুড়িয়ে আনে আবার ধানের মোতাও তুলে আনে এগুলো দিয়ে জ্বাল দেয়। আবার বাঁশের পাতা ও গাছের পাতা ঝাড়ু দিয়ে এনে জ্বাল দেয়।

মাঘ মাস

গোল আলু কুড়িয়ে এনে বিক্রি করবে, নিজেরা খাবে। আলু বিক্রি করে বাজার করবে। এ মাসে কুড়িয়ে পাওয়া শাক ও মাস কলই ডাল দিয়ে খিচুড়ি খাবে। সরিষা কুড়িয়ে এনে রেখে দেয়, ভর্তা খাওয়ার জন্য আবার তেল ও তৈরি করে খাবে। মাস কলাই কুড়িয়ে এনে খায় আবার রেখেও দেয় পরে খাওয়ার জন্য। বতুয়া, হেঞ্চি, গিমা, ন্যাটাপেটা এসব ধরণের শাক তুলে খেয়ে থাকে। খেসারী, মটর ও ছোলা শাক তুলে খাবে তারপর বিক্রি করে বাজার করবে। তেল, লবণ, পেঁয়াজ, হলুদ কিনবে। ঘরে শুটকী থাকে তা দিয়েও মূলা, আলু দিয়ে, তরকারি খায়। আবার গাছের মিষ্টি কুমড়া ও লাউও খেয়ে থাকে। বাঁশ পাতা, নারা, আঁখ গোড়া, গাছের পাতা এসব কুড়িয়ে এনে জ্বাল দেয়। আবার গাছের ডাল পালা কুড়িয়ে বিক্রি করে থাকে। সরিষার ভুষি কুড়িয়ে আনে।

ফাল্গুন মাস

মরা বাঁশ, কুশারের গোড়া, খেসারি, সরিষা, ছোলা এসবের ভুসি কুড়িয়ে রেখে দেয় তা দিয়ে জ্বাল দেয়, আবার বিক্রি করে চাল কিনে আনে। কচুরমুখী তুলে পাশের বাড়ি দিলে হয়তো খুদ দেয় বা চাল দেয়। খুদও ভাত রান্না করে খাবে। শাক পাতা তুলে নিজেরা খাবে। কচুরমুখী দিয়ে ডাল রান্না করে খায়। এ মাসে কিছু চাল ঘরে থাকে, তাছাড়া মানুষ গম কাটে তারা কুড়িয়ে এনে রুটি করে খাবে। জ্বালানীর জন্য গমের ডাটি কুড়িয়ে আনে। এই ডাটি দিয়ে ঘরের বেড়া দেয়। আবার পাট খড়ি এনেও বেড়া দেয়। এ মাসে হাঁস মুরগী বেশী ডিম দেয় না। এ সময় হাঁস মুরগীর দাম খুব বেশী থাকে। তাই হাঁস মুরগি বিক্রি করে এবং কিছু টাকা হাতে রাখে। এ মাসে খেসারি, মটর, কলই, হাল ক্ষেতে আলু খুটে আনে। হাল ক্ষেতে গেচু, হালুক, শামুক কুড়িয়ে আনে। শামুক এনে বিক্রি করে আবার হাস মুরগীরেও খাওয়ায়। শামুক বিক্রি করেও বাজার করতে পারে।

চৈত্র মাস

জমির ক্ষেতে আলু খুটে, ঘেচু ও শামুক খুটে আনে। এ শামুক বিক্রি করে আবার চাল আনে। ঝিনুক ও খুটে হাসেরে খাওয়ায়। শামুকের খোলা একসাথে করে বিক্রি করে, তা দিয়ে হয়ত পান সুপারি বা সাবান, সোডা কিনে। ধনী বাড়িতে এক ঝুড়ি শামুক দিলে দেড় কেজি চাল দিবে। এভাবে সংসার চালায়। গমের মোতা ধানের গোছা, খেসারী, মটর, সরিষায় ভুসি কুড়িয়ে এনে জ্বাল দেয়। মিষ্টি আলু কুড়িয়ে আনে তার তরকারী ও সিদ্ধ করে খায় এবং বিক্রি করে বাজার আনে।

আছিয়া বেওয়া

টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার থানার আটিয়া ইউনিয়নের কান্দাপাড়া গ্রামের আছিয়া বেওয়ার বাড়ি। স্বামী নেই, আট বছর আগে স্বামী মারা গেছে। স্বামী মারা যাওয়ার সময় তিন ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছে। বড় মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি। তারপর ছেলেকে তাঁতের কাজে দিয়েছি। আর ছোট দুই বাচ্চা মাঝে মাঝে স্কুলে যায় আর সারা বছর কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য আমার সাথে কুড়িয়ে আনে। চকে কোন জমি নাই। ১০ শতাংশ জমির উপর বাড়ি করে থাকছি।

বড় ছেলের বয়স ১৬ বছর তাঁতের কাজ করে। ২য় ছেলের বয়স ১২ বছর কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য সংগ্রহ করে। ৩য় ছেলের বয়স ৭ বছর কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্য সংগ্রহ করে।

স্বামী মারা যাওয়ার আগে বেশ কিছু দিন অসুস্থ্য ছিল কোন কাজ করতে পারে নি। তার চিকিৎসা করতে হয়েছে। তখন ছেলে কাজ করতে পারে নি। ঐ সময় অনেক টাকা ঋণ হয়েছে, ঋণের টাকা শোধ করতে পারি নাই। তারপর বুরো ব্যাংকে নাম দিয়ে টাকা তুলে মানুষের কিছু কিছু ঋণের টাকা শোধ করে। এভাবে বুরো ব্যাংকে বর্তমানে ১২ হাজার টাকা ঋণ হয়েছে। সে ঋণের কিস্তি দিতে হয়। ছেলে তাঁতের কাজ করে সে কিস্তি দিতেছে। আর আমি নিজে কাজ করে নানা ভাবে সংসার চালাচ্ছি।

বসত বাড়িতে বিভিন্ন গাছপালা আছে। বাড়িতে তরকারি গাছও আছে।

নারিকেল গাছ - ১টা

আম গাছ - ১৫টা

পিতরাজ গাছ - ২টা

বাঁশ ছোপ- ২টা

তরকারি গাছের মধ্যে চিনতন কুমড়া, দুরমা গাছ বুনছি। তরকারি গাছে ধরছে। দশটা মোরগ মুরগী ছিল আর ৪টা হাঁস ছিল। কিন্তু কয়েক দিন আগে খোয়ারের মধ্যে ৮টা মুরগী মরে ছিল। বর্তমানে একটা মোরগ ও একটা মুরগী আছে। আর ৪টা হাঁস আছে।

তারা চার জন সদস্য দু'বেলা রান্না করে খায়। ভাত দু'বেলা খাই। বড় ছেলে ও আমি দু'বেলা খাই ছোট দুই ছেলের জন্য অল্প রেখে দেই তা তারা দুপুরে খায়।

প্রত্যেক মাসে আমি কি কাজ করে সংসার চালাচ্ছি তা মাস ধরে ধরে বলছি। আশিয়া বেওয়া তার বার মাসের হিসাব বলতে যেয়ে প্রথম মাস শুরু করে আষাঢ় মাস থেকে।

আষাঢ় মাস

এ মাসে শাপলা, শালুক, কলমি, ঢেঁকি শাক, হেঞ্চি, হেলেঞ্চা, কচু, লতি এসব তুলে খেয়ে থাকি মাছের মধ্যে মলা, চান্দা, খৈলসা, ইছা, টাকি, বাচা এসব মাছ মেজ ছেলে চালা নিয়ে চক থেকে ধরে আনে। হাঁসের জন্য শামুক খুটে আনে। শামুক এনে অন্যের বাড়ি দিয়ে এক বেলা ভাত খেয়ে আসে। এ মাসে খুটে আনা ধানের ভাত খাব। কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে কুশালের মোতা খুটে আনি তা পালা দিয়ে রেখে দেয়া হয়। এ মোতা এ মাসে মোতা বিক্রি করে এক হাজার টাকা। এ টাকা দিয়ে চাল কিনে খাবো। আবার টাকা হাতে রেখে দিব। কলমি শাক, ঢেঁকি শাক, শাপলা তুলে বিক্রি করি। এ দিয়ে হলুদ কিছু কিনব, সরিষার তেল, লবণ, মরিচ ও পেঁয়াজ কিনবো। হাতের টাকা দিয়ে কেরোসিন কিনবো, ধনী মহিলাদের মাথায় তেল দিতে ডাকে, তাদের মাথায় তেল দিয়ে দিলে সে তেল মাখার জন্য দেয়। এ তেলে তার সারা মাস যাবে। আর তেল কিনবে না। বাড়ির গাছের তরকারি খাবে। হাঁসের ডিম বিক্রি করে টাকা দিয়ে ছোট ছেলেকে একটা প্যান্ট ও মেজ ছেলেকে একটা লুঙ্গি

কিনে দিয়েছে। বাচ্চারা অন্যের বাড়ি থেকে দু'একটা খেজুর ও জাম খুটে খেয়েছে। আম বাড়ির গাছের খেয়েছে। উবিনীগের মিটিংয়ে এসে কাঁঠাল দিয়েছে তা খেয়েছি।

শ্রাবণ মাস

এ মাসে শাপলা, শালুক, কলমি শাক, ঢেঁকি শাক, হেঞ্চি, হেলেঞ্চা, কচু, লতি, চিনতন, দুরমা, লাউ শাক এসব শাক কুড়িয়ে খাব। শালুক খুটে এনে দুপুরে খাই। অনেক দিন শেষ বেলায়ও খেয়ে থাকি। অন্যের কাপড় চোপড় ধুয়ে দিলে এক বেলা খাবার দেয়। দুপুরে অনেক সময় অন্যের কাজ করে খেয়ে থাকি। খুটে আনা ধানের ভাত ও চাল খাই আবার কিনেও খাই। শামুক খুটে এনে হাঁসের জন্য, আবার শামুক খুটে এনে গর্ত করে রেখে দেয়।

শাপলা, কলমি শাক তুলে বাজারে নিয়ে বিক্রি করে হলুদ, লবণ কিনবে। ডিম বিক্রি করে সাবান, নারিকেল তেল কিনবে। আবার শাপলা, কলমি বিক্রি করে মরিচ, তেল, পেঁয়াজ কিনবে। অনেক সময় হলুদ, পেঁয়াজ না থাকলে না খেয়ে থাকি।

ছোট মাছঃ মাঝে মাঝে বরশিতে দু' একটা বড় মাছ উঠে, তা খেয়েছি। মলা, ঢেলা, খৈলসা, পুঁটি, টেংরা, শোল, টাকি, নুরা এসব মাছ খেয়ে থাকি। কিনে খেতে পারি না তবে বাচ্চারা যা মেরে আনে তা খাই।

এ মাসে ৫০০ টাকার গোবরের ঘসি বিক্রি করেছি। রোদ দেখে গোবর খুটে এনে ঘসি ভেঙ্গে শুকিয়ে রাখছি। আবার কার্তিক মাস থেকে চৈত্র, বৈশাখ মাস পর্যন্ত গোবর খুটে ঘসি দেই তা জরো করে রেখে শ্রাবণ মাসে যখন খড়ির অভাব হয় তখন বিক্রি করেছি।

ছেলে তাঁতের কাজ করে হয়তো দু'একদিন আম কিনে নিবে তা বাচ্চাদের নিয়ে খাব। পাশের বাড়ি অনেক কাঁঠাল তার থেকে আমার বাচ্চাদের জন্য কাঁঠাল দিয়েছে তা খেয়েছি। বাচ্চারা পেয়ারা খুটে খাবে। পেয়ারা ও কামরাঙ্গা খুটে খাবে।

ভাদ্র মাস

হেলেঞ্চা, ঢেঁকি শাক, কচুর শাক, পানার পুল, পিপুল পাতা, তেলাকুচা, চিনতন, দুরমা, শাপলা, কলমি, শালুক কুড়িয়ে এনে খাবো। গত মাসের খড়ি বিক্রির টাকা আছে তা দিয়ে কিছু চাল কিনবো। শামুক খুটে এনে একে ঝুড়ি ৫ টাকা বিক্রি করি। এভাবে বিক্রি করে দুই কেজি চাল কিনতে পারি। আবার শালুক খুটে খেয়েও এক বেলা কাটাই।

মাছ মেরে এনে খাবো। টেংরা, রাঘা, টাকি, কৈ, খৈলসা, বাইম, ভূতকইয়া এসব মাছ মেরে আনে তা খাবো। আবার বরশি দিয়ে শোল, টাকি, মাগুর, শিং, নুরা এসব মাছ খাব। বাড়ির তরকারি নিজেরা খাব।

এ মাসে শাপলা, শালুক, কলমি শাক তুলে বিক্রি করে তেল, লবণ, মরিচ কিনবো। ডিম বিক্রি করে সাবান ও হলুদ, পেঁয়াজ কিনবে। টাকা না হলে মাঝে মাঝে হলুদ ও পেঁয়াজ খাবে না। রসুন কিনে খেতে পারে না। তাই না খেয়ে থাকি। ঢ্যাপের চাল তৈরী করে ভাত রান্না করে খাবো। ডিম বিক্রি করেও চাল কিনে খাবো।

ধনী বাড়ির ঘর লেপে দিয়ে আসলে দেড় কেজি চাল দেয় ও এক বেলা খেতে দেয়। সে চাল দিয়ে দু'দিন খেতে পারি। ধনী বাড়ি ঘর লেপে দেই তা দিয়েও চলি। ভাদ্র মাসে আউশ ধান কাটে তা মলন দিয়ে দেই তাতে ভাত খেতে দেয়। অনেক সময় এক বেলা বাচ্চাদের নিয়ে ভাত খাওয়ার চালও দেয়।

এ মাসে কুশালের পাতা খুটে এনে রেখে দেই পরে জ্বাল দেয়ার জন্য আবার নিজে জ্বালও দেই।

আশ্বিন মাস

এ মাসে নতুন ন্যাটাপেটা শাক হবে তার সাথে বন পুঁই, বাজরা কাটা, খুইরা কাটা, চাট কলমি, লতা কলমি শাক তুলে খেয়ে থাকি। আবার বাড়ির গাছের চিনতন, দুরমা শাক খেয়ে থাকি। তেলাকুচা পাতা, পিপুল পাতা

পচা মাছে দিয়ে রান্না করি। তেলাকুচা পাতার মরিচ বাটা খাই। শাপলা, শালুক খুটে খাবে। মাছের মধ্যে মলা, ডেলা, পুঁটি, খৈলসা, কৈ বাচ্চা, ভূত কইয়া, বাইম, টাকি, বাঘা এসব মাছ চক থেকে মেরে আনে তা খাই। শামুক খুটে এনে অন্যের বাড়ি দিলে টাকা ও চাল এনে থাকি তা হয়তো এক বেলা খাব।

এ মাসে ধনী বাড়ির ঘরের ডুয়া বেঁধে দিলে তিন বেলা খাওয়াবে ও একটা পরনের দুইশত ও আড়াই শত টাকা দিয়ে শাড়ি দিবে। শামুক খুটে হাঁসেরে খাওয়াবে সে হাঁসের ডিম বিক্রি করে বাজার করে, তেল, লবণ, মরিচ, পেঁয়াজ, হলুদ কিনে আনবে।

এ মাসে বাচ্চারা জলপাই অন্যের বাড়ি থেকে খুটে এনে খাবে। আঁখ ক্ষেতে কাজ করবো। কুশাল ছাইটা দিলে টাকা দেয়। আবার কুশালের পাতা জ্বাল দিতে আনি। এ সময় পাতা এনে পালা দিয়ে রাখি সারা বছরের জন্য। ডিম বিক্রি করে, কুশাল ছাইটা টাকা পায় তা দিয়ে ছোট ছেলেকে একটা প্যান্ট, জামা ও ব্লাউজ নেই।

ঢ্যাপ এনে সিদ্ধ ও শুকনা করে চাল বের করে। ঢ্যাপের চালের ভাত খাবে।

কার্তিক মাস

এ মাসে শীত শুরু হয় এবং নতুন শাক পাতা পাওয়া যায়। দুধ কলমি, দণ্ড কলস, বাজরা কাটা, ন্যাটাপেটা, মোরগ শাক, শুষনী শাক, খুইরা কাটা এসব শাক তুলে খাবো। দণ্ড কলস শাকে মরিচ বাটা ও ভাতে সিদ্ধ করে ভর্তা করে খাব। হাঁসের শামুক খুটে আনে। শালুক ও ঢ্যাপ খুটে আনে শালুক সিদ্ধ করে খায়। ঢ্যাপ সিদ্ধ শুকনা করে ঢেঁকিতে চাল করে খাব। আমন ধানের ক্ষেত থেকে ঝরা ধান ছিড়ে আনবে। আবার আমন ধান কাটার পর ধান কুড়িয়ে আনবো। এ ধানের চাল তৈরী করে খাব। ধনী বাড়ির ঘর তৈরী করার পর ঘরে ডুয়া দুই তিন ধরে বেঁধে দিবে এবং তিন বেলা খেয়েও ২৫০/৩০০ টাকা দিবে বা এ টাকার মধ্যে কাপড় কিনে দিবে। এভাবে কাজ করে কাপড় পাই। বাচ্চারা ধান খুটে সে ধান বিক্রি করেও বাচ্চাদের কাপড় কিনে দেই। চকের থেকে নাড়া এনে পালা দিয়ে রাখি রান্না করার জন্য। হাঁসের জন্য শামুক খুটে আনবে। হাঁসের ডিম বিক্রি করে সাবান, তেল, লবণ, মরিচ, হলুদ এসব কিনে খাব।

অগ্রহায়ণ মাস

এ মাসে প্রচুর শাক পাতা পাওয়া যায়। বতুয়া শাক, হেঞ্চি, বাজরা কাটা, ন্যাটাপেটা, খ্যাতাপেটা, শুষনী, লাউ শাক, মিষ্টি কুমড়া শাক, দণ্ড কলস, তেলাকুচা পাতা, সাজনা পাতা এসব শাক তুলে খাব এবং বতুয়া শাক তুলে এক বাড়ি দিয়ে আসলে, কিছু চাল দেয় তাও খাই। এ মাসে মুরগীর জন্য খাবার দিতে হয় না। হাঁসও ধান খুটে খায়। তবে অন্যের বাড়ি চাল ঝেরে কুড়া আনলে তা খাওয়াই। আবার এ মাসে চকের থেকে আমন ধান কাটার পর সে ক্ষেত থেকে আমন ধান খুটে আনি। চকে ইঁদুরের গর্ত থেকেও ধান খুটে আনি। এ ধানের ভাত খাবো, আলু খুটে এনে খেয়ে থাকি।

হাঁসের ডিম বিক্রি করলে লবণ, তেল কিনে থাকি। পেঁয়াজ না থাকলে না খেয়ে থাকি। অন্যের বাড়িতে একজনকে তেল দিয়ে দেই সে হয়তো এক কোষ তেল দেয় তা দিলে আর সারা মাসে তেল দেই না। ছেলে তাঁতের কাজ করে সে এ মাসে সাবান কিনে দিয়েছে আর কেরোসিন কিনে দিয়েছে।

চকের থেকে নাড়া ও ধানের মোতা খুটে এনে পালা দিয়ে রেখে দেই অন্য মাসে চুলায় জ্বাল দেয়ার জন্য। এ মাসে বাচ্চারা জলপাই ও বড়ই কুটে খাবে। অন্যের বাড়িতে ধান লওয়া কাজ করে দিয়ে সে বাড়িতে দু এক বেলা খাবে।

পৌষ মাস

এ মাসে বতুয়া ও আলু শাক, দণ্ড কলস, তেলাকুচা, সাজনা, কচু শাক, থানকুনি, পানার ফুল, খেসারী, মটর শাক, খারকন পাতা এসব শাক নিজেরা খাই আবার বিক্রিও করে থাকি। খেসারী শাক, মটর শাক, বতুয়া শাক তুলে বাজারে দিলে ছেলে বিক্রি করে পেঁয়াজ, কিছু রসুন, তেল, লবণ ও মরিচ কিনবো। চকের থেকে গোল আলু খুটে আনবো তা খাবো। আলু খুটে বাজারে বিক্রি করেও বাজার খাবো। অন্যের বাড়ি আলু জমি থেকে তুলে দিলেও আলু দেয়। এক এক মণ আলু তুলে দিলে পাঁচ কেজি আলু পাই তা খাই, মেয়েকে দেই, আবার বিক্রিও করে থাকি। এক বছরের এক সিজন আলু তুলে প্রায় ছয় মণ আলু পেয়েছি। সে আলু বিক্রি করে ছোট দুই ছেলের কাপড় দিয়ে থাকি ঈদের কাপড় হিসাবে। এ মাসে রোজার ফেতরা দেয়া হয়েছে সে ফেতরা গ্রামের মানুষ কিছু দেয় তা এক সাথে করে ঈদের পরে আমি নিজে একটা শাড়ি, ছায়া ও জামা নিয়েছি। বড় ছেলে তাঁতের কাজের থেকে কিস্তি দিয়ে কিছু টাকা জমায়ে ঈদের কাপড় নিয়েছে।

এ মাসে খুটা ধানের ভাত ও আলু খুটা খেয়ে থাকি। রোজা বলে মাঝে মাঝে আলু বিক্রি করে বা শাক বিক্রি করে দুধ কিনে খেয়েছি। ইরি ক্ষেতের জ্বালা তুলে দিয়েও ১৫০ টাকা পেয়েছি।

মাঘ মাস

এ মাসে বতুয়া, খেসারী, মটর, দণ্ড কলস, সাজনা, ন্যাটাপেটা, বাজরা কাটা, পেঁয়াজ পাতা, রসুন পাতা, কচুরমুখী এসব শাক পাতা তুলে খাই। আবার কচুরমুখী তুলে বাজারে বিক্রি করে ঘরে বাজার সদায় করে খাই। হাঁস মুরগী আছে তার ডিম বিক্রি করেও বাজার করি। তেল, লবণ, মরিচ কিনে খাই। নিজেরাও দু'একদিন ডিম খেয়ে থাকি।

শুকনা ক্ষেতে হাল দেয়া হয় সে জমিতে ঘেচু ও হালু পাওয়া যায় তা খুটে খেয়ে থাকি। হাঁসের জন্য এ ক্ষেতে থেকে শামুক খুটে এনেও খাওয়ানো হয়। এ মাসে মানুষ ইরি ধানের গোছা গাড়বে সে ধানের জালা তুলে প্রায় ছয়শত টাকা পেয়ে থাকি। এ টাকা দিয়ে চাল কিনে খাব আবার অন্য মাসেও চাল কিনে খাব। ডালের পরিবর্তে কচুরমুখী ডাল রান্না করে খেয়ে থাকি। লাউ পাতা ও কুমড়া পাতা খেয়ে থাকি। এ মাসে পেঁয়াজ, রসুন কিনে খাব না। পেঁয়াজ, রসুনের পাতা খুটে খেয়ে থাকব। সরিষা মারার কাজ করে ভুষি এনে রেখে দেই। এ ভুষি দিয়ে জ্বাল দেই। ভুষির ছাই সোডা হিশাবে ব্যবহার করে থাকি। খেসারীর ভুষিও এনে পালা দিয়ে রেখে দেই। পাতা ঝাড়ু দিয়ে রান্না করে থাকি।

ফাল্গুন মাস

এ মাসে লাউ শাক, কুমড়া শাক, খুইরা কাটা, ন্যাটাপেটা, রসুন শাক, চাট কলমি, কচুরমুখী, গিমা শাক, মোরগ শাক ও মরিচ পাতা শাক তুলে ভাজি, ভর্তা ও ঘন্টো রান্না করে খেয়ে থাকি। কচুরমুখীর ডাল ও ভর্তা করে তারপর তরকারি রান্না করে খেয়ে থাকি। সব শাক একসাথে করে ভাজি খেয়ে থাকি। গম খুটে এনে রুটি বা গম ভাজি খেয়েও দু'এক বেলা থাকি। গমের ডাটি কেটে এনে জ্বাল দেই। অন্যের বাড়ি কাজ করে দিয়ে হাঁস মুরগীর জন্য কুড়া চেয়ে এনে থাকি ও তা হাঁস মুরগীরে খাওয়াই। ডিম পাড়ে তা বিক্রি করে কিছু বাজার খাই আবার পান কিনেও খাই, সুপারীর গাছ নিজের বাড়িতে আছে।

এ মাসে অন্যের বাড়ির ঘরের ডুয়া তৈরী করে ঘর লেপে দিলে তিন বেলা খাওয়া দিয়ে দুই থেকে আড়াই শত টাকা দেয় তা হাতে রাখি। গমের ডাটি এনে ঘরের বেড়া দিয়ে থাকি। গমের ভুষি এনে জ্বাল দিয়ে থাকি। ডাটি আটি বেঁধে রেখে দেই পরে বিক্রি করার জন্য। পাকা বড়ই ফুরিয়ে আসে তখনও বাচ্চারা দু' একটা খুটে খায়।

চৈত্র মাস

এ মাসে কৃষকের খেসারী, মসরী ডাল তুলে দিলে ডাল পায়। আবার ডাল ভাঙ্গার কাজ করে দিলেও এক বেলা ডাল খেতে দেয় তা এ মাসে খেয়েও অন্য মাসে খেতে পারি। আবার শাক পাতার মধ্যে এ মাসে গিমা শাক আলুর সাথে ভাজি করে খাওয়া হয়। এতে গরমে পেট ভাল থাকে। আবার পুরানো গাছের লাউ পাতা, কুমড়া পাত

ভাতে সিদ্ধ দিয়ে ভর্তা খাওয়া হয়। হাল বাওয়া ক্ষেতের থেকে হালু, ঘেচু ও শামুক খুটে আনি। হালু ঔ ঘেচু সিদ্ধ করে দু'এক বেলা খাব। শামুক খুটে এনে হাঁসকে খাওয়াবো। এ সময় হাঁসের খাদ্যের অভাব তাই শামুক খুটে ধনী বাড়ি দিলে এক বেলায় খাওয়ার জন্য আধা কেজি চাল দেয়। খেসারী ও মটর কলাইর ভুষি কুড়িয়ে এনে রেখে দেয় তা বর্ষা মাসে চুলায় জ্বাল দেয়। পায়রা, গম খুটে এনে এ মাসে ভাজি খাবেন। আবার কিছু থাকে পরের মাসে রুটি খেয়ে থাকি। অন্যের ক্ষেতে মিষ্টি আলু তোলার পর ক্ষেত থেকে মিষ্টি আলু কুড়িয়ে এনে তার তরকারি খেয়েছি। আবার আলু সিদ্ধ করে খেয়ে থাকি। গাছের পাতাসহ বিভিন্ন জাবা কুড়িয়ে এনে জ্বাল দিব। এ মাসে বার মাসের কামরাঙ্গা পাওয়া যায় তা দু' একটা কুড়িয়ে এনে খায়। গমের ডাটি পালা দিয়ে রাখি আষাঢ়, শ্রাবণ মাসে যখন খড়ির দাম বেশী তখন একশত আটি গমের ডাটি ২০-২৫ টাকা বিক্রি করে থাকি।

বৈশাখ মাস

তেলাকুচা, হেঞ্চি, কচু পাতা, সাজনা পাতা, ন্যাটাপেটা, গিমা, খুইরা কাটা এসব শাক খেয়ে থাকি এর পাশাপাশি বাড়িতে তরকারি গাছের দু'একটা তরকারি আছে তা মাঝে মধ্যে খাব।

এছাড়া আগের খুটে আনা গোল আলু, মিষ্টি আলু থাকে তার তরকারি ও ভাজি মাঝে মধ্যে খেয়ে থাকি। খুটে আনা গমের রুটি খাবো। ধনী বাড়ির ঘরের ডুয়া ও ঘর লেপে দিয়ে চাল আনি বা টাকাও আনি তা খাবো। ঘর লেপে দিলে দেড় কেজি চাল দেয় ও দু' বেলা খেতে দেয়। এ চাল দিয়ে দুই দিন খাবো।

পুরা একটা ঘর ডুয়াসহ লেপে দিলে সে ঘরের জন্য দুইশত থেকে আড়াইশত টাকা দিবে তা দিয়ে সংসার চালাই। এ মাসে বাজার সদায় তেমন করাতে পারি নাই। তবে এ মাসে কোরবানীর ফেতরা, গরুর চামড়ার টাকা পাই তা দিয়ে একটা কাপড় নিয়েছি। আবার কোরবানীর কিছু মাংস পেয়েছি। গরুর চামড়ার টাকা দিয়ে পেঁয়াজ, রসুন, তেল, লবণ, মরিচ ও হলুদ অল্প অল্প করে কিনে খেয়েছি। রান্নার জন্য বিভিন্ন গাছের পাতা, বাঁশ পাতাসহ বিভিন্ন জঙ্গল কেটে শুকিয়ে রান্না করি। আর ঘরে রাখা বিভিন্ন জ্বালানী রেখে দেই তা বর্ষা মাসে জ্বাল দিবো আবার বিক্রি করবো। এ সময় খড়ির দামও বেশি থাকে।

জ্যৈষ্ঠ মাস

বাড়ির আশে পাশে দোপা জমি তাতে এ মাসে পানি থাকে। এর মধ্যে শাপলা, কলমি, হেঞ্চি, হেলেঞ্চা এসব শাক পাওয়া যায়, তা খাই। কচুর লতি তুলে খাই, ঢেঁকি শাক, কস্তুরী, পাট শাক, বন পুঁই এসব শাক নিজেরা খেয়ে থাকি এর পাশাপাশি বাড়ির গাছের তরকারিও খেয়ে থাকি। বাড়িতে অল্প তরকারি তা বিক্রি করি না।

ঢেঁকি, শাপলা, কলমি এসব শাক তুলে বিক্রি করে থাকি। আবার কচুর লতি তুলেও বিক্রি করে থাকি তা দিয়ে তেল, লবণ, পেঁয়াজ কিনে থাকি। হাঁসের জন্য শামুক খুটে এনে খাওয়ায়ে থাকি। হাঁসের ডিম বিক্রি করে কেরোসিন, নারিকেল তেল ও পান সুপারী, সাদা পাতা এনে খেয়ে থাকি। এ মাসে ইরি ধান কাটে সে ক্ষেত থেকে ইরি ধান খুটে এনে সিদ্ধ করে শুকিয়ে চাল করে ভাত খেয়ে থাকি। এ মাসে ধান খুটে আড়াই থেকে তিন মণ ধান পেয়েছি তার চাল দু' মাস ভাল ভাবে খেতে পারি। এ মাসে ডিম বিক্রি করে কিছু টাকা হাতে জমাতে পারি। এ মাসে খেতে কষ্ট হয় না।

বাচ্চারা এ মাসে আম, জাম, ডইয়া এসব খুটে খেয়েছে। জ্বালানীর জন্য এ ধানের চিটা, হুগলা ও খড় এনে জ্বাল দেয়।

ফিরোজা বেগম

টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার থানার আটিয়া ইউনিয়নের মৌশা কাঁঠালিয়া গ্রামের ফিরোজা বেগমের বাড়ি। বয়স ৩৫ বছর, লেখাপড়া জানে না। স্বামীর নাম সিরাজ মিয়া, ৪০ বছর বয়সে মারা যায়। এ ঘরে এক মেয়ে দুই ছেলে রেখে মারা যায়। বড় মেয়ের বয়স ১২ বছর, বড় ছেলের বয়স ১০ বছর, ছোট ছেলের বয়স ৬ বছর।

শ্বশুর, শ্বাশুড়ী নেই। তিন ছেলে মেয়েকে নিয়ে ফিরোজা বেগম নিজে নানান কাজ করে খেয়ে থাকে। চকে কোন আবাদী জমি নেই। বাড়ি ভিটায় পাঁচ শতাংশ জমি এর উপরে দু' চালার একটা ঘর। উপরে টিন চারপাশে খড়ির বেড়া দেয়া। এ ঘর দেয়ার জন্য বাপের বাড়ি জমি পেত তা বিক্রি করে ১৬ হাজার টাকা আনে তা দিয়ে ঘর দিয়েছে। ঘরের এক পাশে একটা গরুর বাছুর আছে তা রাখে। ঘরের পাশে মাটির খোয়ার আছে তাতে হাঁস মুরগী রাখে। একটা গরুর বাছুর পাশের বাড়ি থেকে এনে ভাগী পালে। এ গরুটা ঘরে রাখে। তিনটা হাঁস ও ৭টা মুরগী আছে তা মাটির তৈরী খোয়ারে রাখে। বাড়িতে তরকারি গাছ আছে। মরিচ কিনতে হয় না। বর্ষা মাসে দুরমা চিনতন, পুঁইশাক, চাল কুমড়া বুনেছে তা খায়, বিক্রিও করে থাকে। তিনি মাসের বর্ণনা দেন শ্রাবণ মাস থেকে।

শ্রাবণ মাস

দৈনিক খাবার

এ মাসে ঢেঁকি শাক, কলমি শাক, হেলেঞ্চা শাক, কচুর লতি ও কচু শাক, শাপলা, শালুক, ঘেচু, দুরমা, চাল কুমড়া, চিনতন, লাউ শাক, কাকরোল পাতা শাক হিশাবে খেয়ে থাকে। ছোট মাছ মেরে আনে তা খেয়ে থাকে। এ শাক তুলে ভাজি, ভর্তা করে খাবে। লাউ শাক ভাতে সিদ্ধ করে হাতে ডলে ভর্তা করে খাবে। শাপলা, কলমি শাক ও কচুর লতি বিক্রি করে। এক আটি শাপলা বিক্রি করে দুই টাকা করে। তিন আটি শাপলা বিক্রি করে এক কেজি লবণ কিনলে এ মাস খাবে। কলমি শাক দু'আটি এক টাকা বিক্রি করে। এক আটিতে ৫০ গ্রাম হবে। এভাবে দুই দিন তুলে ৫ থেকে ৬ টাকা বিক্রি করে হলুদ ও পেঁয়াজ কিনে আনে। আবার কচুর লতি হাতের এক আটি তিন টাকা বিক্রি করে তা দিয়ে তেল ও সাবান কিনে আনে।

হাঁসের ডিম বিক্রি করে। এক সপ্তাহের ডিম বিক্রি করে একসাথে ৬ থেকে ৭ কেজি চাল কিনে ১০/১২ দিন খাবে। হাঁসের জন্য শামুক খুটে আনে এবং ধনী বাড়ি থেকে খুদ আনে তার ভাত রান্না করে খায়। বড়লোকদের বাড়ি থেকে মুরগীর জন্য খুদ আনে কুড়িয়ে পাওয়া শাক তুলে দিয়ে। গরুর জন্য ঘাস ও আউশ ধানের নাড়া কেটে এনে খাওয়ায়। এ মাসে প্রচুর শাক পাওয়া যায় সে শাক বিক্রি করে ছোট ছেলেকে একটা গেঞ্জি ও একটা প্যান্ট কিনে দেয়।

এ মাসে কাঁঠাল পাওয়া যায়, কাঁঠাল গ্রাম এলাকা থেকে কিনে খাওয়ায়। আবার বাচ্চারা দু'একটা পেয়ারা খুটে খাবে।

জ্বালানী

এ মাসে গাছের মরা ডাল ছেলে খুটে আনে। তাছাড়া আগের ঘরে আখের মোতা, ধানের চিটা, হুগলা আছে তা দিয়ে জ্বাল দেয়। এ মাসে পাট বেছে খড়ি আনে তা দিয়ে চুলা ধরায়। আবার পাট বাছার পর পাটের আগাইলা ভাঙ্গা-চুরা থাকে তা এনে শুকিয়ে জ্বাল দেয়। আবার গরুর খড় থাকে তা সাত আট দিনের তা একসাথে শুকিয়ে দুই তিন দিন জ্বাল দিতে পারে।

ভাদ্র মাস

দৈনিক খাবার

পাট শাক, ভাসা কলমি, ঢেঁকি শাক, কচু শাক ও কচুর লতি, পিপুল পাতা, তেলাকুচা পাতা, হেলেঞ্চা, হেঞ্চি, মিষ্টি কুমড়া শাক, চিনতন ও কাকারোল শাক কুড়িয়ে খাওয়া হয়। তাছাড়া বড় ছেলে চকের থেকে শাপলা, শালুক, ঘেচু ও মাছ মেরে আনে এ মাছ খেয়ে থাকে। এ মাসে মাঝে মাঝে শোল, বোয়াল, নুরা, ফ্যাশা মাছ মেরে আনে। ছোট মাছের মধ্যে টেংরা, পুঁটি, মলা, ঢেলা, খৈলসা, চান্দা, ইচা এসব মাছ দৈনিক কম বেশী ধরে আনে। আউশ ধান কাটার পর ধান খুটে আনে তার ভাত খেয়ে থাকে।

বাজার সদায়: কলমি শাক, ঢেঁকি শাক, শাপলা বিক্রি করে। এক একটা বিক্রি করে এক একদিন এক এক ধরণের বাজার করে থাকে। যেমন: হলুদ, পেঁয়াজ, তেল ও লবণ কিনে। এক হালি ডিম বিক্রি করে সাবান ও পান সুপারী কিনে খায়।

আউশ ধান খুটে আনে তার থেকে ভাদ্র মাসের তেরা বেরার পিঠা খাবে। বাকী দিন ডিম বিক্রি করে এক সাথে আট দশ কেজি চাল কিনে খাবে।

হাঁসের জন্য শামুক খুটে আনে তা হাঁসেরে খাওয়ায়। মুরগীর জন্য ডিম বিক্রি করে গমের ভুষি ও কুড়া কিনে আনে তা খাওয়ায়।

গরুর জন্য পানা কেটে আনে, হেলেঞ্চা ও বিভিন্ন ধরণের শাক ও ঘাস কেটে এনে খাওয়ায়। এ মাসে কোন কাপড়-চোপড় নিবে না।

ফল: ভাদ্র মাসে একটা তাল খুটে খাবে।

জ্বালানী: এ মাসে আউশের ধানের খড় কুটা কুড়িয়ে আনে যা অন্যের বাড়ি কাজ করে দিয়ে আনে তা দিয়ে জ্বাল দেয়। আবার গরুর খড় তাকে তা শুকিয়ে জ্বাল দেয়। আবার এ মাসে পাট বেছে পাটখড়ি আনে তা দিয়ে জ্বাল দিয়ে থাকে। আবার খড় বিক্রি করে ৩০০ টাকার মত হাতে রাখে। তাছাড়া পাটখড়ি দিয়ে ঘরের বেড়া দিয়ে থাকে।

আশ্বিন মাস

দৈনিক খাবার

এ মাসে চকের পানি কমে আসে তাই প্রচুর ছোট মাছ পাওয়া যায় তা খাবে, বিক্রি করবে। আবার শুটকী করে রেখে দিবে পরের মাসে খাওযার জন্য। শাপলা, শালুক, ঘেচু খুটে খায়। সকালে শালুক তুলে সিদ্ধ করে খাবে। পরে ভাত রান্না করে খাবে। আবার অনেক সময় বিকালে ঘেচু সিদ্ধ করে খাবে, রাত্রে ভাত খাবে। বাজরা কাটা, লতা কলমি, চাট কলমি, পিপুল পাতা, খ্যাতা শাক, মিষ্টি কুমড়া শাক তুলে খেয়ে থাকে। এ মাসে জমিতে গাংকলা পাওয়া যায় তা খেয়ে থাকে।

বাজার সদায়: এ মাসে কলমি শাক ও শাপলা বিক্রি করে লবণ, হলুদ কিনে আনে। শালুক তুলে বিক্রি করে। যাদের বাচ্চা নেই, একটু ধনী চকে যেতে পারে না, তারা এসে শালুক খেতে চায়। তাদের বাড়িতে শালুক দিলে, এক কেজিতে, এক কেজির মত চাল দেয়, তার ভাত খায়। আবার কলার ফুল এনে (মোচা) ধনী বাড়ি দিলে খুদ বা টাকা দেয় তা খুদ দিলে মুরগীকে খাওয়ায়, টাকা দিলে তা দিয়ে চাল কিনে খায়।

গরুর জন্য ঘাস কেটে আনে তার সাথে কচুরী পানা, হেলেঞ্চা, হেঞ্চি শাক কেটে গরুকে খাওযায়। হাঁসের জন্য শামুক খুটে আনে এ হাঁসের ডিম বিক্রি করেও চাল কিনে খাবে। আবার সাবান, সোডা ও তেল কিনে। হাঁসরে সারা বছর শামুক খাওয়ালে প্রত্যেক মাসে ডিম পাড়ে। এ মাসে শামুক খুটে এনে গর্ত করে রাখে পরে খাওয়ানোর জন্য।

জামা কাপড়: এ মাসে আখের ক্ষেতে কাজ করে যে টাকা পাবে তা দিয়ে কাপড় নিবে।

এ মাসে আঁখ ভাঙ্গানোর কাজ শুরু হয় তাই আঁখ ভাঙ্গানোর আগে ছাটতে হয়। এক চরা (গুড় জ্বাল দেয় বড় কড়াই) গুড়ের আঁখ ছাটলে ৭০ টাকা পায়। দিনে দুই চরা আঁখ ছেটে ১৪০ টাকা আয় করে। এ আঁখ ছাটার কাজ করে বড় ছেলেকে নিয়ে। এ মাসে আঁখ ছাটা টাকা দিয়ে ছেলে মেয়েদের ও নিজের কাপড় নিবে। এর পাশাপাশি কিছু টাকা হাতে রাখে।

জ্বালানী: আঁখ ছাটা পাতা ও জঙ্গল এনে জ্বাল দেয়। আঁখের পাতা এনে রেখে দেয় পালা দিয়ে, বর্ষা মাসে জ্বাল দেয়ার জন্য। আবার আঁখের ছোবা নেড়ে শুকিয়ে দিলে ছোবা দেয় তা এনেও পালা দিয়ে রাখে।

কার্তিক মাস

দৈনিক খাবার

এ মাসে বাড়ির আশেপাশে পাগাড়ে হঠাৎ দু’এক দিন ছোট মাছ পাওয়া যায় তা ধরে খাবে, এর সাথে বিভিন্ন শাক পাতা খায়। খুইরা কাটা, ন্যাটাপেটা, বাজরা কাটা, দণ্ড কলস দু একটা জমিতে কিছু কিছু বতুয়া শাক পাওয়া যায়, তার সাথে দুধ কলমি, তেঁতুলে শাক, মোরগ শাক এসব শাক ভাজি, ভর্তা খাবে। সাজনা পাতা, কস্তুরী পাতা দিয়ে মরিচ বাটা বেটে খায়। আবার তেলাকুচা পাতা দিয়েও মরিচ বাটা বেটি খায়।

বাজার সদায়: এ মাসেও আঁখের ক্ষেতে ও মিলে কাজ করে টাকা পায় তা দিয়ে বাজার সদায় করে এক দিনে আঁখ ছাটলে তার টাকা দিয়ে বাজার, তেল, লবণ, পেঁয়াজ, রসুন, সাবান ও নারিকেল তেল কিনবে সাথে হয়তো একদিন ভাল খাবে। হয়তো আধা কেজি মাংস কিনে খাবে। এ মাসে আমন ধান খুটেও আনবে। বাচ্চারা ধান খুটে দেড় থেকে দুই মণ।

গরুর জন্য আঁখের আগা আনবে তা কেটে খাওয়াবে সাথে আমন ধানের খড় এনে খাওয়াবে। হাঁসের জন্য শামুক খুটে আনে তার সাথে আমন ধান খুটে খায়। হাঁসের ডিম বিক্রি করে হাতে কিছু টাকা থাকে।

এ মাসে শীত হবে। শীতের কাপড় নিবে না, শীতের কাপড় কেনার জন্য হাতে টাকা জমায় পরের মাসে কাপড় কিনবে।

ফল: এ মাসে ছোট বা কাঁচা জলপাই পাওয়া যায় তা বাচ্চারা খুটে খায়।

জ্বালানী: এ মাসে আঁখের ছোবা শুকিয়ে দিয়ে ছোবা নিয়ে পালা দিবে গাছের পাতা ঝাড়ু দিয়ে জ্বাল দিবে। আবার গরুর উছাইরা শুকিয়ে জ্বাল দিবে। আমন ধানের নাড়া ও কুটা এনে শুকিয়ে পালা দিয়ে রাখবে তা সারা বছর গরুকে খাওয়াবে। আবার বিক্রিও করে থাকে।

অগ্রহায়ণ মাস

দৈনিক খাবার

এ মাসে বিভিন্ন ধরণের শাক পাওয়া যায়। বতুয়া, দণ্ড কলস, ন্যাটাপ্যাটা, ক্যাথাপেটা, চাট কলমি, দেশী লাউ শাক, মিষ্টি কুমড়া শাক এসব খেয়ে থাকি। তাছাড়া বেগুন ও ডাটা বুনছে তার সাথে লাউ পাতা ও ডাইগা দিয়ে নিরামিশ রান্না করে খেয়ে থাকে। এ মাসে আমন ধান খুটে আনে সে ধানের চালের ভাত খেয়ে থাকে। আবার আরোয়া ধান থেকে চাল বের করে একদিন ভাপা পিঠা খেয়ে থাকে।

বাজার সদায়: হাঁসের ডিম বিক্রি করে হলুদ ও পেঁয়াজ কিনে আনে, পান সুপারী কিনে খায়। বাড়ির গাছের লাউ বিক্রি করে এ মাসে লাউ খুব দাম তাই একটা লাউ পঁচিশ-ত্রিশ টাকা বিক্রি করে দুই কেজি চাল কিনে আবার বিক্রি করে তেল, লবণ, কেরোসিন কিনে। বেগুন বিক্রি করে হয়তো একদিন আধা কেজি দুধ খাবে।

গরুর জন্য খড় নাড়া কেটে আনে ঘাস তুলে এনে খাওয়ায়। হাঁসের জন্য অন্যের বাড়ির চাল ঝেড়ে কুড়া আনে আবার খুটে আনা ধান খাওয়াবে। ইঁদুরের গর্তের ধান এনে রেখে দেয় হাঁসের কুড়া দিয়ে মিশিয়ে খাওয়ায়।

জামা কাপড়: এ মাসে শীতে কাপড় নিবে হয়তো একটা চাদর ও সোয়েটার নিবে। এ দিয়ে শীত কাটাবে।

জ্বালানী: এ মাসে চক থেকে নাড়া খুটে আনে তা দিয়ে জ্বাল দেয় ও পালা দিয়ে রেখে দেয়। পাতা ঝাড়ু দিয়ে জ্বাল দেয় এ মাসে খড়ির কষ্ট হয়।

পৌষ মাস

দৈনিক খাবার

এ মাসে বতুয়া শাক, খেসারী, গোল আলু শাক, মটর কলাই শাক, সরিষা শাক, খারকন ও কস্তুরী শাক তুলে ভাজি, ভর্তা ও মরিচ বাটা খাবে। খ্যাটাপেটা, মোরগ শাক, লাউ শাক, কুমড়া শাক ভাজি ও ভর্তা করে খায়। আলু খুটে এনে খায়। আমন ধান খুটা তার চালের ভাত খাবে। আবার ডিম বিক্রি করেও চাল কিনে খাবে। নিজে অন্যের বাড়ি সারা দিন কাজ করে দেড় কেজি চাল পায় তার ভাত খাবে। এভাবে কাজ করে দিলে অনেক সময় খুদ দেয় সে খুদের ভাত খাবে। হাঁস মুরগীর জন্য কুড়া চেয়ে আনে এক বেলা কাজ করে দিলে কিছু কুড়া দেয়, আবার ধনী বাড়ির কাপড় কাচার কাজ করে দিলেও চাল বা টাকা দেয়। টাকা দিলে তা দিয়ে বাজার করে।

বাজার সদায়: ছেলে অন্যের বাড়ির কাজ করে টাকা আনে তা দিয়ে তেল, লবণ কিনে নিজে ও অন্যের বাড়ির কাজ করে যে টাকা পায় তা দিয়ে হলুদ কিনে, পান, সুপারী ও সাবান কিনে আনে। আবার রোজার ফেতরা তুলে এনেও বাজার করে আবার নিজে একটা কাপড় নেয়। আলু খুটে বিক্রি করে। ছেলেদের ঈদ সামনে রেখে কাপড় দেয়।

ফল: কাঁচা বড়ই খুটে বাচ্চারা খেয়ে থাকে।

জ্বালানী: এ মাসে আলু ক্ষেতে কচুরী পানা ঢাকা ছিল তা এনে জ্বাল দেয়। আবার গরুর উছাইলা শুকিয়ে জ্বাল দেয়। আমন ধানের চিটা, হুগলা এনে শুকিয়ে জ্বাল দেয়।

এ মাসে মানুষ ইরি ধানের গোছা গাড়ে তার জালা তুললে টাকা পায়। একশত জালার আটি তুলে দিয়ে ২৫-৩০ টাকা পায়। এ টাকা দিয়েও বাচ্চাদের কাপড় দেয়, নিজেরা খাওয়ার চাল ও বাজার করে।

মাঘ মাস

দৈনিক খাবার

ঘরে শুটকী মাছ ছিল তা খাবে। লাউ শাক, কুমড়া শাক, পেঁয়াজ পাতা, রসুন পাতা, মোরগ শাক, কস্তুরী, সাজনা ও খারকন পাতা ভাজি ও ভর্তা করে খেয়ে থাকে। অন্যের ক্ষেতের আলু তুলে দিলে আলু দেয়। এক মণ আলু তুলে দিলে ৫ কেজি আলু পায়। আবার আলু তুলে নেয়ার পর জমি থেকে আলু খুটে আনে। ক্ষেত থেকে শালুক ও গেচু খুটে এনে খাবে।

খুটে আনা ধানের ভাত খাবে। তাছাড়া জালা তুলে টাকা পায় তা দিয়ে চাল কিনে খায়। আবার খুটা ধানের চাল দিয়ে এ মাসে একদিন দুধের পিঠা খাবে। জালা তোলার টাকা দিয়ে গুড় ও দুধ কিনে পিঠা খাবে। সাথে দু একদিন ডিম রান্না করে খাবে। তাছাড়া মাঝে মধ্যে ডিম ভেজে ভাত খায়। গাছে বেগুন আছে লাউ, কুমড়া বিক্রি করে বাজার সদায় করে খাবে। লাউ, কুমড়া বিক্রি করে এ মাসে তেল, লবণ, হলুদ, পেঁয়াজ কিনে খাবে। বেগুন বিক্রি করে সাবান ও নারিকেল তেল কিনবে। বাড়ির গাছের তরকারি নিজেরাও খাবে।

হাঁস মুরগী ও গরুর খাবার

গরুর জন্য ঘাস তুলে আনে তাছাড়া আলুর লতা আনে সাথে খড়ও খাওয়াবে। হাঁসের জন্য ইটা ক্ষেতের থেকে শামুক খুটে এনে হাঁসরে খাওয়ায়। ডিম বিক্রি করে মুরগীর কুড়া কিনে আনে।

ফল: এ মাসে বড়ই ও তাল পাওয়া যায়। বাচ্চারা আশে পাশের বাড়ি থেকে খুটে খায় আবার নিজেও হঠাৎ দু'একটা খেয়ে থাকে।

জ্বালানী: এ মাসে আলু ঢাকার কচুর পানা আছে তা এনে শুকিয়ে জ্বাল দেয়। তাছাড়া গরুর উছাইলা আছে তা শুকিয়ে জ্বাল দেয়, গাছের পাতা ঝাড়ু দিয়ে জ্বাল দেয়, পথ ঘাট ঝাড়ু দিয়ে জ্বাল দিয়ে থাকে, সরিষার ভুষি এনে জ্বাল দেয়।

ফাল্গুন মাস

দৈনিক খাবার

এ মাসে কচুরমুখী পাওয়া যায় তার ডাল ও ভর্তা করে খাবে। তাছাড়াও এ মাসে খেসারী, মটর, মসুরী আসবে তা খুটে এনে খাবে। তাছাড়া এ ডাল লওয়া কাজ করে দিলেও খাওয়ার ডাল দিবে তা খাবে। লাউশাক, বাজরা কাটা, খুইরা কাটা, মরিচ পাতা, মোরগ শাক, মিষ্টি কুমড়া শাক, লাউ শাক দিয়ে আলু দিয়ে রান্না করে খাবে। এ মাসে গম খুটে এনে ভাজি খাবে।

ঘর বাড়ি লেপে দিলে তিন বেলা খাবার দিবে এবং দেড় কেজি চাল দেয় তা দিয়ে দুই দিন খাবে। আবার এ মাসে দু'একটা মুরগী বিক্রি করবে তা দিয়ে চাল কিনে খাবে। আলু খুটা ছিল তা বিক্রি করে হলুদ, লবণ, তেল কিনবে। আর অল্প করে পেঁয়াজ কিনবে, রসুন কিনবে। রসুনের দাম বেশী হঠাৎ কোন মাসে ৪/৫ টাকার বেশী রসুন কিনে খাবে। তাছাড়া রসুন খাবে না, মরিচ নিজের গাছের তা খাবে, কিনে খাবে না।

পশুপাখির খাবার: এ মাসে গরুর জন্য ঘাস তুলে খাওয়াবে সাথে ঘরে আনা খড় তা খাওয়াবে। হাঁস মুরগীর জন্য কুড়া কিনে খাওয়াবে। আগে শামুক গর্তে রেখেছে তা তুলে মাঝে মাঝে খাওয়াবে।

কাপড় চোপড়: এ মাসে কোন কাপড় নিবে না।

ফল: এ মাসে বড়ই খুটে দু'একটা খাবে পাশের বাড়ি থেকে।

জ্বালানী: এ মাসে গাছের পাতা পড়ে তা ঝাড়ু দিয়ে রান্না করবে এবং পাতাও মাচা পেতে পালা দিয়ে রাখবে পরবর্তীতে রান্না করার জন্য।

চৈত্র মাস

দৈনিক খাবার

এ মাসে কচুর মোতা, গিমা শাক, মোরগ শাক, লাউ শাক, কুমড়া শাক, নতুন কচু শাক, উস্তা শাক, মরিচ পাতা শাক ও ন্যাটাপেটা শাক ভাজি, ভর্তা করে খাওয়া হয়। কুড়িয়ে আনা ডাল খাবে। আবার শালুক ও ঘেচু তুলে এনে সিদ্ধ করে খেয়ে এক বেলা থাকে।

এ মাসে খাওয়া দাওয়া বেশী কষ্ট। গমের রুটি, গমের জাই রান্না করে খায়। চাল দিয়ে তার মধ্যে শাক পাতা, ডাল, আলু দিয়ে খিচুরী রান্না করে দু'চার দিন পর পর খাবে।

এ মাসে কাঁথা সেলাই করে। কাঁথা প্রতি ৩৫-৪০ টাকা পায় তা দিয়ে চাল কিনে খায়। চার থেকে পাঁচটা কাঁথা সেলাই করে থাকে এর থেকে লবণ, হলুদ কিনে খায়।

পশুপাখির খাবার: হাঁসের জন্য শামুক খুটে আনে তা খাওয়ার, কুড়া চেয়ে এনে হাঁস মুরগীরে খাওয়ায়। গরুর জন্য ঘাস তুলে আনে তা খাওয়ায়, গমের ভুষি এনে খাওয়ায়, গম লওয়ার কাজ করে গমের ভুষি এনে গরুকে খাওয়ায়।

জামা কাপড়: জামা কাপড় নিবে না। এ মাসে খুব অভাবের মাস কোন আয় রোজগার বেশী থাকে না।

ফল: চৈত্র মাসে দু'একটা কামরাঙ্গা পাওয়ায় বাচ্চারা খেয়ে থাকে।

জ্বালানী: এ মাসে সব গাছের পাতা ঝরে যায়। প্রত্যেক দিন এ পাতা ঝাড়ু দিয়ে রান্না করে থাকে। আবার গরুর উচাইলাও শুকিয়ে জ্বাল দিয়ে থাকে।

বৈশাখ মাস

দৈনিক খাবার

কচু শাক, কচুর লতি, ন্যাটাপেটা, তেলাকুচা, হেঞ্চি, সাজনা, ঢেঁকি শাক, পাট শাক, খুইরা কাটা, মরিচ পাতা শাক তুলে এনে ভাজি, ভর্তা করে খাবে। এর সাথে ঘরে খুটা আলু থাকে তার সাথে ভাজি, ভর্তা খেয়ে থাকে। খুটে আনা ডাল রান্না করে খাবে। এর সাথে খুটে আনা কাঁচা আম দিয়ে ডাল খাবে।

এ মাসেও কাঁথা সেলাই করে প্রায় দুইশত টাকা পায় তা দিয়ে চাল কিনে খাবে। আবার কাপড় ধোয়া কাজ করে দিলে এক কেজি চাল দেয় তা খেয়ে থাকে। আবার ঘর লেপে দিলেও দু'বেলা খাওয়ার জন্য দেড় কেজি চাল দিবে। এর থেকে বাজারও করবে। ছেলে ইরি ক্ষেতে জঙ্গল বেছে টাকা আনে দিনে ৪০ টাকার মত।

পশুপাখির খাবার: গরুর জন্য ঘাস তুলে আনে, আর বাড়িতে আগের আনা খড় আছে তা খাওয়ায়। হাঁস মুরগীর জন্য কিছু কুড়া কিনে আনে তাও খাওয়ায়, এর পাশে গর্তে রাখা শামুক খাওয়াবে।

জামা কাপড়: এ মাসে কোন কাপড় চোপড় নিবে না।

ফল: এ মাসে গাছের কাঁচা আম পড়ে তা খুটে এনে কাঁচা খাবে, ভর্তা খাবে। আবার গুড় দিয়ে রান্না করে খাবে।

জ্বালানী: এ মাসেও পাতা ঝাড়ু দিয়ে এনে জ্বাল দিবে। তাছাড়া ঘরে আনা আখের মোতা, পাতা, নাড়া আছে তা দিয়ে জ্বাল দিবে।

জ্যৈষ্ঠ মাস

দৈনিক খাবার

নতুন ভাসা কলমি, ঢেঁকি শাক, হেলেঞ্চা, সেঞ্চি, কস্তুরী পাতা, খারকন পাতা, কচু শাক, পাট শাক, কচুর লতি, বন পুঁই, ন্যাটাপেটা এসব শাক তুলে ভাজি, ভর্তা করে খাবে। এ মাসে ইরি ধান খুটে আনবে। এ ধানের ভাত খাবে। চকে নতুন পানি আসে তাতে ছোট ছোট মাছ পাওয়া যায় তা খাবে। মাছের পোনা ধরে খাবে, কাঁঠালের বীচি খুটে খাবে।

ধান খুটে তার থেকে কুড়া ও খুদ বের হয় তার চাল খাবে। কুড়া ও খুদ মুরগী খাবে। ছেলে ইরি ধান কাটার কাজ করে দিনে ৪০ টাকার মত আনবে এ দিয়ে বাজার খাবে। লবণ, তেল, সাবান কিনবে। অন্য দিন হলুদ, পেঁয়াজ, বাজারে মাছ পেলে মাছ কিনে খাবে। আবার ডাল কিনেও খাবে।

পশুপাখির খাবার: গরুর জন্য অন্যের ধান বাইরাইয়া খড় এনে খাওয়াবে। আবার ঘাস কেটে এনে খাওয়ায়। তাছাড়া শামুক খুটে এনে খাওয়ায়, মুরগী ধান খুটে খাবে তার খাবার দিতে হয় না।

ফল: অন্যের ও নিজের গাছের থেকে দু'একটা কাঁচা, পাকা আম পড়ে তা খুটে খায়।

জ্বালানী: এ মাসে ধানের চিটা, হুগলা, খড় এনে জ্বাল দেয় এবং ঘরে রাখা খড়ি পুড়ে। এ মাসে সে একশত টাকার ঘসি বিক্রি করে থাকে। লাকড়ি রেখে দেয় বর্ষা মাসে দাম বেশী এ সময় বিক্রি করে থাকে।

আষাঢ় মাস

দৈনিক খাবার

এ মাসে বিভিন্ন শাক মিলে ভাসা কলমি, ঢেঁকি শাক, শাপলা, শালুক, ঘেচু, গাংকলা, ডুলডুলি, দণ্ড কলস, কস্তুরী শাক, হেলেঞ্চা শাক তুলে খাবে। কচু শাক, কচুর লতি তুলে খাবে ও বিক্রি করবে। ছোট মাছ ধরে খাবে। ইনি ধান খুটে আনে তার ভাত খাবে। তাছাড়া চাল কিনেও খাবে। শাপলা, কলমি, ঢেঁকি শাক ও কচুর লতি তুলে বাজারে বিক্রি করে, আবার হাঁসের ডিম বিক্রি করেও চাল কিনবে। আবার তেল, হলুদ, লবণ কিনে, কচুর লতি বিক্রি কর সাবান ও পান সুপারী কিনে খাবে, কলমি শাক বিক্রি করে নারিকেল তেল কিনে আনে, শাপলা বিক্রি করে কিছু পেঁয়াজ কিনে আনে।

পশুপাখির খাবার: হাঁসের জন্য শামুক খুটে আনে। তারপর গরুর জন্য ঘাস কেটে আনে। ছেলেরা মাছ মেরে আনে তার থেকে কিছু মাছ ধনী বাড়ি দিলে খুদ দেয় তা মুরগী খায়।

জামা কাপড়: এ মাসে বাচ্চাদের প্যান্ট কিনে দিতে হয়। হাঁসের ডিম বিক্রি করে প্যান্ট কিনে আনে। এ সময় বাচ্চাদের প্যান্ট বেশী লাগে সারা দিন পানিতে থাকে তাই ভিজা থাকে।

ফলঃ এ মাসে হয়তো কিনে দু'একটা কাঁঠাল খাওয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া আটি বাড়ির গাছের কাঁঠাল আছে তারা কাঁঠাল খেয়ে বাচ্চাদের খেতে দেয়।

সাহেরা বেগম

টাংগাইল জেলার দেলদুয়ার থানার আটিয়া ইউনিয়নের মৌশাকাঁঠালিয়া গ্রামে সাহেরা বেগমের বাড়ি। লেখাপড়া তেমন জানে না, নাম স্বাক্ষর শিখেছে। স্বামীর নাম বিষা মিয়া। বয়স ৩৫ বছর, নাম স্বাক্ষর জানে। সে কোন কাজ করতে পারে না। ঘরে বসে থাকে, বেশী হাঁটা হাঁটি করতে পারে না। তার অসুখ। শ্বাশুড়ী আছে। তার এক ছেলে দুই মেয়ে। চকে কোন জমি নেই, বাড়িভিটা আছে ৪ শতাংশ। সাত ফাইল টিনের একটা ছাপড়া দেয়ার তার মধ্যে সবাইকে নিয়ে থাকে।

তার চারটি মুরগী ও পাঁচটা হাঁস আছে। হাঁস মুরগী বাহিরে মাটির খোয়ারে থাকে। বড় ছেলের বয়স ১৩ বছর, দ্বিতীয় মেয়ের বয়স ৬ বছর, তৃতীয় ছেলের বয়স ১ বছর। ঘরে বুড়া শ্বাশুড়ী আছে।

স্বামী কাজ করতে পারে না ৭/৮ বছর ধরে, অসুস্থ্য ভাল হচ্ছে না। সাহেরা নিজের বাচ্চা বাড়িতে শ্বাশুড়ীর কাছে রেখে পাড়ায় অন্যের বাড়িতে কাজ করে চাল আনে। আবার ভাত খেয়ে এক থালি ভাতও নিয়ে যায়। কোথাও কোন ঋণ নেই নিজে যা বাচ্চাদের নিয়ে আয় করে তা দিয়ে খেয়ে থাকে। ঘরের পাশে তরকারী গাছ লাগিয়েছে সে তরকারী বিক্রি করে থাকে। তিনি মাসের হিশাব দেন অগ্রহায়ণ মাস থেকে।

অগ্রহায়ণ মাস

দৈনিক খাবার

এ মাসে বতুয়া, দন্ড কলস, হেঞ্চি, বাজরা কাটা, শুষণী শাক, সাজনা পাতা, তেলাকুচা পাতা দিয়ে মরিচ বাটা খেয়ে থাকে। ঘরে শুটকী করা, তার সাথে সব্জির আবাদ করে। মূলা, কপি, ডাঁটা শুটকী দিয়ে খেয়ে থাকে। আবার চকের থেকে আমন ধান খুটে আনে তাতে দুই মণের বেশি ধান পেয়েছে। ইঁদুরের গর্তের ধান তুলে আনে তা হাঁস ও মুরগীকে খাওয়ায়। এ ধানের ভাত খাবে আবার কিছু থাকে পরবর্তী মাসেও খেয়ে থাকে।

এ মাসে হাঁস মুরগীর জন্য বাহিরের তেমন খাবার দিতে হয় না, তারা খুটে এ মাসে খেয়ে থাকে। এ মাসে ধানের নতুন বের হয় তা হাঁসে খায়। হাঁস মুরগীর ডিম বিক্রি করে নারিকেল তেল, সরিষার তেল আনে একদিন। আবার আরেক দিন লবণ, মরিচ ও হলুদ আনে এভাবে সারা মাসের বাজার করা হয়। এ মাসে জলপাই থাকে তা খুটে বাচ্চারা খায় ও খুটে এনে গুড়ে পাক দিয়ে খেয়ে থাকে। বড়ই খুটে খায়।

জ্বালানীঃ চকের থেকে নাড়া খুটে আনে ধানের মোতা এনে মুগুরে বাইরাইয়া মাটি ফেলে পালা দিয়ে রাখে পরে জ্বাল দেয়। আর এখন নাড়া ও পাতা ঝাড়ু দিয়ে রান্না করে খেয়ে থাকে। অন্যের বাড়িতে ধান লওয়ার কাজ করে দিলে তিন বেলা খাবার দেয় ও আবার ৩০ থেকে ৪০ কেজি ধান দেয় তা খেয়ে থাকে। এর থেকে অল্প কিছু মুড়ির জন্য সিদ্ধ করা হয়। মুড়ি ভেজে খেয়ে থাকে।

পৌষ মাস

দৈনিক খাবার

এ মাসে শীতের নতুন শাক বতুয়া, দন্ড কলস, হেঞ্চি, মোরগ শাক, ন্যাটাপ্যাটা, তেলাকুচা খারকন, কস্তুরী, খেসারী, মটর শাক তুলে গোলআলু শাক তুলে খাবে। বতুয়া, খেসারী, মটর শাক তুলে বাজারে বিক্রি করে। তাছাড়া যে কেউ নিয়ে চাল, খুদ বা টাকা দেয় হয়তো একদিন দিল তা দিয়ে ভাত রান্না করে খেয়েছে। আবার একদিন চাল বা টাকা দিয়েছে। আবার আলু সিদ্ধ করে খেয়ে থাকে। আলু তুলে নেয়ার পর চকের থেকে আলু খুটে আনে, আবার যারা আলু চাষ করে তাদের এক মণ আলু তুলে দিয়ে ৫ কেজি আলু পেয়েছে এভাবে এ বছর সাড়ে ৫ মণ আলু পেয়েছে। এ আলু বাজারে বিক্রি করে চাল এনেছে, আবার আলু সিদ্ধ করে লবণ দিয়ে

খেয়েছে। এ আলু বিক্রি করে ডাল খেয়ে থাকে। আবার অন্যান্য বাজার যেমন-তেল, লবণ, মরিচ, হলুদ ও পেঁয়াজ কিনে খেয়ে থাকে।

গাছের তরকারি লাউ, সীম ও মিষ্টি কুমড়া বিক্রি করে অনেক সময় চাল আনে আবার তেল, লবণ কিনে, আবার হঠাৎ কোন মেহমান আসলে ঘরের মুরগী বা হাঁসের ডিম থাকলে খাওয়ায়। আবার মুরগী ঘরে আছে একটা জবাই করে বাচ্চাদের নিয়ে খেয়ে থাকে।

চক থেকে আমন ধান খুটে আনে তার চাল তৈরী করে খেয়ে থাকে। আবার খুটা ধানের থেকে পিঠার চাল করে ভাপা পিঠা খেয়েছে। আবার একদিন দুধের পিঠা করে খেয়েছে।

এ মাসে ইরি ক্ষেতের জালা তুলে দিয়ে প্রায় দুইশত টাকার মত পেয়ে এ টাকা দিয়ে দুধের পিঠা খেয়েছে। একদিন দুই কেজি দুধ ও এক কেজি গুড় পিঠা করে খেয়েছে।

জ্বালানী: এ মাসে আমন ধানের ক্ষেতে ধানের মোতা ও খড়, নাড়া তুলে এনে পালা দিয়ে রাখে অন্য সময় জ্বাল দেয়ার জন্য। নিজেরা এ নাড়া দিয়ে জ্বাল দিয়ে থাকে। অন্যের জমিতে সব্জি আবাদ করে তারা শাক সব্জি নিজেরা খেয়ে বাজারে বিক্রি করে তারপর সব্জি বাছাই করে বাজারে নেয়। বাছাইয়ের পরে যা থাকে তা এনে খেয়ে থাকে। মূলা ও শাক, কপির পাতা, ডাঁটা, টমেটো, বেগুন এসব কিনে কম খায় অন্যের জমি থেকে খুটে এনে খায়।

মাঘ মাস

দৈনিক খাবার

এ মাসে আবাদে বিভিন্ন শাক সব্জি থাকে তা খেয়ে থাকে। সীম, কুমড়া, মিষ্টি কুমড়া ও লাউ এ সব শাক পাতা খুটে খেয়ে থাকে। বতুয়া, খুইরা কাটা, বাজরা কাটা, মোরগ শাক, পিপুল পাতা, খারকন, রসুন পাতা, পেঁয়াজ পাতা এনে খেয়ে থাকে। দন্ড কলস, কচুরমুখী তুলে খাবে। খুটা ধানের ভাত খাবে। মুখী তুলে ডাল খাবে, মিষ্টি আলু শাক, লাউ শাক, তুলে বাজারে বিক্রি করে হলুদ, মরিচ, তেল লবণ কিনে আনে। মুখী তুলে ধনী বাড়ি বা পাড়ায় যে কোন বাড়ি দিলে খুদ বা চাল দেয় তা এনে খেয়ে থাকে। পেঁয়াজ রসুন কিনে খাবে না, খুটে এনে খাবে ও অন্য মাসের জন্য রেখে দেয়। মিষ্টি আলু পাতা ভাজি খেয়ে থাকে।

হাঁস মুরগীর ডিম বিক্রি করে চাল কিনে, আবার পান সুপারী কিনে থাকে। এ মাসে ইরি ধানের গোছা গাড়ে তাই গোছা গাড়ার জালা তোলার কাজ করে। একবার তুলে দিলে ২৫ থেকে ৩০ টাকা পেয়ে থাকে। আবার মাসে সরিষা লওয়ার কাজ করে দিলে সরিষার তেল খাওয়ার জন্য পায় ও সরিষার ভুষি এনে জ্বাল দেয়।

জালা তুলে সারা দিনে ৫০ থেকে ৬০ টাকা আয় করে। এ টাকা দিয়ে খাবে আবার রোজার ফেতরার টাকা তুলে এনে তা দিয়ে শ্বাশুড়ী ও বাচ্চাদের কাপড় দিবে। নিজেও কাপড় নিবে। তার স্বামী অসুস্থ। বাচ্চা ও শ্বাশুড়ীকে নিয়ে খায়। আয় করার লোক নেই। গ্রামের মাতাব্বরা ফেতরার টাকা তুলে দেয়।

ফাল্গুন মাস

দৈনিক খাবার

এ মাসে চকে গমের আবাদ থাকে গম কাটা শুর হয়। ক্ষেতে গমের হিঞ্জা থাকে তা খুটে আনে। এ গমের আটা তৈরী করে রটি খায়। কচুরমুখী তুলে রান্না করে তা দিয়ে রটি খেয়ে থাকে। আবার কচুর মোতা দিয়ে ভর্তা তৈরী করে খেয়ে থাকে। শাকের মধ্যে ন্যাটাপ্যাটা, খুইরা কাটা, বতুয়া, দন্ড কলস, কস্তুরী, নিজের গাছের সীম, লাউ খাবে ও বিক্রি করবে। লাউ ও কুমড়া পাতা খেয়ে থাকে। মিষ্টি কুমড়ার ফুল দিয়ে বড়া ভেজে খেয়ে থাকে। লাউ পাতা ভাজি ও ভাতে সিদ্ধ করে ভর্তা খেয়ে থাকে। এ মাসে গমের ডাটি কেটে এনে পালা দিয়ে রাখে। এক আটি গমের ডাটি থেকে গমের হিঞ্জা কেটে দিলে ২০ টাকা পায়। এভাবে গমের ডাটি থেকে হিঞ্জা

কেটে প্রায় দুইশত টাকা পেয়েছে। এ দিয়ে চাল কিনে খেয়েছে। এ মাসে কোন কাপড় চোপড় নিবে না। ফাল্গুন মাসে গাছে তেঁতুল ও বড়ই থাকে এ বড়ই ও তেঁতুল বাচ্চারা নিজেদের মত খুটে খায়। পাশের বাড়িতে বড়ই গাছ তার বড়ই সব সময় খেয়েছে।

জ্বালানীঃ এ মাসে অন্যের বাড়ি থেকে খেসারী কলাই, মটর কলাই, গমের ভুষি কুড়িয়ে এনে জ্বাল দেই। এ মাসে খড়ি ঘরে জরো করে রাখে, আর পাতা ঝাড়ু দিয়ে জ্বাল দিয়ে থাকে। এ মাসে প্রচুর জ্বালানী পাওয়া যায়।

চৈত্র মাস

দৈনিক খাবার

এ মাসে বেশী শাক পাতা থাকে না। এ সময় বেশীর ভাগ কচুরমুখী ও মোতা তুলে ডাল ও ভর্তা করে খেয়ে থাকে। ক্ষেতের মাতায় এ সময় বেশী হেঞ্জি ও হেলেঞ্চা শাক পাওয়া যায়। এ শাক তুলে ভর্তা ও ভাজি খেয়ে থাকে।

আবার এ সময় গিমা শাকটা একটু বেশি থাকে। তাছাড়া গিমা শাক গরমে খেলে পেটের কোন সমস্যা হয় না। আবার পেটে কৃমি হলেও এ শাক আলু দিয়ে ভাজি খেলে কৃমি পড়ে যায়। তাই এ মাসে এ শাকটা বেশী খাবে। ঘরে খুটে আনা আলু আছে তা এক সাথে কুচি করে ভেজে খেয়ে থাকে।

এ মাসে ক্ষেতে শামুক, আলু ও ঘেচু পাওয়া যায়। শামুক খুটে হাঁসকে খাওয়ায়। আলু ও ঘেচু খুটে এনে সিদ্ধ করে দু'এক বেলা খেয়ে থাকে। খুটে আনা আলু সিদ্ধ করেও খেয়ে থাকে। এ মাসে বার মাসের কামরাঙ্গা পাওয়া যায়। তবে বাচ্চারা কামরাঙ্গা খেতে পারে নাই। বাড়ির আশে পাশে কোন কামরাঙ্গা গাছ নেই।

জ্বালানীঃ এ মাসে খেসারী, মুসুরী, সরিষা এসবের ভুষি এনে জ্বাল দেই। এ সরিষার ভুষি দিয়ে রান্না করে তার ছাই দিয়ে কাঁথা ধুয়ে পরিস্কার করবে। আবার সোডা এনেও কাঁথা পরিস্কার করে। শীত শেষে চৈত্র মাসে ভাল রোদ থাকে তাই চৈত্র মাসে কাঁথা ক্ষার দিয়ে ধুয়ে থাকে।

বৈশাখ মাস

দৈনিক খাবার

এ মাসে ন্যাটাপ্যাটা, কানাই, গিমা, ক্যাথাপেটা, কচু শাক, কচুর লতি, পাট শাক, হেঞ্চি ঘরে আলু আছে সে আলু খাবে। এ আলু অন্যের জমি থেকে খুটে আনা হয়েছিল। এ মাসে খুটে আনা গমের র‍ুটিও খাবে। মুরগী ডিম পাড়ে দু'একদিন ডিমও খেয়ে থাকে। ডিম বিক্রি করেও বাজার সদায় করে থাকে। একদিন এক হালি ডিম বিক্রি করে সাবান, তেল কিনবে। অন্যদিন বিক্রি করে ডাল কিনে আনে তা দুই দিন খাবে। এভাবে যখন যা দরকার তা ডিম বিক্রি করে কিনে থাকে। আবার গমের হিঞ্জা কেটে দিয়ে গমের ডাটি আনে তা দিয়ে ঘরের বেড়া দেয়, আবার বিক্রিও করে গম কিনে বা চাল কিনে খায়।

পশুপাখির খাবারঃ হাঁসের জন্য ইটা ক্ষেতের থেকে শামুক খুটে আনে তা খাওয়ায়ে থাকে। এ মাসে গাছের আম তখন ঝড় পড়ে ছেলেরা খুটে আনে তার ভর্তা ও আচার দিয়ে থাকে।

জ্বালানীঃ এ মাসে গাছের পাতা পড়ে, বাঁশের পাতা, গাছের ডালপালা পেড়ে জ্বাল দেয়।

ধনী বাড়ি কোরবানী দিলে সে কোরবানীর চামড়ার টাকায় একটা পরার কাপড় ও স্বামীর জন্য একটা লুঙ্গি কিনে।

১লা বৈশাখের দিন বাড়িতে ভাল মন্দ খাবে এবং শাক ডাল ও সবজি একত্রে করে একটা তরবকারি রান্না করে খাবে।

জ্যৈষ্ঠ মাস

দৈনিক খাবার

এ মাসে নতুন হেঞ্চি, হেলেঞ্চা, কলমি, কচুশাক, কচুর লতি, ন্যাটাপ্যাটা, খুইরা কাটা, বাজরা কাটা। বাড়িতে তরকারি গাছ তার তরকারি বিক্রি করে আবার তরকারি গাছের পাতা যেমনঃ চিনতন, দুরমা, ঝিঙ্গা শাকও খেয়ে থাকে। দন্ড কলস পাতা ভাতে সিদ্ধ করে ভর্তা খায়। কচুর কচিডাইগা ও পাতা ভাতে সিদ্ধ করে ভর্তা খায়।

ইরি ধান খুটে আনে এ মাসে প্রায় আড়াই থেকে তিন মণ পায়, তার চাল তৈরী করে ঘরে রেখে খাবে। কাজ করে খাবে, যখন কোন কাজ মিলবে না তখন ঐ চালের ভাত খেয়ে থাকে।

হাঁস মুরগী এ ধান খাবে। আবার হাঁসের জন্য চকের থেকে শামুক এনে খাওয়াবে। শামুক খাওয়ালে ডিম বেশী দেয়। এ ডিম বিক্রি করে পান সুপারী, হলুদ, মরিচ, লবণ, তেল কিনে আনে। আবার অন্য সময় নারিকেল তেল, পেঁয়াজ কিনে আনে। রসুন তেমন খায় না। ইষ্টি বা মেহমান আসলে হয়তো দুই তিন টাকার কিনে খায়। রসুনের দাম বেশী তাই রসুন কম খায়।

এ মাসে ঘরে ভাত ও চাল থাকে তেমন খাবারের অভাব হয় না। খুটা ধানের ভাত, তরকারি একটু কম থাকে, তাই ভাতের সাথে হলুদ, মরিচ দিয়ে খিচুরী রান্না করে খায়।

জ্বালানীঃ এ মাসে আখের ক্ষেতের মরা পাতা পাওয়া যায় তা এনে জ্বাল দেয়। গোবরের ঘসি দিয়ে জ্বাল দেয়।

ফলঃ এ মাসে গাছের কাঁচা আম ঝড়ে পড়ে তা খুটে কাঁচা খাবে। আবার আমের মধ্যে গুড় দিয়ে পাক দিয়ে খাবে। দু'একটা পাকা আমও খুটে খাবে।

আষাঢ় মাস

দৈনিক খাবার

এ মাসে শাপলা, শালুক, কলমি, হেলেঞ্চা, গাংকলা, সেঞ্চি, ন্যাটাপ্যাটা, তেলাকুচা, কস্তুরী, কচু শাক ও কচুর লতি, খারকন পাতা, মিষ্টি কুমড়া ফুল, দুরমা, চিনতন এসব শাক ভাজি ও ভর্তা খেয়ে থাকে। মিষ্টি কুমড়ার ফুল চালের আটা দিয়ে বড়া ভেজে খেয়ে থাকে।

কলমি শাক ও শাপলা বিক্রি করে লবণ, মরিচ, তেল কিনে আনে। কচুর লতি বিক্রি করে হলুদ কিনে আনে। ডিম বিক্রি করে সাবান, পান, সুপারী কিনে, আবার সুপারীর পরিবর্তে অনেক সময় খেজুরের বীজ খেয়ে থাকে। ছেলে চক থেকে ছোট মাছ মেরে আনে তা খেয়ে খাবে। আবার ধনী বাড়িতে কিছু মাছ দিলে এক দিনের ভাতের চাল খেতে দেয়।

হাঁসের জন্য শামুক খুটে আনে। শামুক খুটে ধনী বাড়িতে দিলে আবার আধা কেজি খুদ দেয় তা দিয়ে ভাত রান্না করে একদিন খাওয়া হয়। হাঁসের ডিম বিক্রি করে চাল কিনে খায়।

এ মাসে কোন কাপড় চোপড় নিবে না। এ মাসে হাতে বেশী টাকা থাকে না। ইরি ধান খুটা তার চালও খেয়ে থাকে।

জ্বালানীঃ জ্বালানীর জন্য ধানের হুগলা, চিটা, খড় ও গরুর খড় এনে শুকিয়ে জ্বাল দিয়ে থাকে। আগে আঁখের মোতা তুলে পালা দিয়ে রেখে ছিল তা এ মাসে ৫০০ টাকা বিক্রি করেছে।

শ্রাবণ মাস

দৈনিক খাবার

এ মাসে কলমি, ঢেঁকি, হেলেঞ্চা, কচুর লতি, শাপলা, শালুক, কচু এসব তুলে নিজেরা খেয়ে থাকে। কলমি শাকের সাথে ছোট মাছের চরচরি খায়, আবার শাপলা ও হেঞ্চি, লতি এসব ছোট মাছ খাবে। বাড়ির গাছের তরকারী খাবে ও বিক্রি করবে। ছেলে আছে চক থেকে মাছ মেরে আনে টেংরা, পুঁটি, বাইম, বালু খৈলসা, ভূত

কইয়া, মলা, ঢেলা এসব মাছ ধরে আনে তা খেয়ে থাকে। মাছ মেরে আনে তা অনেক সময় পাড়ায় ধনী বাড়ি বিক্রি করে এ মাসে টাকা হাতে করে একটা ওচা ছোট জাল কিনে দেয়। সে জাল দিয়ে মাছ মেরে আনে। সে মাছ খেয়ে বিক্রি করতে পারি। সে টাকা দিয়ে তেল, সাবান, সোডা, হলুদ, মরিচ, লবণ, সরিষার তেল কিনে থাকি। আবার কিছু টাকা হাতেও রাখতে পারি।

হাঁসের জন্য ছেলে শামুক খুটে আনে, হাঁসকে তা খাওয়ানো হয়। অনেক সময় মুরগীকে নিজের প্লেটে ভাত খাওয়ায়। এ ছাড়া ডিম বিক্রি করে কুড়া কিনে আনে তা খাওয়াবে।

জ্বালানী: এ মাসে জ্বালানীর জন্য ইরি ধানের চিটা ও হুগলা জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে সংগ্রহ করে রাখে তা দিয়ে চুলায় জ্বাল দেয়া হয়। এছাড়া গাছে দু' একটা মরা ডাল থাকলে তা পেড়ে এনেও জ্বাল দিয়ে থাকে। বাড়িতে শুকনা বাঁশ গোড়া ও বাছ পাট বেছে খড়ি এনে বাজারে বিক্রি করে ২০০ টাকার মত। এ টাকা দিয়ে চাল কিনে খেয়েছে।

ভাদ্র মাস

দৈনিক খাবার

এ মাসে বাড়িতে তরকারী গাছের তরকারী বিক্রি করবে ও খাবে। আবার কলমি, শাপলা, হেঞ্চি, গাঙকলা, শালুক, ঘেচু, তেলাকুচা, কস্তুরী ও পিপুল পাতা খেয়ে থাকে। অনেক সময় তরকারি গাছের পাতা চিনতন, দুরমার পাতা খেয়ে থাকে। মাছ ধরা খেয়ে থাকে। এ মাসে মাঝে মাঝে হঠাৎ দু'একটা রুই, শোল ও বোয়াল খেয়ে থাকে। ছোট মাছ প্রত্যেক দিন কম বেশী খাবে। মাছ পঁচলে তার সাথে পিপুলের পাতা দিয়ে খেয়ে থাকে। হাঁসের ডিম বিক্রি করে নারিকেল তেল, সাবান, হলুদ, মরিচ, লবণ, পেঁয়াজ কিনে আনে। আবার ডিম বিক্রি করে হাতে কিছু টাকাও রাখতে পারে তা দিয়ে চাল কিনে খাবে। শামুক খুটে এনে এক ঝুড়ি পাঁচ টাকা বিক্রি করে ছেলে একটা প্যান্ট কিনেছে। হাঁসের খাওয়ার জন্য শামুক কিনে আনে।

আউশ ধান কাটার পর চক থেকে ধান কুটে আনে তা সিদ্ধ করে শুকনা করে চাল তৈরী করে ভাত খাবে। এ ধানের কুড়া মুরগীকে খাওয়াবে।

জ্বালানী: আউশ ধানের খড় কুটা এনে জ্বাল দেয়। অন্যের খড় শুকানোর কাজ করে দিলে খড়, হুগলা দিবে তা দিয়ে জ্বাল দিবে। অন্যের বাড়ির পাট খড়ি বেছে দিলে খড়ি দেয় সে খড়ি দিয়ে ঘরের বেড়া ও জ্বাল দেয়ার কাজ করে। পরে আবার খড়ি বিক্রিও করে থাকে। এক আটি খড়ি ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা বিক্রি করে থাকে। আবার এ খড়ি রেখে দেয় পরবর্তীতে বিক্রি করে থাকে।

ভাদ্র মাসের তের তারিখের দিন তেরাবেরা পালন করে। এ সময় ধনী গরীব সবাই তালের পিঠা খাবে তাই বাচ্চারা তাদের বাড়ি যাবে। নিজে হাঁসের ডিম বিক্রি করে একটা তাল, গুড় ও তেল এনে সাথে এ মাসে আমন ধান খুটে সে ধান থেকে এক থেকে দেড় কেজি আতব চাল বের করে বাচ্চাদের তেরাবেরা খাওয়াবে।

আশ্বিন মাস

দৈনিক খাবার

এ মাসে চাট কলমি, সেঞ্চি, ন্যাটাপেটা, খারকন, কস্তুরী, পিপুর পাতা, শাপলা, শালুক, ঘেচু এসব খেয়ে থাকে। আবার ছোট মাছের মধ্যে টেংরা, পুঁটি, বাজিলা, মলা, ঢেলা, বাইম, ভুত কুইয়া, কাকিলা এসব মাছ খাওয়া হয়। বাড়িতে পুরানো গাছে দু'একটা চিনতন, দুরমা ও কুমড়া থাকে তাও খেয়ে থাকে। কুমড়ার পাতা দিয়ে বড়া ভেজে খেয়ে থাকি। চাল কুমড়ার পাতার সাথে চাল বেটে রেখে তেলের কড়াইয়ে তেল দিয়ে পাতায় চালের আটা গোলানো তা মাখিয়ে বড়া ভেজে খায় এতে পেটে কৃমি থাকে না। অন্যের বাড়িতে গিয়ে ঘর লেপে দিলে দেড় কেজি চাল দিবে এবং এক বেলা খাবার দেয়। এ চাল দুই দিন খেতে পারে। শামুক খুটে হাঁসকে খাওয়াবে।

হাঁসের ডিম এক হালি বিক্রি করে ১২ টাকা। ৫ টাকায় একটা কাপড় কাচার সাবান, ২ টাকার পান সুপারী ও ৫ টাকার সরিষার তেল কিনবে। এভাবে সারা মাস চলে থাকে।

আঁখ ক্ষেতে আঁখের শেকড়সহ আঁখ ছাইটা পরিষ্কার করে দিলে এক চরা গুড়ের বা এক বোঝা আখ ছাটলে ৭০ টাকা পায়। সে টাকা দিয়ে চাল কিনে খাবে, বাজার করবে এ মাসে হাতে কিছু টাকা রাখে। সারা দিন মাঠে কাজ করে থাকে। এ মাসে কাজ করে, কাজও প্রচুর থাকে আখ ক্ষেতেরই।

জ্বালানী: আঁখের পাতা দিয়ে জ্বাল দেয়। আখ ছাটার পর পাতা ও জঙ্গল থাকে তা এনে বাড়িতে পালা দেয়। এ পাতা দিয়ে ৪/৫ মাস জ্বাল দিতে পারে। আবার গোবর খুটে ঘসি দিয়ে রাখে। এ ঘসিও জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে বস্তা ৩০ টাকা করে বিক্রি করে। এভাবে ৩-৪ বস্তা বিক্রি করতে পারে।

কার্তিক মাস

দৈনিক খাবার

এ মাসে ডাটা শাক বুনে সে ডাটা ও হেঞ্চি, ন্যাটাপ্যাটা, খারকন, সাজনা পাতা, দণ্ড কলস, পানার ফুল এনে চালের আটার সাথে বড়া তৈরী করে খায়।

আমন ধান খুটে আনে তা সিদ্ধ করে শুকায়ে চাল করে ভাত খেয়ে থাকে। এ মাসে নীচু বা পাগারে ছোট মাছ পাওয়া যায় তা ধরে আনে তার শুটকী করে রাখে এবং মাঝে মধ্যে নিজেরাও খেয়ে থাকে।

বাড়িতে তরকারি গাছের তরকারি খাবে ও বিক্রি করে থাকে। হাঁসের ডিম বিক্রি করে একসাথে চাল কিনে আনে তা খাবে।

ডিম বিক্রি করে টাকা দিয়ে বাজার সদায় খাবে। এর সাথে পান সুপারীও খাবে। এ মাসে মুরগীর জন্য খাবার দিতে হয় না। নতুন ধান আসে সে ধান খুটে খেয়ে থাকে। মাঝে মধ্যে ভাত খেতে বসেছি সে প্লেট থেকে একটু দিয়ে থাকি। হাঁসের জন্য আগেই শামুক এনে গর্ত করে রেখে দেয়, তা খাওয়ায়।

কাপড় চোপড়: এ মাসে কাপড় চোপড় নিবে না।

জ্বালানী: এ মাসে গোবর খুটে ঘসি দিয়ে পুড়ে থাকে। আবার ভাদ্র মাসে পাটের খড়ি, পাট বেছে এনে রাখে তা দিয়ে জ্বাল দিয়ে থাকে। আবার গাছের পাতা, বাঁশ পাতা, আম, কাঁঠাল ও বিভিন্ন গাছের পাতা ঝাড়ু দিয়ে এনে জ্বাল দেয়। আঁখ ক্ষেতের আঁখ ছাইটা দিয়ে পাতা এনে বাড়িতে রাখে। আবার আঁখ ভাঙ্গানো মেশিনে কাজ করে আঁখের ছোবা আনে এবং সারা দিন কাজ করে ৩০ টাকা পেয়ে থাকে। এ টাকা দিয়ে এ মাসে বাচ্চাদের সহ নিজের কাপড় নিবে। এ মাসে আঁখের মিলে কাজ করে থাকে এতে ভাল টাকা পায়।

অধ্যায় ৪: ছবিতে কুড়িয়ে পাওয়া শাক

অনাবাদি শাক

নামঃ হেলেঞ্চা শাক
বৈজ্ঞানিক নামঃ Enhydra flactuans

নামঃ বন কচু
বৈজ্ঞানিক নামঃ Colocasia esculanta

নামঃ মরিচ পাতা
বৈজ্ঞানিক নামঃ Lepidium densiflovum

নামঃ আমরুল
বৈজ্ঞানিক নামঃ Oxalis europea

নামঃ নুনিয়া শাক
বৈজ্ঞানিক নামঃ Portulaca oleracea

নামঃ পিপুল
বৈজ্ঞানিক নামঃ Piper Longum

নাম: গিমা শাক
বৈজ্ঞানিক নাম: Mollago oppositifolia

নাম: খ্যাটখ্যাটে
বৈজ্ঞানিক নাম: Ceratopteris thalictroides

নাম: হাগড়া
বৈজ্ঞানিক নাম: Typha qugustata

নাম: থানকুনি
বৈজ্ঞানিক নাম: Hydrocotyle Asiatica

নাম: কলমি শাক
বৈজ্ঞানিক নাম: Ipomoea aquatica

নাম: ক্যাথাপাটা
বৈজ্ঞানিক নাম: Alternanthera

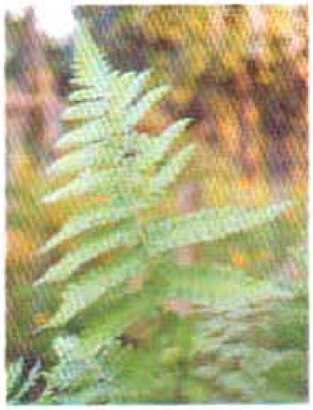

নাম: ঢেঁকি শাক
বৈজ্ঞানিক নাম: Dryopteris filixmas

নাম: চিরকুটি
বৈজ্ঞানিক নাম: Xeromphis spinosa

নাম: দণ্ড কলস
বৈজ্ঞানিক নাম: Leucase aspera

নাম: বিষ কচু
বৈজ্ঞানিক নাম: Colocasia Nymphaefolia

নাম: তেলাকুচা
বৈজ্ঞানিক নাম: Coccinia indica

নাম: বতুয়া শাক
বৈজ্ঞানিক নাম: Chenopodium album

নাম: নুন খুরিয়া (বুলখুরিয়া)
বৈজ্ঞানিক নাম: Portulaca oleracea

নাম: চুকাকলা
বৈজ্ঞানিক নাম: Polycarpaea loeftineae

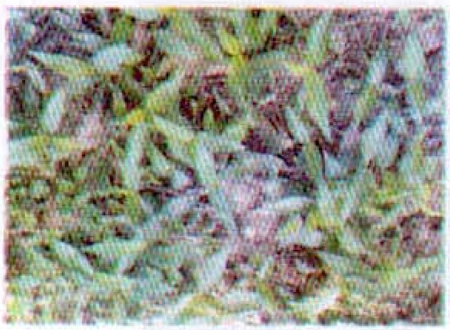

নাম: কানাই শাক
বৈজ্ঞানিক নাম: Commelina benghalensis

নাম: কস্তুরী শাক
বৈজ্ঞানিক নাম: Cinnamomum iners

নাম: দুধলী
বৈজ্ঞানিক নাম: Operculina turpethum

নাম: রসুন শাক
বৈজ্ঞানিক নাম: Allium sativum

আবাদি শাক এবং সাথী শাক

নাম: মিষ্টি আলু
বৈজ্ঞানিক নাম: Ipomoea batatus

নাম: গোল আলু
বৈজ্ঞানিক নাম: Solanum tuberosum

নাম: লাউ
বৈজ্ঞানিক নাম: Lagenaria siceraria

নাম: মিষ্টি কুমড়া
বৈজ্ঞানিক নাম: Cucurbita moschata

নাম: বরবটি
বৈজ্ঞানিক নাম: Vignaa Sesquipedelis

নাম: সাজনা
বৈজ্ঞানিক নাম: Moringa Obifera

নাম: পিঁয়াজ পাতা
বৈজ্ঞানিক নাম: Allium cepa

নাম: রসুন পাতা
বৈজ্ঞানিক নাম: Allium sativum

নাম: চিনা বাদাম
বৈজ্ঞানিক নাম: Arachis hypogea

নাম: ধনিয়া পাতা
বৈজ্ঞানিক নাম: Coriandrum sativum

নাম: ছোলা
বৈজ্ঞানিক নাম: Cicer arientnum

নাম: পুদিনা পাতা
বৈজ্ঞানিক নাম: Menthea spicata

নামঃ ডালিম
বৈজ্ঞানিক নামঃ Punica granatum

নামঃ উচ্ছে
বৈজ্ঞানিক নামঃ Momordica aquatica

নামঃ পটল
বৈজ্ঞানিক নামঃ Trichosanths dioica

নামঃ মটর
বৈজ্ঞানিক নামঃ Pisum Sativum

নামঃ বেতের আগা
বৈজ্ঞানিক নামঃ Calamus viminalis

নামঃ মেস্তা পাট
বৈজ্ঞানিক নামঃ Hibiscus cannabinus

শাক তোলার কাজ খুবই সুক্ষ্মভাবে করতে হয়। মহিলারা এমনকি ছোট বাচ্চা মেয়েটিও জানে কোন শাক কেমন করে এবং কত যত্ন করে আঙ্গুল দিয়ে ছিড়তে হবে। পাতার আগায় হালকা করে ধরে গাছের কোন প্রকার ক্ষতি না করে শাক তোলা হয়। এতে গাছ নষ্ট হয় না অথচ গ্রামের পরিবারগুলোর খাদ্যের যোগান হয়ে যায় অনায়াসে।

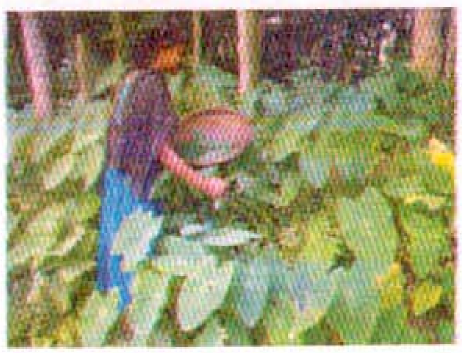

'আমাদের কুড়িয়ে পাওয়া শাক গবেষণা পত্রটি দীর্ঘদিনের গবেষণার ফল। গ্রাম পর্যায়ে যারা কাজ করেন তাঁরা দিনের পর দিন গ্রামের মহিলাদের সাথে কথা বলে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। যে শাক রাস্তার ধারে, পুকুর পাড়ে, ফসলের ক্ষেতে এবং পানিতে হয় তার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেয়া আছে। এটা মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের এবং কৃষক নারীদের গবেষণা।

নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা এ গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে খুব খুশি। আশা করি সকলেরই এটা ভাল লাগবে।

নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা
৬/৮ স্যার সৈয়দ রোড, মোহাম্মদপুর,
ঢাকা - ১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ৯১১৮৪২৮, ৯১৪০৮১২
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮১১৩০৬৫